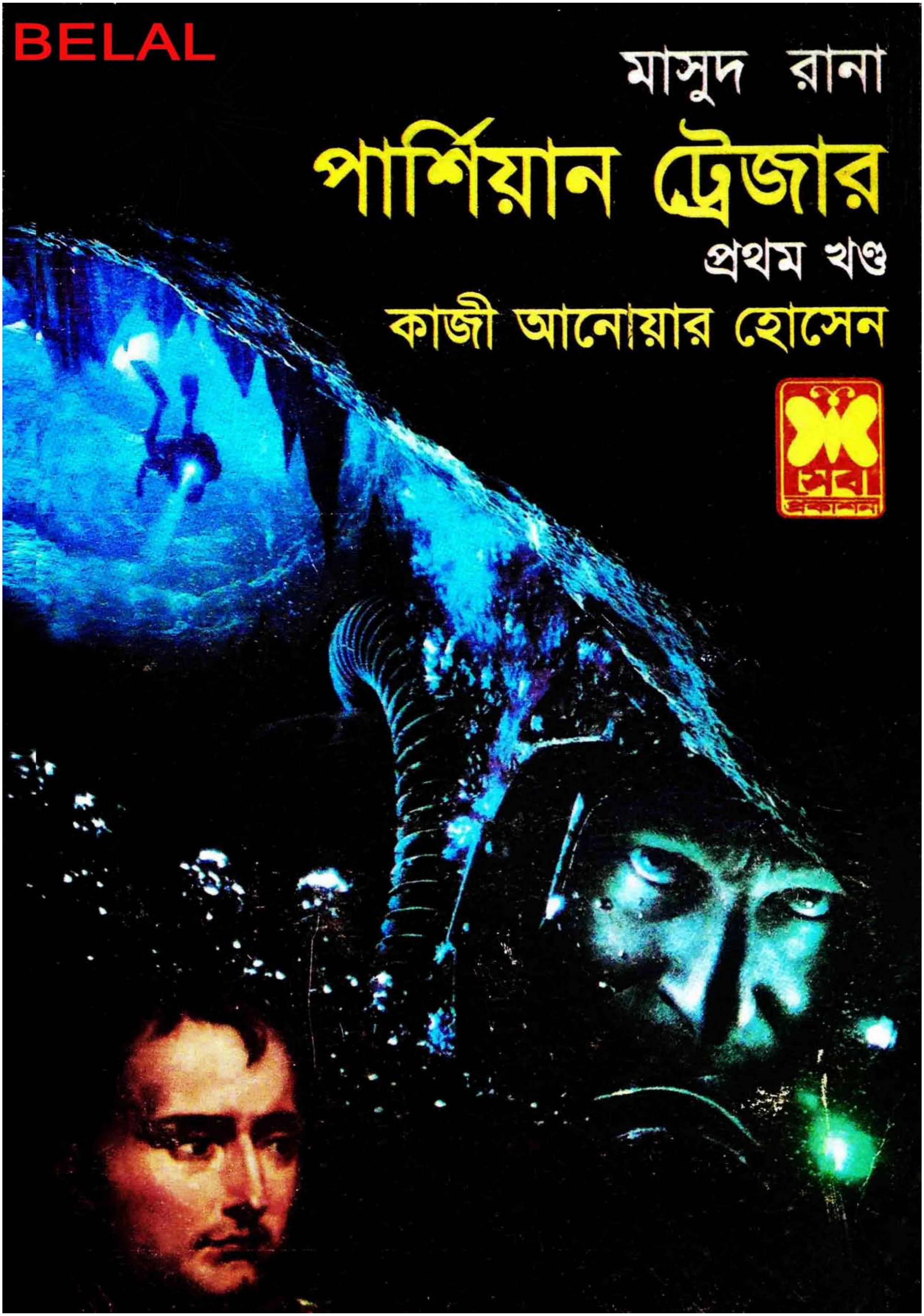

মাসুদ রানা
পার্শিয়ান ট্রেজার
প্রথম খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা

পার্শিয়ান ট্রেজার

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

ভাঙা একটা কাঁচের বোতল।
তাতে এক উড়ন্ত মৌমাছির রহস্যময় ছবি।
অদ্ভুত ওই প্রতীকটা বিপাকে ফেলে দিল রানা-সোহানাকে।
একের পর এক মৃত্যুফাঁদ পাতা হচ্ছে ওদের জন্যে।
কারণ, ভয়ঙ্কর এক মাফিয়াসর্দারের বিরাগভাজন হয়েছে।
কৌশলে বিপদ এড়িয়ে যাচ্ছিল ওরা দুজনে।
ঘুণাক্ষরেও ভাবেনিঃ যাকে সুহৃদ ভেবেছে,
তারই বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়তে চলেছে ওরা
শত্রুপক্ষের হাতে। এমন এক জায়গায়—
যেখানে গোর দেওয়া হয়েছে রহস্য সমাধানের চাবিকাঠি।
শত্রু প্রবল, ওরা মাত্র দুজন।
কী হয়, কী হয়!

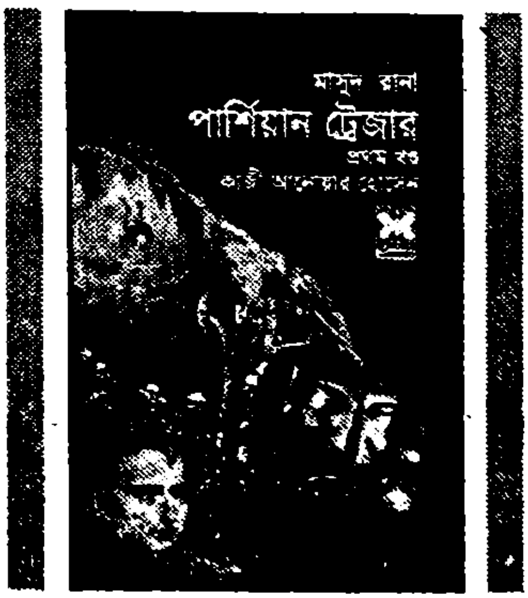
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা ৪৩১

পার্শিয়ান ট্রেজার

(প্রথম খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7431-9

সেবা
প্রকাশনী

আটানব্বই টাকা

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর *গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস *স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা *বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণকামড়*মরণখেলা*অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর *শ্বাপদসংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া *হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগ ব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া*টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি*ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা *মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা*সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড় *কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ *কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ*চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসন্দ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর*আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল*শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেলআবিব*ক্রাইম বস*সুমেরুর ডাক*ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী *বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা*রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন *হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ*কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন*সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা*দুরন্ত ঈগল*সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*স্নাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান *জলরাক্ষস*মৃত্যুশীতল স্পর্শ*স্বপ্নের ভালবাসা*হ্যাকার*খুনে মাফিয়া*নিখোঁজ*বুশ পাইলট*অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অন্তর্ধান*ড্রাগলর্ড*দ্বীপান্তর*গুপ্ত আততায়ী*বিপদে সোহানা*চাই ঐশ্বর্য*স্বর্ণ-বিপর্যয়*কিল-মাস্টার*মৃত্যুর টিকেট*কুরুক্ষেত্র*হাইজ্যাক*আগুন নিয়ে খেলা*মরুস্বর্গ*সেই কুয়াশা*টেরোরিস্ট*সর্বনাশের দূত*শুভ্র পিঞ্জর*সূর্য-সৈনিক *ট্রেজার হান্টার*লাইমলাইট*ডেথ ট্র্যাপ*কিলার ভাইরাস*টাইম বম*আদিম আতঙ্ক *পার্শিয়ান ট্রেজার।

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদ।

পূর্বকথা

আঠারো শ' সাল। মে মাস। গ্র্যাণ্ড সেইন্ট বার্ণার্ড গিরিপথ। পেনাইন আল্পস।

রণসাজে সজ্জিত ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। একঝলক ঠাণ্ডা দমকা বাতাস বয়ে গেল হঠাৎ। উড়িয়ে এনে একদলা তুষার ফেলল স্টাইরির পায়ে। ঘাবড়ে গেল ঘোড়াটা। অস্থিরভঙ্গিতে ফোঁস ফোঁস করছে। বার কয়েক এলোপাতাড়ি পা ছুঁড়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে ট্র্যাক থেকে।

লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে থামালেন নেপোলিয়ন। ঘাড়ে-গলায় হাত বুলিয়ে শান্ত করলেন। ঠাণ্ডা লাগছে, তাই তুলে দিলেন গ্রেটকোটের কলার। অনেকক্ষণ ধরে তুষারপাত হচ্ছে, তুষারের সাদা চাদর ভেদ করে তাকালেন পুব দিগন্তের দিকে। মণ্ট ব্ল্যাঙ্কের ষোলো হাজার ফুট উঁচু অবয়বটা ছাড়া তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না।

স্যাডলের উপর কিছুটা ঝুঁকে বসে আবারও ঘোড়ার গলায় হাত বুলিয়ে দিলেন নেপোলিয়ন। বিড়বিড় করে বললেন, 'এরচেয়েও খারাপ অবস্থা দেখেছিস তুই, ঠিক না?'

স্টাইরি আরবি। দু'বছর আগে মিশরে এক অভিযান চালানোর সময় ওটা করায়ত্ত করেন নেপোলিয়ন। সেই থেকে ঘোড়াটা তাঁর সঙ্গেই আছে। ওটা প্রশিক্ষিত রণঘোটক। সে-দিক দিয়ে বিচার করলে স্টাইরি এককথায় তুলনাহীন। কিন্তু সমস্যা একটাই, ঠাণ্ডা বা তুষার সহ্য করতে পারে না। পারার কথাও না। জন্মেছে মরুভূমিতে, বড়ও হয়েছে সেখানে। তাই চলার সময় পায়ের নীচে বরফের বদলে বালি পেলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে বেশি।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন নেপোলিয়ন। খাস পরিচারক

কন্সট্যান্টকে ইঙ্গিত করলেন। ফুট দশেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে। হাতে ধরে রেখেছে কতগুলো খচ্চরের লাগাম। আরও পিছনে আঁকাবাঁকা ট্রেইল ধরে এগিয়ে আসছে নেপোলিয়নের রিযার্ভ আর্মি—চল্লিশ হাজার সৈন্য এবং তাদের ঘোড়া, খচ্চর ও রসদ।

ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র বিশেষ একটা খচ্চর আলাদা করে নিয়ে দ্রুত-পায়ে আগে বাড়ল কন্সট্যান্ট। নেপোলিয়নের কাছে এসে থামল। স্টাইরিরি লাগাম ওর হাতে দিয়ে স্যাডল থেকে নামলেন তিনি। তাঁর দু'পা হাঁটু পর্যন্ত দেবে গেল তুষারের গালিচায়। ওই অবস্থাতেই পা দুটো টান টান করে দিলেন তিনি। অনেকক্ষণ একভাবে বসে থাকার কারণে তেমন একটা সাড়া পাচ্ছেন না। বললেন, 'স্টাইরিরি বিশ্রাম দরকার। আমার মনে হয় ওর নালে কোনও সমস্যা হয়েছে।'

'দেখছি আমি, জেনারেল।'

যখন কোনও অভিযানে বের হন তখন সঙ্গীদের মুখ থেকে "জেনারেল" সম্বোধনটাই শুনতে পছন্দ করেন নেপোলিয়ন।

বুক ভরে দম নিলেন তিনি। টেনেটুনে ঠিক করলেন নীল "বাইকর্ণ" হ্যাট। স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন দূরের পর্বতচূড়ার দিকে। 'দিনটা সুন্দর, ঠিক না, কন্সট্যান্ট?'

'আপনি বললে অবশ্যই,' কন্সট্যান্টের গলায় শ্লেষের আভাস।

রাগ করলেন না নেপোলিয়ন, বরং মুচকি হাসলেন।

অনেক বছর ধরে তাঁর সঙ্গে ছায়ার মতো আছে কন্সট্যান্ট। সে এখন আর নেহাৎ হুকুমবরদার না। অনেক বিষয়ে সম্রাটের সঙ্গে কথা বলে। মাঝেমধ্যে একটু-আধটু খোঁচাও দেয়। নেপোলিয়ন তেমন কিছু মনে করেন না এ-ব্যাপারে। বয়স হয়েছে লোকটার, যা বলে তাতে তোষামুদির চেয়ে সম্রাটের ভালোমন্দের চিন্তাটা থাকে বেশি।

'লোরন কিছু জানিয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন নেপোলিয়ন।

'না, জেনারেল।'

পুরো নাম আরনঁদ লোরন। নেপোলিয়নের রিযার্ভ আর্মির মেজর জেনারেল। তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত কমাণ্ডার এবং ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। গতকাল একদল সৈন্য নিয়ে স্কাউটিং মিশনে এই গিরিপথের আরও ভিতরের দিকে গেছেন তিনি। এখানে শত্রুপক্ষের হামলার সম্ভাবনা বলতে গেলে শূন্য, তারপরও নেপোলিয়ন জানেন সাবধানের মার নেই। ইতিহাস বলে, সামান্য কারণে অনেক বড় বড় বীর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে মুহূর্তের মধ্যে। এখানে নেপোলিয়নের বিবেচনায় সবচেয়ে বড় শত্রু হিমশীতল আবহাওয়া আর অপরিচিত ভূখণ্ড।

গ্র্যাণ্ড সেইন্ট বার্ণার্ড গিরিপথ সমুদ্র-সমতল থেকে আট হাজার ফুট উপরে। পর্যটকদের কাছে এই এলাকা ক্রসরোড হিসেবে পরিচিত। কারণ জায়গাটা সুইটযারল্যাণ্ড, ইটালি আর ফ্রান্সের সীমানায়। নেপোলিয়নই প্রথম নন, এপথ দিয়ে আগেও অনেক সেনাবাহিনী গেছে। রোমকে দুমড়েমুচড়ে একাকার করার উদ্দেশ্যে খ্রিস্টপূর্ব ৩৯০ সালে গেছে গলবাহিনী। হ্যানিবলের বিখ্যাত হাতিবাহিনী গেছে খ্রিস্টপূর্ব ২১৭ সালে। নেপোলিয়নের পূর্বসূরি ফ্রান্সের এককালের রাজা পেপিন দ্য শর্ট গেছেন পোপ দ্বিতীয় স্টিফানের সঙ্গে দেখা করতে, ৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে। রোমে অভিষেক অনুষ্ঠান শেষ করে প্রথম পবিত্র রোমান সম্রাট হিসেবে ৮০০ সালে গেছেন শার্লেম্যাগনে।

কিন্তু অন্য রাজারা যা পারেনি, নিজেকে মনে করিয়ে দিলেন অন্যমনস্ক নেপোলিয়ন, আমি তা করে দেখাবো। আমার আগে যারা এই এলাকা দিয়ে গেছে তাদের রাজত্বের চেয়েও বড় হবে আমার রাজত্ব। শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনী, বৈরি আবহাওয়া, পর্বত...কোনওকিছুই দমাতে পারবে না, ভুঁইফোড় অস্ট্রিয়ানগুলোকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো আমি।

বছর দু'-এক আগের কথা। নেপোলিয়ন আর তাঁর সেনাবাহিনী তখন মিশরে। অভিযান চালাচ্ছেন সেখানে, দখল করছেন দেশটা। হঠাৎ খবর পান, হামলা করে ইটালির যে-অংশটুকু ফ্রান্সের অধীনে ছিল তা দখল করে নিয়েছে অস্ট্রিয়ানরা।

এই বিজয় টিকবে না, ভাবলেন নেপোলিয়ন। বছরের এই সময়ে সেইন্ট বার্ণার্ড গিরিপথের মতো দুর্গম এলাকা পার হয়ে হামলা করবে ফ্রান্সের সেনাবাহিনী—কল্পনাও করতে পারবে না অস্ট্রিয়ানরা। এখানে শীতকালে মানুষের পক্ষে চলাচল করা এককথায় অসম্ভব। কারণ চারদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ি দেয়াল, মাঝখান দিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে দুর্গম ট্রেইল, হাঁটু পর্যন্ত উঁচু হয়ে জমেছে তুষার। কোনও পর্যটকের পক্ষে একা এই গিরিপথ পাড়ি দেয়ার চিন্তা স্রেফ দুঃস্বপ্ন।

এখানে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অবিরাম তুষারপাত চলে। তাপমাত্রা কোনওদিনও শূন্যের উপরে ওঠে না। সামনে যা কিছু পায় তা-ই দাফন দেয়ার নিয়ত নিয়ে কখনও কখনও দশজন মানুষ-সমান উঁচু হয়ে আছড়ে পড়ে জমাট-বাঁধা তুষারকণা। সঙ্গে দমকা বাতাস তো আছেই। সূর্যের দেখা বলতে গেলে পাওয়াই যায় না। যেদিন সূর্য ওঠে সেদিনও মাঝদুপুর পর্যন্ত বাতাসে ঝুলে থাকে কুয়াশার ভারী চাদর। তুষারসাগরে যখন-তখন বিনা নোটিশে জাগে প্রলয়ঝড়। শান্ত একটা দিন যেন নিমেষে পরিণত হয় বিভীষিকাময় ভয়াল রাতে। একটানা গর্জন করতে থাকে বাতাস। সমান তেজে তীরবেগে ছুটে বেড়ায় বরফখণ্ড। একহাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না তখন। সবচেয়ে বড় আতঙ্কের নাম তুষারধস। নিজের ভারে হাজার হাজার টন শিলাসহ খসে পড়ে জমাট-বরফের বিশাল স্তূপ। কখনও কখনও আধ মাইল পর্যন্ত চওড়া হয় এই স্তূপ। নীচে পড়ার সময় গর্জাতে থাকে হিংস্র, বুনো জন্তুর মতো।

ভাগ্য ভালো, এই অভিযানে এখন পর্যন্ত তেমন বড় কোনও

দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়নি নেপোলিয়নের বাহিনীকে। ঠাণ্ডার কারণে এখন পর্যন্ত মাত্র দু'শ' সৈন্য মারা পড়েছে।

কন্সট্যান্টের দিকে তাকালেন নেপোলিয়ন। 'কোয়ার্টারমাস্টার কী রিপোর্ট দিল?'

কোটের পকেট থেকে কয়েক তা কাগজ বের করে নেপোলিয়নের দিকে বাড়িয়ে ধরল কন্সট্যান্ট। 'এই যে।'

কাগজগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন নেপোলিয়ন। তাঁর সৈন্যরা এখন পর্যন্ত উনিশ হাজার আট শ' সতেরো বোতল মদ, এক টন পনির আর সতেরো শ' পাউণ্ড মাংস সাবাড় করেছে। এভাবে চলতে থাকলে...

হিসাবটা শেষ করতে পারলেন না তিনি। কন্সট্যান্ট বলে উঠল, 'ওই যে, মেজর জেনারেল লোরন এসে গেছেন।'

মুখ তুলে তাকালেন ফরাসি সম্রাট।

দূরে, তুষারের চাদর ভেদ করে এগিয়ে আসছে বারোজন ঘোড়সওয়ার। ওরা প্রত্যেকেই দক্ষ সৈনিক। স্যাডলে ঝুঁকে বসে নেই একজনও। সবার পিঠ সোজা। আর ওদের কমাণ্ডার নেপোলিয়নের দৃষ্টিতে তুলনাহীন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্রাটের সামনে এসে ঘোড়া থামালেন লোরন। স্যালুট করে নামলেন স্যাডল থেকে। তাঁকে আলিঙ্গন করলেন নেপোলিয়ন। তারপর কিছুটা সরে গিয়ে ইশারা করলেন কন্সট্যান্টকে। দ্রুত এক বোতল ব্র্যাণ্ডি এনে দিল কন্সট্যান্ট লোরনকে। ঢকঢক করে কিছুটা ব্র্যাণ্ডি গলাধঃকরণ করে বোতলটা ফেরত দিলেন লোরন।

নেপোলিয়ন বললেন, 'কী খবর?'

'আট মাইলের মতো দেখে এসেছি আমরা, জেনারেল। শত্রুপক্ষের কোনও চিহ্ন নেই। সামনে আবহাওয়া ভালো। কিন্তু তুষারের গভীরতা বেশি। তারপরও আমার মনে হয় যত আগে

বাড়বো আমাদের চলার কষ্ট তত কমবে।'

'ভালো,' সম্রাটের গলায় সন্তুষ্টি। 'খুব ভালো।'

'একটা কথা বলতে চাই।'

'বলো।'

আলতো করে নেপোলিয়নের কনুইয়ে হাত রাখলেন লোরন, তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন কিছুটা দূরে। নিচু গলায় বললেন, 'আমরা...ইণ্টারেস্টিং একটা জিনিস দেখে এসেছি।'

কৌতূহল বোধ করলেন নেপোলিয়ন। 'কী?'

'আমার মনে হয় আমার মুখ থেকে না শুনে আপনি নিজে গিয়ে দেখলেই ভালো হয়।'

একদৃষ্টিতে লোরনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন নেপোলিয়ন কিছুক্ষণ। ষোলো বছর বয়স থেকে এই লোকটাকে চেনেন তিনি। ওই সময়ে ফরাসি সেনাবাহিনীর আর্টিলারি ডিভিশনে একজন লেফটেন্যান্ট হিসেবে কাজ করতেন তিনি। বাড়িয়ে বলা অথবা বানিয়ে বলার অভ্যাস নেই তাঁর। তিনি যখন বলছেন কিছু একটা দেখেছেন এবং সেটা দেখাতে নিয়ে যেতে চাইছেন, তারমানে বিষয়টা আসলেই গুরুত্বপূর্ণ।

'কত দূরে?' জিজ্ঞেস করলেন নেপোলিয়ন।

'চার ঘণ্টা লাগবে।'

আকাশের দিকে তাকালেন নেপোলিয়ন। দুপুর গড়িয়ে গেছে। মণ্ট ব্ল্যাঙ্কের চূড়া ছাড়িয়ে কিছুটা উপরে জমাট বাঁধছে কালো মেঘ। ঝড় আসছে।

'ঠিক আছে,' লোরনের কাঁধ চাপড়ে দিলেন তিনি। 'কাল সকালে রওনা হবো আমরা।'

রাতে ঠিক পাঁচ ঘণ্টা ঘুমান নেপোলিয়ন। ওঠেন সকাল ছ'টায়।

আজ উঠেছেন আরেকটু তাড়াতাড়ি। নাস্তা সেরে নিয়েছেন

ইতোমধ্যে। এক পট তিতা কালো কফি নিয়ে বসেছেন এখন। বিগ্রেড কমাণ্ডারদের কাছ থেকে নানা বিষয়ে নানা রিপোর্ট শুনছেন আর চুমুক দিচ্ছেন কফির কাপে।

ঠিক সাতটার সময় হাজির হলেন লোরন। প্রস্তুত হয়েই ছিলেন নেপোলিয়ন, মেজর জেনারেল আসামাত্র উঠে পড়লেন। বিশ্বস্ত কয়েকজন সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন দু'জনে। আগেরদিন যে-ট্রেইল ধরে গিয়েছিলেন লোরন, সেই পথেই এগোচ্ছেন।

গতরাতে ঝড়ের সময় তুষারের চেয়ে বাতাস দাপাদাপি করেছে বেশি। ট্রেইলের এখানে-সেখানে আলগা তুষার জমাট বেঁধে বরফের দেয়াল বানিয়ে দিয়েছে। গিরিপথের চেহারাটা পাল্টে গেছে রাতারাতি। নিঃশ্বাস ছাড়ছে ঘোড়াগুলো, যেন সাদা ধোঁয়া বের হচ্ছে ওগুলোর নাক থেকে। থেকে থেকে বয়ে যাচ্ছে শীতল বাতাস। অটুট নীরবতায় হঠাৎ শোঁ শোঁ আওয়াজ বুকের ভিতরে কাঁপন তুলে দেয়।

'আতঙ্কজনক, ঠিক না, জেনারেল?' জিজ্ঞেস করল লোরন।

'না। এ-রকম অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে আমার।'

'আমার দৃষ্টিতে এই জায়গা সুন্দর। সুন্দর এবং বিপজ্জনক।'

যুদ্ধক্ষেত্রের মতো, ভাবলেন নেপোলিয়ন। কামানের গর্জন না শুনলে, মাস্কেটের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ না দেখলে, বাতাসে পোড়া বারুদের গন্ধ না পেলে তাঁর মনেই হয় না বেঁচে আছেন! যুদ্ধক্ষেত্রই তাঁর বাড়ি, তাঁর ঘর। যুদ্ধক্ষেত্রই তাঁর প্রেম।

আর কয়েকটা দিন পর, আবারও ভাবলেন তিনি, এই হতচ্ছাড়া পাহাড়ি এলাকা পার হলে... মনে মনে হাসলেন।

সবার সামনে-থাকা লিড রাইডার হাত তুলল এমন সময়। থামতে ইঙ্গিত করছে। স্টাইরির লাগাম টানলেন নেপোলিয়ন।

ইতোমধ্যে ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে লোকটা। উরু পর্যন্ত জমা তুষার ঠেলে এগোচ্ছে সামনে। সামনের পাহাড়ি দেয়ালগুলো

দেখছে। মাথা কিছুটা ঝুঁকে আছে পিছনের দিকে। একটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল কিছুক্ষণ পর।

'কী খুঁজছে?' লোরনকে জিজ্ঞেস করলেন নেপোলিয়ন।

'এসব এলাকায় যখন তুষারধস হয়,' এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন লোরনও, 'সাধারণত সকালের দিকেই হয়। সারারাতের ঠাণ্ডায় পাহাড়ি দেয়ালে জমাট বাঁধে তুষার। সকালের অল্প রোদেই গলে গিয়ে আছড়ে পড়ে। বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে আওয়াজ শোনামাত্র পালানো। তুষারধসের আওয়াজ শুনলে আমার কী মনে হয় জানেন? মনে হয়, যেন স্বর্গ থেকে ঈশ্বর নিজেই গর্জন করছেন!'

কয়েক মিনিট পরে ট্রেইলের মাথায় উদয় হলো লিড রাইডার লোকটা। আবারও ইঙ্গিত করল, জানিয়ে দিল সব ঠিক আছে। তারপর স্যাডলে উঠে বসে এগোতে লাগল।

টানা দু'ঘণ্টা চললেন নেপোলিয়ন আর তাঁর সঙ্গীরা। আঁকাবাঁকা ট্রেইল ধরে নামলেন পর্বতের পাদদেশের দিকে। বরফের সঙ্গে জড়াজড়ি করে-থাকা ধূসর গ্র্যানিটের সরু একটা উপত্যকায় হাজির হলেন অনেকটা হঠাৎ করেই। থামতে ইশারা করে ঘোড়া থেকে নামল লিড রাইডার। নামলেন লোরনও। ওর দেখাদেখি স্যাডল ছাড়লেন নেপোলিয়ন।

এদিক-ওদিক তাকালেন তিনি। 'এখানে?'

দুষ্টুমির হাসি হাসলেন তাঁর মেজর জেনারেল। 'হ্যাঁ, এখানেই।' স্যাডলের সঙ্গে বাঁধা আছে দুটো লণ্ঠন, দড়ির বাঁধন খুলে লণ্ঠন দুটো হাতে নিলেন। সম্রাটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলুন তা হলে?'

হাঁটতে শুরু করলেন তাঁরা। সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছ'টা ঘোড়া। নেপোলিয়ন যাবেন, তাই অ্যাটেনশন হয়ে স্যাডলে বসে আছে সওয়ারেরা। ওদেরকে ছাড়িয়ে আসার সময় প্রত্যেকের

উদ্দেশ্যে ছোট করে নড করলেন নেপোলিয়ন।

কিছুটা হেঁটে চলে এলেন আরেকটু সামনে। থামলেন লোরন, থামলেন নেপোলিয়নও। বাঁ দিকে, কিছুটা দূরে বড় একটা বোল্ডার; কয়েক মিনিট পর ওটার পিছন থেকে বের হয়ে এল সেই লিড-রাইডার। তুষার ঠেলে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে স্যালুট করল সম্রাটকে।

ওকে চোখের ইশারায় দেখিয়ে লোরন বললেন, 'সার্জেন্ট পেলিটিয়ারের কথা খেয়াল আছে, জেনারেল?'

'অবশ্যই,' জবাব দিলেন নেপোলিয়ন। কৌতুকের সুরে যোগ করলেন, 'এখন আমার উপর পেলেটিয়ারের একচ্ছত্র অধিকার।' একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন লোকটার দিকে। 'চলো।'

মাথা ঝাঁকাল পেলিটিয়ার। স্যাডলব্যাগ থেকে দড়ির একটা কুণ্ডলী বের করল। একটু আগে যে-বোল্ডারের আড়াল থেকে বের হয়ে এসেছিল, সেদিকে এগিয়ে গেল আবার। ওকে অনুসরণ করলেন নেপোলিয়ন আর লোরন।

গ্র্যানিটের একটা প্রাকৃতিক দেয়ালের কাছে এসে বাঁক নিল পেলিটিয়ার, দেয়ালটার সঙ্গে সমান্তরালে এগিয়ে যাচ্ছে। পঞ্চাশ গজের মতো এগোল সে। পাহাড়ি দেয়ালে গজিয়ে ওঠা প্রাকৃতিক একটা কুলুঙ্গির সামনে থেমে দাঁড়াল হঠাৎ করেই।

এদিক-ওদিক তাকালেন নেপোলিয়ন। 'জায়গাটা সুন্দর, সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে দেখার মতো কিছু আছে বলে মনে হয় না।'

পেলিটিয়ারের উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকালেন লোরন। মাথার উপর মাস্কেট তুলল পেলিটিয়ার, কুঁদো দিয়ে জোরে বাড়ি দিল কুলুঙ্গির গায়ে। নেপোলিয়ন ভেবেছিলেন পাহাড়ি দেয়ালের সঙ্গে কাঠের বাড়ি খাওয়ার শব্দ শোনা যাবে, কিন্তু কিছুটা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, বাড়ি খেয়ে টুকরো হয়ে খসে পড়ছে জমাট বরফ।

আরও চারবার বাড়ি মারল পেলিটিয়ার। ভেঙে পড়ল বরফ, ছ'ফুট উঁচু আর দু'ফুট চওড়া একটা প্যাসেজের মুখ বেরিয়ে পড়ল।

উঁকি দিলেন নেপোলিয়ন। ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

'যতদূর মনে হয়,' বলে উঠলেন লোরন, 'গ্রীষ্মকালে এই প্যাসেজের মুখ ঢেকে থাকে ঝোপঝাড় আর লতাপাতা দিয়ে। শীতকালে বরফ জমে জমে বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক কী কারণে জানি না, প্যাসেজের ভিতরে আর্দ্র একটা পরিবেশ বজায় থাকে। আর সে-কারণেই শীত এলে বরফের পাতলা স্তর পড়ে এটার মুখে। মজার কথা কী, জানেন? রোদের সামান্য তেজ পেলেই কিন্তু গলে যায় এই "বরফের-দরজা"। রাতের ঠাণ্ডায় প্যাসেজের মুখ বন্ধ হয়ে যায় আবার।'

'ইন্টারেস্টিং,' মন্তব্য করলেন নেপোলিয়ন। 'এই প্যাসেজ আবিষ্কার করল কে?'

'আমি,' জবাব দিল পেলিটিয়ার।

'হঠাৎ আবিষ্কারের নেশা পেয়ে বসল কেন তোমাকে?'

'আসলে,' কেশে গলা পরিষ্কার করল পেলিটিয়ার, 'আবিষ্কারের নেশা না। গতকাল দুপুরে যখন যাচ্ছিলাম এখান দিয়ে তখন হঠাৎ করেই খুব জোরে...মানে...আর পারছিলাম না আর কী। বাধ্য হয়ে...'

'বুঝতে পেরেছি, সার্জেন্ট। তারপর?'

'কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ করেই দেখতে পাই এই প্যাসেজের মুখ। রোদের তেজে তখন বরফ গলে গলে পড়ছে। কৌতূহল হয় আমার। ঢুকে পড়ি। কিছুদূর যেতে-না-যেতেই...। থাক, আমি বরং আর না বলি। ভিতরে গিয়ে আপনি নিজেই দেখে নিন, জেনারেল।'

লোরনের দিকে তাকালেন নেপোলিয়ন। 'তুমিও ঢুকেছিলে?'

'হ্যাঁ, জেনারেল। এখান থেকে বের হয়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে আমার কাছে গিয়ে হাজির হয় পেলিটিয়ার। জরুরি ভিত্তিতে নিয়ে আসে আমাকে। তখন ভিতরে ঢুকি আমরা। তবে আমি আর পেলিটিয়ার ছাড়া আর কেউ আসেনি।'

'ভালো। যাও, ঢোকো তোমরা। পিছনে আছি আমি।'

প্যাসেজটা আসলে একটা গুহার প্রবেশপথ। যত ভিতরে ঢুকেছে, তত কমেছে উচ্চতা। মাথা নুইয়ে, কিছুটা কুঁজো হয়ে চলতে হচ্ছে নেপোলিয়ন ও তাঁর দুই সঙ্গীকে। ফুট বিশেক এগোনোর 'পর হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল প্যাসেজটা। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত লণ্ঠনের আলোয় দেখলেন নেপোলিয়ন, তুলনামূলকভাবে প্রশস্ত আরেকটা গুহায় হাজির হয়েছেন।

থেমে দু'পাশে সরে গিয়ে নেপোলিয়নকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিলেন লোরন আর পেলিটিয়ার। দু'জনে উঁচু করে ধরে রেখেছেন দুটো লণ্ঠন। জ্বলন্ত লণ্ঠনের হলুদাভ আলো প্রতিফলিত হচ্ছে গুহার চারদিকের দেয়ালে। কেমন অদ্ভুত একটা পরিবেশ।

গুহাটা দৈর্ঘ্যে ষাট ফুট, প্রস্থে পঞ্চাশ, অনুমান করলেন নেপোলিয়ন। চারদিকের দেয়ালে বরফের আস্তর, কোনও কোনও জায়গায় কয়েক ফুট পুরু। আবার কোনও জায়গায় এত পাতলা যে, নীচের ধূসর পাহাড়ি দেয়াল দেখা যাচ্ছে।

গুহার ছাদ থেকে বিন্দু বিন্দু চুনপানি নিঃসৃত হয়ে জমাট বেঁধে তৈরি করেছে স্ট্যালাকটাইটের দণ্ড। কোনও কোনও জায়গায় এ-রকম দণ্ড গজিয়ে উঠেছে মাটি থেকে। সেগুলোকে বলে স্ট্যালাগমাইট। কোথাও আবার, সম্পূর্ণ প্রকৃতির খেয়ালে, স্ট্যালাকটাইট আর স্ট্যালাগমাইট একসঙ্গে হয়ে গড়ে তুলেছে বালিঘড়ির মতো বরফের ভাস্কর্য। গুহার দেয়ালে বা মাটিতে যে-

রকম, ছাদের বরফ সে-রকম না; বরং যথেষ্ট অমসৃণ, লণ্ঠনের আলোয় তারাখচিত আকাশের মতো চকচক করছে। গুহার আরও ভিতরের কোনও জায়গা থেকে শোনা যাচ্ছে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ার টুপটুপ আওয়াজ। কান পাতলে শোনা যায় মৃদু শিস দিয়ে ভিতরে ঢুকছে বাতাস। তারমানে শুধু এই প্যাসেজই না, অন্য কোথাও আরও ছোট এক বা একাধিক প্যাসেজ আছে সম্ভবত।

'চমৎকার,' মন্তব্য করলেন নেপোলিয়ন।

'দেখুন, জেনারেল,' বলে একদিকের দেয়ালের কাছে এগিয়ে গেলেন লোরন। 'এদিকে আসুন। প্যাসেজ থেকে ভিতরে ঢুকে এই জিনিসটা দেখতে পেয়েছে পেলিটিয়ার।'

এগিয়ে গেলেন নেপোলিয়ন। এবার লণ্ঠনটা নিচু করে ধরেছে লোরন। ধাতব কিছু একটা পড়ে আছে বরফাচ্ছাদিত মেঝেতে। আলোর প্রতিফলনে চকচক করছে।

একটা ঢাল। কোনও যোদ্ধার।

ঢালটা লম্বায় পাঁচ ফুট, চওড়ায় দু'ফুট। আকৃতিতে ইংরেজি এইট-এর মতো। বুনুনি-করা বেত দিয়ে বানানো হয়েছে। চামড়া দিয়ে মোড়া। লাল আর কালো কালিতে কতগুলো বর্গক্ষেত্র আঁকা। বর্গক্ষেত্রগুলো পরস্পর জড়াজড়ি করে আছে। অনেক বয়স হয়েছে ঢালটার, ধূসর হয়ে গেছে কালির দাগ।

'প্রাচীন,' বিড়বিড় করে বললেন নেপোলিয়ন।

'আমার অনুমান কমপক্ষে দু'হাজার বছর তো হবেই,' বলল লোরন। 'যতদূর মনে পড়ছে, এ-রকম ঢালকে বলে অ্যাগেরন। পারস্যের পদাতিক সৈন্যরা এককালে ব্যবহার করত এই জিনিস।'

'মাই গড...'

'আরও আছে, জেনারেল,' নেপোলিয়নকে কথা শেষ করার সুযোগ দিলেন না লোরন, দুষ্টুমির হাসিটা হাসলেন আবার।

'এদিকে আসুন।'

স্ট্যালাকটাইটের কয়েকটা কলাম পার হয়ে গুহার আরও ভিতরের দিকে এগিয়ে গেলেন লোরন। বাঁ দিকে একটা টানেলের মতো দেখা যাচ্ছে। টেনেটুনে চার ফুটের মতো উঁচু হবে সেটার ছাদ।

সঙ্গে আনা দড়ির কুণ্ডলী খুলছে পেলিটিয়ার। হাতের লণ্ঠন মেঝেতে নামিয়ে রেখে টানেলের কাছাকাছি একটা কলামের সঙ্গে বাঁধল একটা প্রান্ত।

'নীচে নামতে হবে?' জিজ্ঞেস করলেন নেপোলিয়ন।

মাথা ঝাঁকালেন লোরন। দড়ি ধরে এগিয়ে গিয়ে টানেলের মুখে ধরলেন লণ্ঠনটা। এগিয়ে গেলেন নেপোলিয়নও।

ভিতরে বরফ জমে আছে। উপরিভাগে ফাটল দেখা যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে বরফের দু'ফুট চওড়া একটা ব্রিজ যেন এই টানেলের ভিতর থেকে শুরু হয়ে বাঁক নিয়ে ঢুকে গেছে আরেকটা টানেলে।

'নীচে নেমেছিলে তোমরা?' জানতে চাইলেন নেপোলিয়ন।

আবারও মাথা ঝাঁকালেন লোরন। 'বরফের গায়ে ফাটল দেখে ঘাবড়ানোর কিছু নেই, জেনারেল। নীচে পাথর আছে। তারপরও যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য দড়ি আটকে নিয়েছি। এটা ধরে ধরে খুব সাবধানে নামতে হবে। আমি আগে থাকছি। পিছন পিছন আসুন আপনি।'

টানেলের ভিতরে ঢুকে গেলেন তিনি। কয়েকটা মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন নেপোলিয়ন, তারপর অনুসরণ করতে শুরু করলেন তাঁকে।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে নামছেন দু'জনে। অর্ধেকটা পথ নামার পর কিছুক্ষণের জন্য থামলেন নেপোলিয়ন, এদিক-ওদিক তাকালেন। লোরনের কাছে লণ্ঠন আছে, কিন্তু সেটার আলোয় এই ঘুটঘুটে অন্ধকার কাটছে না, বরং আরও বাড়ছে যেন। কেন যেন বার বার

মনে হচ্ছে ফরাসি সম্রাটের, অন্ধকার একটা গহ্বর গিলে খাচ্ছে তাঁকে। দু'দিকের পাহাড়ি দেয়াল ঢেকে আছে নীলচে বরফে, এগুলো নামতে নামতে ঠিক কোথায় গিয়ে ঠেকেছে বোঝা যাচ্ছে না।

শেষপর্যন্ত পরের টানেলের কাছে এসে হাজির হলেন দু'জনে, ঢুকলেন ভিতরে। আঁকাবাঁকা টানেলটা বিশ ফুটের মতো এগিয়ে শেষ হয়েছে বরফে-ছাওয়া আরেকটা গুহায়। আগের গুহার চেয়ে এই গুহাটা ছোট। কিন্তু ছাদটা আবার যথেষ্ট উঁচু, অনেকটা খিলানাকৃতির। মেঝে প্রায় সমতল।

এখানে দড়ি ধরে থাকার প্রয়োজন নেই আর, তাই ছেড়ে দিয়েছেন লোরন। লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন গুহার মাঝ বরাবর। বরফে-ঢাকা কমবেশি বারো ফুট দীর্ঘ দুটো স্ট্যালাগমাইটের কলামের কাছে গিয়ে থামলেন। ঘুরে তাকালেন সম্রাটের দিকে। কিছু না বলে দৃষ্টি দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন এসে গেছেন জায়গামতো।

ভ্রূ কুঁচকে একটা কলামের দিকে এগিয়ে গেলেন নেপোলিয়ন, যথেষ্ট কৌতূহল বোধ করছেন। কাছে পৌঁছে থেমে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন ভালোমতো।

ভুল ভেবেছিলেন তিনি। এগুলো স্ট্যালাগমাইটের কলাম না। বরং...কিছু একটা...সম্ভবত ধাতব কোনও জিনিস পড়ে আছে মেঝেতে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেটার উপর জমেছে বরফের আস্তরণ।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন নেপোলিয়ন। হাত রাখলেন "কলামটার" গায়ে। লণ্ঠন নিচু করলেন লোরন। কলামের আরেকটু কাছে ঝুঁকলেন নেপোলিয়ন।

সোনালি একটা নারীর মুখ, চোখ দুটো তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ।

এক

মেরিল্যাণ্ড সোয়াম্প, মেরিল্যাণ্ড অঙ্গরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র।

জলাভূমির ধারে বসে আছে রানা। অলসদৃষ্টিতে দেখছে সোহানাকে, মুখে মুচকি হাসি। কোমর-পর্যন্ত প্যাচপেচে কাদাপানিতে দাঁড়িয়ে আছে বেচারি। রানার দৃষ্টি টের পেয়ে ঘুরল হঠাৎ। গালের উপর নেমে-আসা একগুচ্ছ চুল সরাল ফুঁ দিয়ে। কৃত্রিম মুখ ঝামটা মেরে বলল, 'কী দেখছ? আর ওভাবে হাসছই বা কেন?'

'তোমাকে দেখছি,' পিঠ সোজা করে বসল রানা। 'আর হাসছি, কারণ একটা কথা মনে হচ্ছে।'

'কী কথা?'

'হলদে চেস্ট-ওয়েইডারে তোমাকে যা লাগছে না...'

'ছাই লাগছে,' কপট রাগ দেখাল সোহানা। 'এখানে আসতে বাধ্য করেছ তুমি আমাকে...'

'অবজেকশন, ইয়োর অনার। বাধ্য করেছি কথাটা মানতে পারলাম না।'

'অবশ্যই বাধ্য করেছ। কেন, নিজেকে কী মনে করো? কোকিল? কুহু কুহু ডাকবে আর সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়ে যাবে মেয়েরা?'

'না, কোকিল না,' ভুবনভোলানো হাসি হাসল রানা, 'শ্রীকৃষ্ণ। আমার একটা বাঁশি আছে। তাতে ফুঁ দিলে আর কেউ না হোক,

তুমি যে আসবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'ইস্স্...আমার বয়েই গেছে। কী মনে করো, মিথ্যা বলে ছুটি নিয়ে তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি মেরিল্যাণ্ডে—জানে না বুড়ো?'

'জানলে জানুক। ছুটি নিলে একলা বেড়াতে হবে—এ-রকম বাধ্যবাধকতা আছে নাকি আমাদের অর্গানাইজেশনে?'

'কী আছে আর কী নেই তা ঢাকায় ফিরলেই টের পাবে।'

'খুব ভালো কথা। আগে ফিরে নিই, তারপর দেখা যাবে। আপাতত চরমতম সত্য হলো, তোমাকে আসলেই সুন্দর লাগছে।'

সন্তুষ্টির হাসি হাসতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সোহানা। রাগ রাগ ভাব দেখিয়ে বলল, 'ছাই লাগছে।' দুই হাত তুলে দেখাল রানাকে। 'কাদায় ভরা হাত, কাদামাখা চেহারা। চুলেও যে কাদা লেগেছে, না দেখেই বলতে পারি।'

'নাহ্, সোহানা, তোমাকে নিয়ে আমি হতাশ। এত বই পড়ো, মাঝেমধ্যে দু'-একটা কবিতার বই উল্টেপাল্টে দেখো না কেন?'

চোখ পিটপিট করছে সোহানা। 'কীসের কবিতা?'

'তুমি যখন মাখামাখি কাদাপানিতে,' সুর করে বলছে রানা, 'হায় যদি তখন কিঞ্চিৎ জানিতে, ঈর্ষান্বিতা পরীরা কাতরায় স্বর্গে। তোমায় একটিবার দেখিবে বলিয়া, ধরাধাম ছাড়িয়া যে গিয়াছে চলিয়া, সেই মড়া অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে মর্গে।'

'তবে রে...' দু'হাতে কাদা তুলে নিয়ে সমানে রানার দিকে ছুঁড়ে মারতে শুরু করল সোহানা।

হাসতে হাসতে উল্টো ঘুরে বসল রানা। পানির বোতল খুলে কয়েক ঢোক পানি খেল। টের পেল কাদা ছোঁড়া বন্ধ করেছে সোহানা। উঠে দাঁড়াল, খানিকটা হেঁটে গিয়ে নেমে পড়ল কাদাপানিতে।

প্ল্যানটা রানার। কিছুদিন আগে জটিল ও বিপজ্জনক একটা

অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করেছে ও। তারপর বুড়ো মিয়া, মানে মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের কাছে ছুটির আবেদন করেছে। দরখাস্ত মঞ্জুর হতেই চলে এসেছে আমেরিকায়। মেরিল্যাণ্ডে পৌঁছে ই-মেইল করেছে সোহানাকে। বলেছে, বুড়োকে পটিয়ে ছুটি ম্যানেজ করে চলে আসতে। এবার নিখাদ অ্যান্টিক শিকার। সেই সঙ্গে চুটিয়ে...

সাড়া দিতে দেরি করেনি সোহানা।

আজ সকাল থেকে এই জলাভূমিতে নিরলসভাবে খাটছে দু'জনে।

আরও আধঘণ্টা কাদা ঘাঁটার পর সোহানা বলল, 'রানা, তোমার ধারণা সম্ভবত ভুল। আমার মনে হয়, অনর্থক পরিশ্রম করছি।'

'পরিশ্রম করছি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেটা পণ্ডশ্রম না হলেই হয়।'

'মানে?'

'মানে এসব কাজে অনেক ধৈর্য লাগে। পরিসংখ্যান বলে, এই প্রণালীর আশপাশে হাজার চারেক জাহাজডুবি হয়েছে। আমাদের আগেও খুঁজেছে অনেকে। কেউ পেয়েছে, কেউ আবার কিছুই পায়নি। যারা ভালো জিনিস পেয়েছে তারা রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেছে।'

'কিন্তু আমরা আসলে কী খুঁজছি? কোনও ডুবে-যাওয়া জাহাজের মালপত্র? নাকি অন্যকিছু?'

'আমার এক বন্ধু আছে,' সোহানার প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিল না রানা, 'নাম রে হোগান। যদিও বলছি বন্ধু, বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়। ট্রেজার হান্টিং করে পেট চালায়। কিছুদিন আগে অবশ্য অবসর নিয়েছে। সিলভার স্প্রিং শহরে অ্যান্টিকের দোকান আছে ওর।'

'তো?'

'একবার আমাকে একটা ব্রোচ পাঠিয়েছিল হোগান। জিনিসটা আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দেয়। তখনই সিদ্ধান্ত নিই সময়-সুযোগমতো আসবো মেরিল্যাণ্ড সোয়াম্পে।'

'কেন? কী বিশেষত্ব ছিল সেই ব্রোচের?'

'ওটা দেখতে ছিল নাশপাতির মতো। সোনা আর ইয়াশম পাথর দিয়ে বানানো। মালিক এলমা হেস্টার নামের এক মহিলা।'

'কিন্তু জনৈকা এলমা হেস্টারের সঙ্গে আমাদের এই কাদা ঘাঁটাঘাঁটির সম্পর্ক কী?'

'সম্পর্কটা বুঝতে হলে ছোট একটা গল্প শুনতে হবে তোমাকে। এখানকার আঞ্চলিক ইতিহাস বলে, এলমা হেস্টারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল ব্রোচটা। ছিনিয়ে নেয়া মানে ডাকাতি। ডাকাতের নাম শুনেছ কি না জানি না—কুখ্যাত ইভলিন রোয। মহিলার নাম রাখা হয় গোলাপের সঙ্গে মিলিয়ে, সে দেখতেও নাকি গোলাপের মতোই সুন্দরী ছিল। কিন্তু স্বভাব-চরিত্র ছিল জঘন্য। যাকে বলে দস্যুরানি, রোয ছিল ঠিক তা-ই। দল নিয়ে ঘুরে বেড়াত। মেরিল্যাণ্ড আর আশপাশের এলাকায় আঠারো শ' বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। কী গরিব কী বড়লোক—হাতের কাছে যাকেই পেত তারই সর্বনাশ করত।

'আইনের চোখে ধুলো দেয়ার জন্য রোয কর্ণার নামে একটা হোটেল চালু করে সে। ডাকাতি করার সময় মুখোশ পরে থাকত, তাই কেউ কল্পনাও করেনি হোটেলের মালিক আসলে ভয়ঙ্কর ডাকাত।

'যা-হোক, পকেটের ওজন বুঝে খদ্দের তুলত সে নিজের হোটেলে। কেউ মোটা টাকায় প্রস্তাব দিলে তার সঙ্গে বিছানায় যেতেও দ্বিধা করত না। কিন্তু রাত বারোটা বাজলেই ঘুমন্ত

খদ্দেরের গলায় ছুরি চালাত রোয। স্রেফ জবাই করে ফেলত লোকটাকে। চ্যালাচামুণ্ডাদের সহায়তায় লাশটা নিয়ে যেত বেইযমেণ্টে। বাজারে নিয়ে বেচলে দুটো পয়সা পাওয়া যাবে, লাশের গায়ে এ-রকম যা যা পাওয়া যেত, সব হাতিয়ে নিত। পরে লাশটা ওয়্যাগনে করে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিত দূরের কোনও জঙ্গলে।

'ওই সময়ে আমেরিকায়, বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে দাসপ্রথা চালু ছিল। মুক্তির আশায় প্রায়ই পালাত হতভাগা দাসরা। এই মেরিল্যাণ্ড পার হয়েই উত্তরে যেতে হতো ওদেরকে। রাতের আঁধারে চলাচল করত বেচারারা, ওদিকে রাতেই দল নিয়ে বের হতো রোয। নাগালের মধ্যে কোনও দাসকে পেলে সঙ্গে সঙ্গে প্াকড়াও করত তাকে। ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দি করে রাখত হোটেলের গোপন কোনও ঘর কিংবা ডানজনে। পরে ওদের হাত-পা শিকল দিয়ে বেঁধে নিজের ফেরিতে চড়িয়ে পাড়ি দিত অণ্ট্যারিয়ো নদী। জর্জিয়ার দাসবাজারে চড়া দামে বেচে দিয়ে আসত ওদের।

'আঠারো শ' একত্রিশ সালের দিকে ঘটল এক ঘটনা। রোয কর্ণারের কাছের এক ক্ষেতে লাঙল চালাতে গিয়ে কয়েকটা অর্ধগলিত লাশ খুঁজে পেল এক চাষি। এতদিন বুঝি বুঝি করেও আসল ঘটনা বুঝে উঠতে পারছিল না আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা। এবার কোমর বেঁধে লাগল তারা। দুইয়ে দুইয়ে যোগ করে চার বানাতে বেশি সময় লাগল না তাদের। খুন, ডাকাতি আর অপহরণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হলো রোযকে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলো সে। কিন্তু মাত্র চার বছর পর রহস্য-জনকভাবে নিজের কারাপ্রকোষ্ঠে মারা গেল সে। কোনও তদন্ত হলো না সেই মৃত্যুর। কারাকর্তৃপক্ষ তাদের রেকর্ডে লিখল: বিষক্রিয়ায় মরেছে এককালের ভয়ঙ্কর দস্যুরানি ইভলিন রোয।'

'বুঝলাম। কিন্তু এই রোযের...'

হাত তুলে সোহানাকে থামিয়ে দিল রানা। 'কাহিনির বাকিটুকু শুনলেই বুঝতে পারবে কেন তোমাকে নিয়ে এসেছি এখানে। কেন কাদা ঘাঁটাঘাঁটি করছি সকাল থেকে।

'রোযের মৃত্যুর পর ওকে নিয়ে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠল বিশেষ একশ্রেণীর সাংবাদিকরা। মেরিল্যাণ্ড আর আশপাশের এলাকা রীতিমতো চষে ফেলল তারা। ফলে সত্যি ঘটনার পাশাপাশি চালু হয়ে গেল অনেক গল্পও। কেউ বলল, আসলে মরেনি, জেল থেকে পালিয়ে গেছে রোয। এখনও ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে যেখানে খুশি। কেউ দাবি করল, বন্ধ-হয়ে-যাওয়া রোয কর্ণারে নিজচোখে রোযের ভূত দেখেছে। রাস্তার ধারে নাকি ওঁৎ পেতে থাকে সে। অসতর্ক পথচারী পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'যা-হোক, সত্যি অনেক খবরও আবিষ্কার করতে পারল ওই সাংবাদিকরা। কিন্তু প্রায় দশ-বছর-ধরে লুট-করা মালামাল অথবা টাকাপয়সা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে রোয তা বের করতে পারল না। ওর সেই...কী বলবো...গুপ্তধন, রীতিমতো কিংবদন্তিতে পরিণত হলো স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে। কেউ বলে এই সম্পদের পরিমাণ এখনকার বাজারে দশ লক্ষ, আবার কেউ বলে চল্লিশ লক্ষ ডলারের কম না।'

চোখ পিটপিট করছে সোহানা।

মুচকি হাসল রানা। 'এখানে আসার আগে পড়াশোনা করেছি আমি। মেরিল্যাণ্ডের এই অঞ্চলের ইতিহাস ঘেঁটেছি। জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছি ব্রোচটা কোত্থেকে কীভাবে পেয়েছে হোগান। তারপর একটা সিদ্ধান্তে এসেছি।'

'কী?'

'আমার ধারণা, অন্যসব ডাকাতদের মতো রোযও লুটের মাল একজায়গায় রেখেছিল। হয়তো এক বা একাধিক বাক্সে ভরে, ওর

সবচেয়ে গোপন আস্তানায়। কথিত আছে, এই জলাভূমি এবং এর আশপাশের দুই বর্গমাইল এলাকাতে সুরক্ষিত একটা হাইড-আউট গড়ে তুলেছিল সে। তখন কিন্তু এই জায়গা ছিল একটা গোলকধাঁধার মতো। প্যাচপেচে কাদার জলাভূমি ছিল না মোটেও। এখানকার মাটি অনেক আগে থেকেই নরম, ভেজা ভেজা; তখন এখানে ছিল বিক্ষিপ্ত ঝোপঝাড় আর শ্যাওলায় ছাওয়া সাইপ্রেস গাছের জঙ্গল। কেউ কেউ বলে, এখানে একটা চালাঘরও নাকি বানিয়েছিল রোয।'

'তারমানে এবারের ছুটিতে ওই ডাকাতনীর পিছনে লেগেছ তুমি?'

'ভুল বললে। ডাকাতনী তো সঙ্গেই আছে। রোযের কিংবদন্তি তুল্য গুপ্তধনের পিছনে।'

'ধরো খুঁজে বের করতে পারলাম আমরা। তখন কী করবে? যতদূর জানি এসবের ওপর তোমার কোনও লোভ নেই।'

'দান করে দেবো।'

'তা-ই? তোমার লাভটা কী হবে তা হলে?'

'ছুটিতে সারাদিন শুয়েবসে না থেকে ইন্টারেস্টিং কিছু একটা নিয়ে সময় কাটিয়ে দিতে পারবো,' আবার কাজে লেগে পড়ল রানা।

চারদিকে সাইপ্রেস গাছের বড় বড় শিকড়। কাদাপানি ভেদ করে মাথা তুলে আছে। দেখে মনে হচ্ছে কোনও ডাইনোসরের বিচ্ছিন্ন নখর। গেল সপ্তাহে এই পেনিনস্যুলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে এক শক্তিশালী ঝড়। জলাভূমির কোথাও পড়ে আছে গাছ, কোথাও দেখা যাচ্ছে আলগা ডালপালা। দেখলে মনে হয় তাড়াহুড়ো করে বাঁধ বানাতে গিয়ে সব লেজেগোবরে করে ফেলেছে কোনও বীভার। অনতিদূরের জঙ্গলটা পাখির কলকাকলিতে মুখর। কখনও কখনও শোনা যাচ্ছে পাখা

ঝাপ্টানোর আওয়াজ।

হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল রানা। কাদাপানির আরেকটু গভীরে ঢুকে গেল হাত। কিছু একটা লেগেছে ওর হাতে। ধাতব কিছু। ইংরেজি ইউ আকৃতির একটা দণ্ড আছে। হাতড়াচ্ছে রানা। দণ্ডটার সঙ্গে যুক্ত চারকোনা আরেকটা কী যেন লাগছে হাতে। আংটার মতো গোলাকার অন্যকিছুও আছে।

'মনে হয় কোনও তালা,' বিড়বিড় করে বলল রানা।

কথাটা শুনতে পেয়েছে সোহানা। ঘুরল ও। 'ধোঁয়া মানে আগুন,' উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, 'আর তালা মানেই বাক্স।'

'কিংবা সিন্দুক?' জোরে টান দেয়ার চেষ্টা করল রানা। লাভ হলো না। কীসের সঙ্গে যেন আটকে আছে তালাটা। 'তুলতে পারছি না। দেখতেও পাচ্ছি না।'

হেসে ফেলল সোহানা। খানিকটা সরে দাঁড়াল। 'তুলতে না পারার কারণ এতক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম ওটার ওপর। পাথর মনে করে পাত্তা দিইনি। ...এবার তোলো।'

তালাটা তুলে আনল রানা। কাদাপানি পড়ছে ওটার গা থেকে। জিনিসটা রূপার। অনেক দিন পানিতে থাকার কারণে মরচে ধরে গেছে। কী যেন লেখা আছে নীচের দিকে। হাত দিয়ে কাদা মুছল রানা।

'মা-স্টা-র ল-ক,' পড়ল সোহানা, রানার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে।

'স্বীকার করছি জিনিসটা আহামরি কিছু না। সামান্য একটা তালা। আনুমানিক উনিশ শ' সত্তর সালের দিকে বানানো হয়েছে।' আবারও ঝুঁকে পড়ল রানা। সোহানা সরে গেছে, কাজেই তালাটা যে-কড়ার সঙ্গে লাগানো ছিল সেটা তুলে আনতে পারল একটানে। একটুকরো ভাঙা কাঠও উঠে এল। 'বহু পুরনো কোনও গেটপোস্ট,' বলল ও। 'দরজার পাল্লাটা যে-কোনও

কারণেই হোক এই জলাভূমির বুকে আশ্রয় নিয়েছে। পানিতে পচে আলগা হয়ে গেছে কাঠ।' তালা আর কাঠ দুটোই ছেড়ে দিল হাত থেকে। কাদাপানিতে কিছুক্ষণ ভেসে থাকার পর টুপ করে ডুবে গেল ওগুলো।

সোহানার দিকে তাকাল রানা। মুচকি মুচকি হাসছে সোহানা।

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'ছ'টা বেজে গেছে। আজ আর না। চলো ফিরি।'

হাঁপ ছাড়ল সোহানা। 'সেই কখন থেকে কথাটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছি। ভাব দেখে মনে হচ্ছিল ক্লান্তি বলে কিছু নেই, গুপ্তধন নিয়েই ফিরবে।' জলাভূমির তীরের দিকে হাঁটা ধরল ও।

পিছু নিল রানা।

প্রায় আধ মাইল পিছিয়ে এসে তীর থেকে টুকিটাকি জিনিসপত্র তুলে নিল দু'জনে। ছোট্ট একটা মোটরবোটে করে এখানে এসেছে ওরা। কাছের এক উল্টে-পড়া সাইপ্রেস কাণ্ডের সঙ্গে বাঁধা আছে ওটা। নৌকাটাতে উঠে বসল দু'জনে। দড়ির বাঁধন খুলে কাণ্ডের গায়ে জোরে ধাক্কা দিল রানা। তীর থেকে কিছুটা সরে গিয়ে ইঞ্জিনের স্টার্টার কর্ড ধরে টান মারল সোহানা। জোরে ঝাঁকুনি খেয়ে স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। গর্জাল কিছুক্ষণ, তারপর চলতে শুরু করল। হাতল ধরে রেখেছে সোহানা।

সবচেয়ে কাছের শহরটা এখান থেকে তিন মাইল দূরে। নাম ভিক্সবার্গ হিল। ওখানেই একটা হোটেলে উঠেছে দু'জনে।

নৌকা এগোচ্ছে। রানা-সোহানা দু'জনই চুপ করে আছে। মোটরবোট পুরনো হলেও ইঞ্জিনটা নতুন। স্টার্ট নেয়ার সময় যত জোরে গর্জে উঠেছিল এখন আর সে-রকম করছে না। মৃদু একটা শব্দ হচ্ছে একটানা। সারাদিনের খাটুনির পর ওরা ক্লান্ত, তাই কেমন ঝিমুনি চলে এসেছে। সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে। উপরে তাকাল

সোহানা। শেষবিকেলের লালিমা মুছে যাচ্ছে আকাশ থেকে। চারদিকে ছোপ ছোপ অন্ধকার।

হঠাৎ বলে উঠল রানা, 'সোহানা, স্পিড কমাও।'

অন্যমনস্ক থাকায় কিছুটা চমকে উঠল সোহানা, কিন্তু নৌকার গতি কমাল। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

ব্যাগের ভিতর থেকে বিনকিউলার বের করে চোখে তুলল রানা।

গজ পঞ্চাশেক দূরে তীর। সেটা ছাড়িয়ে আরেকটু পিছনে হঠাৎ হারিয়ে গেছে মাটি, অদৃশ্য হয়েছে থকথকে কাদায়। প্রাকৃতিকভাবে লুকানো আরেকটা খাঁড়ি, ভাবল রানা। এ-রকম খাঁড়ি আজ সকাল থেকে কম করে হলেও দশটা দেখেছে ওরা। তবে এই খাঁড়িটা একটু অন্যরকম। এটার মুখের কাছে জট বেঁধে আছে ডালপালা আর ঝোপঝাড়। সম্ভবত গত সপ্তাহের ঝড়ের কারণে উপড়ে পড়েছে গাছ, আটকে গেছে খাঁড়িমুখে।

'কী দেখছ?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'জানি না,' নিচু গলায় বলল রানা। 'মনে হলো কী যেন দেখলাম ওই খাঁড়িতে। বাঁকা একটা...কী যেন। দেখে ঠিক প্রাকৃতিক মনে হয়নি আমার কাছে। ...মোটরবোটটা ওই খাঁড়ির কাছে নিয়ে যেতে পারবে?'

হাল ঘুরাল সোহানা। গতি বাড়াল না। যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে আলগা ডালপালার পরিমাণ বেশি। 'তোমার হ্যালুসিনেশন হচ্ছে না তো?' জিজ্ঞেস করল কৌতুকের ঢঙে। 'আজ সকাল থেকে রোদে পুড়েছ...পানি খেয়েছ ঠিকমতো?'

'আমি সবসময় পরিমাণ মতোই পানি খাই,' একদৃষ্টে খাঁড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা।

খাঁড়িমুখে পৌঁছাতে কিছুটা বাকি আছে, এমন সময় ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল সোহানা। নিজগতিতে এগিয়ে গিয়ে আলগা

ডালপালার সঙ্গে মৃদু ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল মোটরবোট।

দূর থেকে যতটা মনে হয়েছিল খাঁড়িটা তারচেয়ে প্রশস্ত, কমবেশি পঞ্চাশ ফুটের মতো। বড় আর মোটা একটা ডালের সঙ্গে মোটরবোটের গলুইয়ের দড়িটা বেঁধে দিল রানা। তারপর গানওয়েল টপকে নেমে পড়ল কাদাপানিতে।

'কী করছ?' আশ্চর্য হয়ে গেছে সোহানা।

'আসছি। থাকো এখানে।'

'কী দেখেছ না দেখেছ, এখন গিয়ে ভালোমতো দেখবে, আর আমি এখানে ছটফট করতে থাকি, নাকি?'

সোহানা আর কিছু বলার আগেই লম্বা করে দম নিল রানা। তারপর ডুব দিল পানিতে। বিশ সেকেণ্ড পর খাঁড়িমুখের অন্য দিকের পানিতে মাথা তোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। রানার হাঁ করে দম নেয়ার শব্দও শুনতে পেল সোহানা। জিজ্ঞেস করল, 'রানা, ঠিক আছো?'

'অবশ্যই। একটু অপেক্ষা করো। আসছি এক মিনিটের মধ্যে।'

এক মিনিট কাটল। তারপর দুই। কেটে গেল তিন মিনিট। রানার কোনও পাত্তা নেই। নৌকায় উঠে দাঁড়াল সোহানা। দুশ্চিন্তায় ভুগছে।

এমন সময় ডালপালার আড়াল থেকে বলে উঠল রানা, 'সোহানা, এদিকে একটু এসো তো!'

'কিন্তু...আমার কাপড় মাত্র শুকাতে শুরু করেছে। আবার যদি...'

'হ্যাঁ, আবার যদি পানিতে নামো তা হলে কাপড় ভিজবে, কিন্তু এই জিনিস যদি নিজচোখে না দেখো তা হলে পরে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।'

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পানিতে নেমে পড়ল সোহানা।

ডুবসাঁতার দিয়ে কিছুক্ষণ পর হাজির হলো রানার পাশে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

খাঁড়ির দু'পাশে সারি সারি গাছ। বিস্তৃত ডালপালা মাথার উপরে শামিয়ানার মতো তৈরি করেছে। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকার এখানে আরও বেশি বলে মনে হচ্ছে।

'কী?' রানাকে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

গাছের গুড়ির মতো দেখতে কিছু একটা একহাতে জড়িয়ে ধরে আছে রানা। সোহানার প্রশ্ন শুনে অন্যহাতের আঙুল ভাঁজ করে সেটার গায়ে টোকা দিল। ভোঁতা শব্দের বদলে ধাতব আওয়াজ শোনা গেল।

'বুঝতে পারছি না। কী বোঝাতে চাচ্ছ?'

'আমিও শিওর না। এটা মনে হয়...পুরো জিনিসটার ভাঙা এক টুকরো। আরও ভালোমতো দেখতে হবে।'

'কীসের পুরো জিনিস? কী দেখতে হবে?'

'এদিকে এসো,' সোহানার হাত ধরে টান দিল রানা। কাত হয়ে সাঁতরাতে শুরু করেছে। ঢুকে যাচ্ছে খাঁড়ির আরও গভীরে। সরে যাচ্ছে এককোণে। এখানে খাঁড়ির প্রশস্ততা কমে গেছে হঠাৎ করেই। পঞ্চাশ ফুট থেকে যেন একলাফে নেমে এসেছে বিশ ফুটে।

তীরের কাছাকাছি এসে থামল রানা। অনতিদূরে জন্মে আছে বিশাল এক সাইপ্রেস গাছ। কাণ্ডে জড়াজড়ি করে আছে দ্রাক্ষালতা। আঙুলের ইশারায় সেদিকে দেখাল রানা। 'দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল নিচু গলায়।

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে সোহানা। 'না, দেখতে পাচ্ছি না। কেন হেঁয়ালি করছ, রানা? কী দেখতে পেয়েছ সরাসরি বলছ না কেন?'

'ওই যে...সাইপ্রেস গাছটার কাছে...পানির উপরেই তো

ভাসছে। এখনও দেখতে পাওনি?'

'পেয়েছি তো। কিন্তু এটা এমন আহামরি কী বুঝতে পারছি না। এ-রকম হাজারটা...মোটা মোটা ডাল ভাসছে সারা সোয়াম্পে। ...দাঁড়াও...দাঁড়াও। এটা কি ডাল না শিকড়? মাথার কাছটা কেমন...ইংরেজি টি-এর মতো না? আরেকটা কথা। জিনিসটা অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না তোমার কাছে?'

'সোহানা,' ধীর গলায় বলল রানা, 'ভালোমতো তাকাও। অল্প আলোতে সমস্যা হচ্ছে নাকি তোমার?'

রানার বলার ভঙ্গিতে কিছু একটা ছিল, ওর দিকে তাকাতে বাধ্য হলো সোহানা। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল পরমুহূর্তেই। এখন সরু চোখে তাকিয়ে আছে দূরের ওই সাইপ্রেস গাছটার দিকে। বিশেষ সেই "জিনিসটা" কী বুঝতে আরও কয়েকটা সেকেণ্ড লাগল। আস্তে আস্তে মুখটা হাঁ হয়ে যাচ্ছে ওর। 'মাই গড, রানা! এটা...এটা তো...অসম্ভব। এ হতে পারে না। যা দেখছি নিশ্চয়ই ভুল দেখছি।'

'আমরা যা দেখছি ঠিকই দেখছি,' মৃদু হাসল রানা। 'এবং চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি আমাদের সারাদিনের পরিশ্রম বৃথা যায়নি। ওই টি আকৃতির জিনিসটা আর কিছুই নয়, একটা সাবমেরিনের পেরিস্কোপ।'

দুই

খারসোনেসাস কলোনি, ক্রাইমিয়ান পেনিনস্যুলা, ইউক্রেইন।

শহরটা কৃষ্ণসাগরের এক দ্বীপে। এটা দেশের অন্যতম প্রধান নেভাল বেইস আর সমুদ্রবন্দর। এখানে মূলত জাহাজ প্রস্তুত করা হয়, খাবার প্রক্রিয়াজাত করা হয় বিদেশে রপ্তানি করার জন্য এবং কাঠ দিয়ে রকমারি জিনিস বানানো হয়।

নিজের স্টাডিরুমের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত লম্বা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ইভান সিদোরভ। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কৃষ্ণসাগরের দিকে। ঘরটা অন্ধকার। ডিমলাইট জ্বলছে, কিন্তু তা জ্বলা না জ্বলা সমান।

বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। কিন্তু পশ্চিম দিগন্তে, রোমানিয়ান আর বালগেরিয়ান উপকূলের উপরে এখনও লেপ্টে আছে অস্তমিত সূর্যের লালিমা। আকাশে মেঘের আনাগোনা; গুড়ি মেরে আরও উপরে, ক্রমশ উত্তর অভিমুখে বিস্তৃত হচ্ছে। মুহুর্মুহু চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ। কয়েক মাইল বিস্তৃত শত আলোকরশ্মি ক্ষণে ক্ষণে চিরে দিচ্ছে আকাশটাকে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শুরু হবে প্রচণ্ড ঝড়।

যে-সব বোকা জেলে এখনও ফিরতে পারেনি সাগর থেকে, ভাবছে সিদোরভ, তাদের খবর আছে।

ঈশ্বর হয়তো রক্ষা করবেন ওদেরকে। অথবা করবেন না। সিদোরভের ধারণা: ঝড়তুফান, রোগ-মহামারি এবং যুদ্ধ হচ্ছে ঈশ্বরের ছুরি। এই ছুরি দিয়ে তিনি কখনও হাজার, আবার কখনও লক্ষ মানুষ শেষ করে দেন একনিমিষে। সিদোরভ বিশ্বাস করে, জীবনের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করতে জানে না, লড়াই করতে পারে না, তাদের ব্যাপারে কোনও ধৈর্য নেই ঈশ্বরের। ছেলেবেলায় এই শিক্ষা পেয়েছে সে। এবং সারাজীবনেও তা ভুলবে না।

সিদোরভের জন্ম এমন একটা সময়ে, যখন পরমাণু অস্ত্র-বিস্তার রোধচুক্তির রূপরেখা নিয়ে হইচই চলছে পশ্চিমা বিশ্বে। তবে ওই আলোড়নের অনেক বাইরে ছিল ওর জন্মস্থান আমু ডারিয়া, তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আশখাবাদের দূরবর্তী এক গ্রাম।

ছেলেবেলার স্মৃতি ঘাঁটলে সিদোরভের আজও মনে পড়ে গ্রামের প্রান্ত ঘেঁষে শুরু-হওয়া গারাগ্রুম মরুভূমি। রোদের তেজে কাঁপতে-থাকা দিগন্তের পটভূমিতে কোপেটড্যাগ পর্বতমালা। স্থানীয়রা বেশিরভাগই তুলা আর কারাকুল উল দিয়ে হাতে-বানানো কার্পেটের নগণ্য পারিশ্রমিকের মজুর ছিল। মনে পড়ে পাম্প, ইঞ্জিন আর গ্লাসের গুটিকয়েক শিল্পকারখানার কথা। মরুভূমি আর পর্বতের ঢালে মারদাঙ্গা সিনেমা বানানোর উদ্দেশ্যে হাজির-হওয়া শুটিংপার্টি। আরও মনে পড়ে গ্রামের পনেরো-বিশ মাইল দক্ষিণ থেকে শুরু-হওয়া ইরান সীমান্তের কথা।

ওর বাবা ছিলেন একজন কৃষক। সম্ভবত ওদের চোদ্দগুষ্ঠিই ছিল চাষা। মেষপালকও ছিল কেউ কেউ। ইরান এবং তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের সেই অমীমাংসিত ভৌগলিক এলাকায় বসতি ছিল তাঁদের। কোপেটড্যাগের অন্য বাসিন্দাদের মতো তাঁরাও ছিলেন শক্তপোক্ত, পোড়খাওয়া, স্বাবলম্বী এবং স্বাধীনচেতা। ইরানেরও না, সোভিয়েত ইউনিয়নেরও না—নিজেদেরকে তাঁরা অন্য কোনও মুক্তভূমির বাসিন্দা ভাবতেন হয়তো। কিন্তু শীতলযুদ্ধের কারণে এলোমেলো হয়ে গেল সব।

সত্তর দশকের শেষদিকে ইরানে ঘটল বিপ্লব। সিংহাসন হারালেন শাহ। পিঁপড়ার মতো পিল পিল করে হাজার হাজার সোভিয়েত সৈন্য জড়ো হতে লাগল ইরান সীমান্তে। যুবতীর কাপড় যেভাবে টেনেহিঁচড়ে খুলে নেয় ধর্ষণকারী, ঠিক সেভাবে নিজগ্রামের স্বাধীনতা লুণ্ঠিত হতে দেখল ষোলো-সতেরো বছর বয়সী সিদোরভ। যত্রতত্র ক্যাম্প করল রেড আর্মির সদস্যরা। আনা হলো অ্যান্টিএয়ারক্র্যাফট মিযাইল। কর্পূরের মতো উবে গেল আমু ডার্‌য়ার শান্ত পরিবেশ।

আর সোভিয়েত সেনাদের ব্যবহার? বর্ণনা করতে হলে একটাই উপমা আছে—মনিব-গোলাম। রুশ সেনাদেরকে

ছেলেবেলায়-পড়া রূপকথার দানো বলে মনে হতো সিদোরভের। যখন-তখন গ্রামে ঢুকে পড়ত ওরা। এর-ওর বাড়িতে হানা দিয়ে খাবার কিংবা যুবতী মেয়েদের নিয়ে যেত। নিশানা পরখ করার নিয়তে গুলি চালিয়ে উড়িয়ে দিত ভেড়ার খুলি। মাঝেমধ্যে "ইরানি গুপ্তচর" সন্দেহে পাকড়াও করত গ্রামের সম্ভাবনাময় তরুণদের। সেখানে তখন মাত্র কয়েকটি মুসলিম পরিবারের বসবাস।

রুশ সেনাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ ছিল না সিদোরভরাও।

বছরখানেক পর আমু ডারিয়ায় ঢুকল একজোড়া ট্যাঙ্ক। সঙ্গে দুই কম্পানি রেড আর্মি সেনা। কারণ কিছুদিন আগে কে বা কারা রাতের আঁধারে অ্যামবুশ করেছে ওদের আটজন সৈন্যকে।

নতুন-আসা সেনাদের কমাণ্ডার হাতির মতো হেলেদুলে হাজির হলো। গ্রামবাসীদের প্রায় সবাইকে জড়ো করে বাঘের মতো গর্জাল কিছুক্ষণ। তারপর হায়েনার হাসি হেসে বলল, 'আমি জানি না কারা করেছে ওই কাজ। কিন্তু আমি জানি যারাই করে থাকুক তারা এ-গ্রামেই আছে। পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে ওই লোকগুলোকে আমার সামনে হাজির করবে তোমরা। আমার দলের আটজন জোয়ানকে জবাই করা হয়েছে। ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে ওদের অস্ত্র। এমনকী কাপড় আর ব্যক্তিগত জিনিসও বাদ দেয়নি। কাজেই ধরে নাও দোষী লোকগুলোর হাশর হবে এখন। এবং অবশ্যই ওরা নরকে যাবে,' কথা শেষ করে হাতের বেতটা নিজের পাছায় ঘষল কিছুক্ষণ।

সিদোরভ জানত ইরানি কমাণ্ডোদের সহায়তায় গড়ে উঠেছে স্থানীয় প্রতিরোধ যোদ্ধাদের একটা দল। কিন্তু ওই দলে ওদের গ্রামের কারও যোগ দেয়ার কথা শোনা যায়নি। কাজেই ফল যা হওয়ার তা-ই হলো। তথাকথিত "দোষী" লোকগুলোকে হাজির

করা গেল না। গ্রামের সর্দার হাত জোড় করে ক্ষমা ভিক্ষা করল কমাণ্ডারের কাছে। জবাবে লোকটার বুক ছিদ্র করে দিয়ে বের হয়ে গেল কমাণ্ডারের রিভলভারের বুলেট। তা-ও একটা-দুটো না, গুনে গুনে পুরো ছ'টা।

এরপর বিনা নোটিশে গোলাবর্ষণ শুরু করল ট্যাঙ্ক দুটো। ছবির মতো সুন্দর গ্রাম পরিণত হলো নরকে। এখানে-সেখানে ধসে পড়া বাড়িঘর, আগুনের লেলিহান শিখায় আকাশ লাল। রাস্তায় রাস্তায় যুবকদের লাশ। গলিতে গলিতে বিবস্ত্র ধর্ষিত তরুণী। গুমোট বাতাসে অসহায় বুড়ো-বুড়িদের বুকফাটা আর্তনাদ।

সিদোরভ তখন পালাচ্ছে। জানে না ওর বাবা কোথায়, মা কই গেছে। ভাইবোন নিখোঁজ। জানে না, সে নিজে কোথায় যাচ্ছে। শুধু জানে ছুটতে হবে। সঙ্গের উঠতি বয়সী ছেলেছোকরারা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকেই যেতে হবে।

রুশ সেনাদের কবল থেকে পালিয়ে কোপেটড্যাগের জঙ্গলে আশ্রয় নিল ওরা।

কিন্তু ওই জঙ্গল থেকে ওদের গ্রামটা দেখা যায়। দেখা গেল, একটা বাড়িও আস্ত নেই আর। দেয়াশলাই বাক্সের সমান ট্যাঙ্ক দুটো তখনও ছুটে বেড়াচ্ছে গ্রামময়। সেগুলোর নলে কখনও কখনও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। কখনও ঠা ঠা ঠা করে আওয়াজ ওঠে মেশিনগানের। কালো ধোঁয়ার মেঘ ছাড়িয়ে আরেকটু ওপরে তখন ধীর গতিতে চক্কর দিচ্ছে একপাল শকুন। রাজকীয় ভোজের খবর পৌঁছে গেছে ওগুলোর কাছে।

পরদিন ভোরে সিদোরভরা দেখে, আমু ডার্‌য়া যেন নিস্তব্ধ মৃত্যুপুরী। ট্যাঙ্ক দুটো উধাও। মেশিনগানের আওয়াজ নেই। লাল উর্দি-পরা কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সাহস করে জঙ্গল ছেড়ে বের হয় ওরা। ভীরু পায়ে একটু একটু করে এগিয়ে এসে ঢোকে গ্রামে।

বাতাসে কেমন গা-গুলানো গন্ধ। তখনও বেঁচে আছে কেউ কেউ। তবে জীবিতদের সংখ্যা, স্বাভাবিকভাবেই, মৃতদের চেয়ে কম। অনেক খোঁজাখুঁজি করে বাবা-মা'র লাশ পেল সিদোরভ। পালিয়ে একটা গির্জার ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিলেন দু'জনে। ট্যাঙ্কের গোলায় ধসে পড়েছে ছাদ। ভিতরে যে-ক'জন ছিল সবাই ভর্তা হয়ে গেছে।

পাওয়া গেল বোনটাকেও। একটা গোলাঘরের কিনারায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মাথা কাত হয়ে আছে একদিকে। গায়ে একটুকরো সুতোও নেই। সারাশরীরে বেয়োনেটের ক্ষত। মুখ হাঁ। নিষ্প্রাণ দুই চোখ পাশবিক অত্যাচারের সাক্ষী।

লাশটা নিয়ে খাবলাখাবলি করছিল দুটো শকুন। সিদোরভকে এগোতে দেখে কুৎসিত ডাক ছেড়ে সরে গেল খানিকটা। "কাবাব" খাচ্ছিল, তাই "হাড্ডি" দেখে বিরক্ত হয়েছে।

বাবা-মা আর বোনকে দাফন করল সিদোরভ। ওদের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে টের পেল, কে যেন ওর ভিতরটা ধরে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। কান্না আসছে কিন্তু কাঁদতে পারছে না সে। জ্বলছে বুকের ভিতরটা। এই জ্বালা বেদনার না, প্রতিশোধের আগুনের।

গায়ে জোর আর বুকে সাহস আছে—এ-রকম তরুণদেরকে জড়ো করল সিদোরভ, নারী-পুরুষ বাছবিচার করল না। শুরু হলো সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন।

বয়স তখন আঠারো ছুঁই ছুঁই করছে, ওই বিদ্রোহীবাহিনীর নেতা হয়ে গেল সে নিজগুণে। তুর্কমেনিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল ওর নাম। জীবন্ত কিংবদন্তিতে পরিণত হলো সে। সবসময় রাতের বেলায় হামলা করত বলে দলের নাম, কে বা কারা কবিতার ভাষায় রাখল "আঁধারের আততায়ী"। আবার কেউ কেউ বলল, কোপেটডাগ ফাইটার্স।

নাম যা-ই হোক, ওদের অ্যামবুশে মরতে লাগল সোভিয়েত

সেনারা, ধ্বংস হতে লাগল তাদের কনভয়। কোপেটড্যাগ থেকে ভূতের মতো নিঃশব্দে হাজির হয় আঁধারের আততায়ীরা। ঘাপটি মেরে থাকে চিতাবাঘের মতো। যখন হামলা করে তখন প্রতিরোধের উপায় থাকে না শত্রুপক্ষের, পালানো পরের কথা। কাজেই সফলতার হার শতকরা প্রায় এক শ' ভাগ।

ফলাফল: আমু ডারয়া ধুলিসাৎ হওয়ার বছর দেড়েকের মধ্যে সিদোরভের মাথার দাম ঘোষণা করল সোভিয়েত সরকার। বড় বড় নেতাদের ঘুম হারাম করে দিল সে। তাঁদের ঘুম অবশ্য এমনিতেও হারাম হয়ে গিয়েছিল অনেকদিন আগে থেকে। একদিকে ইরান সমস্যা। আরেকদিকে আফগানিস্তান যুদ্ধ। সবশেষে তুর্কমেনিস্তানের গেরিলাবাহিনী।

সিদোরভের একুশতম জন্মদিনের দু'চার দিন আগে-পরে খবর এল ওর সঙ্গে দেখা করতে চায় ইরানি ইন্টেলিজেন্স।

দুঃসাহসী সিদোরভ ছদ্মবেশে গিয়ে হাজির হলো আশখাবাদে। ছোট একটা ক্যাফের এককোনায় বসে পড়ল।

ইরানি লোকটাকে দেখলে কেউ বলবে না এ-লোক গুপ্তচর। বলবে, গোবেচারা কোনও স্কুলশিক্ষক। শুধু সদাচঞ্চল দু'চোখে আশ্চর্য দ্যুতি। চুলে, জুলফিতে, এমনকী অসমান পুরু গোঁফেও সাদা সাদা ছোপ।

অকপটে নিজের পরিচয় দিল লোকটা, 'আমাকে সবাই কর্ণেল বলে ডাকে। বলা বাহুল্য, আমি আই.আর.ও.আই.আই.এম.-এর একজন এজেন্ট।'

'আমাকে তলব করার কারণ?' শীতল গলায় জানতে চায় সিদোরভ।

'আমরা আপনাকে অস্ত্র দেবো। গোলাবারুদ দেবো। দরকার হলে আপনার লোকদেরকে ট্রেনিং দেবো। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যা যা চাইবেন সব দিতে রাজি আছি।'

'বিনিময়ে আমাকে কী দিতে হবে?' কর্ণেলের নিস্পৃহ বাচনভঙ্গিতে সূক্ষ্ম ফাঁদ টের পায় সিদোরভ।

'কিচ্ছু না। আপনি শুধু লড়াই চালিয়ে যাবেন। ইরান আর তুর্কমেনিস্তানের ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রায় এক। অস্ত্রের জোরে ধরাকে সরা মনে করছে রুশরা। দেখুন কী অবস্থা করেছে ওরা আফগানিস্তানের। আপনাদের ওপরও অত্যাচারের স্টীমরোলার চালাচ্ছে। এমনকী নাক গলাচ্ছে আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়েও। কাঁহাতক সহ্য করা যায় এসব, বলুন?'

সিদোরভ নিশ্চুপ।

'এসবের দাঁতভাঙা জবাব দিতে চাই আমরা,' বলে চলল কর্ণেল। 'এবং এ-কাজে আমাদের অর্গানাইজেশনের পছন্দের তালিকায় আপনি প্রথমে আছেন।'

প্রস্তাবটা গ্রহণ করল সিদোরভ।

পরের পাঁচ বছরে তুর্কমেনিস্তানের ইতিহাসে রচিত হয় ওর বীরত্বগাথা। আর রুশরা বলাবলি করে, মানসিক বিকারগ্রস্ত এক জল্লাদের আবির্ভাব হয়েছে আশখাবাদের প্রত্যন্ত জনপদে। কথাটা ঠিক বা বেঠিক যা-ই হোক, কর্ণেলের ছত্রছায়ায় আঁধারের আততায়ীদের কাছে নাস্তানাবুদ হতে থাকে লাল উর্দিবাহিনী।

কর্ণেলের সঙ্গে দিনে দিনে সম্পর্ক আরও গাঢ় হয় সিদোরভের। পারস্য ইতিহাস সম্পর্কে ওই লোকের পাণ্ডিত্য মুগ্ধ করে তাকে। অবসরে সিদোরভকে অনেক গল্প শোনায় সে। ওগুলোর মূল কথা: তিন হাজার বছর আগে ক্যাস্পিয়ান সাগর থেকে কৃষ্ণসাগরের বেসিন হয়ে গ্রীস, উত্তর আফ্রিকা আর মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ জায়গায় বিস্তৃত হয়েছিল পারস্য সাম্রাজ্য। শক্তিশালী গ্রীকদের পরাজিত করেন সম্রাট যারক্‌সিয। থার্মোপিলির যুদ্ধে স্পার্টানদের বলতে গেলে থেঁতলে দেন তিনি। কাকতালীয় ব্যাপার হচ্ছে, কোপেটড্যাগের পাদদেশেই নাকি জন্ম

হয়েছিল ওই পারস্য সম্রাটের। তাঁর বংশধররা আজও রয়ে গেছে সেখানে। হতে পারে সিদোরভ নিজেও যারক্‌সিযের বংশধর।

শেষের কথাটা কোনওদিনও ভুলতে পারেনি সিদোরভ। পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে সে, নির্দেশনা দিয়েছে নিজের গেরিলাদের, কখনও নিজে অংশ নিয়েছে যুদ্ধে, কিন্তু সবসময় ওর মাথায় ছিল—আমি যারক্‌সিযের বংশধর।

গেরিলাদের হাতে নাকানিচুবানি খেতে খেতে শেষপর্যন্ত উনিশ শ' নব্বইয়ের দিকে সীমান্ত অঞ্চল থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় সোভিয়েত সরকার। এ-ঘটনার বছরখানেকের মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন। জন্ম নেয় অনেকগুলো স্বাধীন দেশ।

কিন্তু সিদোরভের লড়াইয়ের নেশা তখনও একবিন্দু কমেনি। সে ভেবে দেখল, আমু ডারিয়ায় ফিরলে মেষপালক ছাড়া আর কিছুই হতে পারবে না। কর্ণেলের সঙ্গে পরামর্শ করল তখন। চলে এল ইউক্রেইনে। ক্রাইমিয়ান পেনিনস্যুলায় খারসোমেসাস কলোনিতে থাকতে শুরু করল। সোভিয়েত সাম্রাজ্যের পতন ঘটায় এ-শহর তখন কৃষ্ণসাগরের বুনো-পশ্চিম।

যে মানুষটা এককালে ছিল বিপ্লবীদের নেতা, তুর্কমেনিস্তানের জীবন্ত কিংবদন্তি, শোষিত-বঞ্চিত লোকদের দেবতা, পেটের তাগিদে সে হয়ে গেল ইউক্রেনের অন্যতম কুখ্যাত কালোবাজারি। কর্ণেল হয়তো ভালো পথ দেখাতে পারত, কিন্তু কেউ কি আম খেয়ে আঁটি তুলে রাখে? সে তার ব্যাপারে আর বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতে রাজি নয়। কাজেই নিজের নেতৃত্বগুণ, নৃশংসতা আর সহজাত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বদৌলতে কালোবাজারির পাশাপাশি ভয়ঙ্কর মাফিয়াসর্দারে পরিণত হতে বেশি সময় লাগল না সিদোরভের। ওর দলের নাম হয়ে গেল লাল মাফিয়া।

বয়স তখন মাত্র সাতাশ। অথচ সিদোরভের নামে

তুর্কমেনিস্তান থেকে ইউক্রেইন পর্যন্ত কাঁপে। ওর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে গড়াগড়ি খায় লক্ষ লক্ষ ডলার। সুদেআসলে তা দিন দিন বাড়তে থাকে।

অবসরে নিজের খাসকামরায় বিশাল স্যুইভ্‌ল চেয়ারে হেলান দেয় সিদোরভ। যে-কথাটা ওর মাথায় গেঁথে দিয়েছে কর্ণেল, সেই কথাটা নিয়ে ভাবে।

মহান যার্‌ক্‌সিয কি আসলেই ওর পূর্বপুরুষ? তিনি কি সত্যিই কোপেটড্যাগের কোলে জন্মেছিলেন? আমু ডার্‌য়ার যে-সব রাস্তায় ছেলেবেলায় দৌড়ে বেড়িয়েছে সিদোরভ সে-সব রাস্তা দিয়ে যার্‌ক্‌সিযও কি হেঁটে গেছেন? মনোরম পাহাড়ি দৃশ্য দেখে কতবার মুগ্ধ হয়েছে সিদোরভ, যার্‌ক্‌সিযও তাই হয়েছিলেন? নিশ্চয়ই তাই।

'ইশ্‌শ্‌...' বিড়বিড় করে বললেও লোম দাঁড়িয়ে যায় সিদোরভের, 'আমার গায়ে তা হলে রাজবংশের রক্ত?'

টাকার অভাব নেই। প্রশ্নটার জবাব পেতে দু'হাতে খরচ করতেও দ্বিধা করেনি সিদোরভ। কাঁচা টাকা হাতে পেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ইতিহাস বিশারদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ আর জিনিয়ালজিস্টরা।

গড়াতে গড়াতে সিদোরভের বয়স এসে ঠেকল চল্লিশে। শেষপর্যন্ত মনের মতো উত্তর জানতে পারল সে একদিন।

হ্যাঁ, ওর পূর্বপুরুষদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক ছিল মহান যারক্‌সিযের নাতিপুতির কারও।

এরপর একরকম "পারস্য-জ্বর" আচ্ছন্ন করে ফেলে সিদোরভকে। মদের পাত্র কিনতে হবে? আনো কোনও পারস্য অ্যাণ্টিক। ঘর সাজাতে হবে? দেখো বাজারে প্রাচীন পারশিয়ান কিছু পাওয়া যায় কি না। খবর পেয়ে অচিন্তনীয় দামে যোগাড় করেছে সে একটা পাথরের বেদি। এই বেদি নাকি ব্যবহার করেছেন জনৈক পারস্য রাজা। যোগাড় করেছে রত্নখচিত একটা

ঢাল। কথিত আছে ঢালটা স্বয়ং যারক্‌সিযের। নিজের বিলাসবহুল ম্যানসনের এক ঘরে ব্যক্তিগত জাদুঘর গড়ে তুলেছে সিদোরভ। এ-ঘরের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত শুধু পারশিয়ান জিনিস।

এখানে কাউকে ঢুকতে দেয় না সে। কেন দেবে? ওর কাছে যা বংশগৌরবের প্রতীক অন্য সবার কাছে তার কী মূল্য? কাজেই যেচে পড়ে অপমানিত হওয়ার দরকারটা কী?

স্টাডিরুমের জানালার কাঁচে বিদ্যুচ্চমকের প্রতিফলন। কালো মেঘটা আরও কাছিয়ে এসেছে। ঠাণ্ডা বাতাস আসছে একটু পর পর। ঝড় এল বলে। দূরে কোথাও কানে তালা লাগিয়ে বাজ পড়ল।

'আরেকটা জিনিস বাকি রয়ে গেছে এখনও,' অশান্ত পেনিনস্যুলার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে নিজেকে মনে করিয়ে দিল সিদোরভ, 'এবং সেটা হাসিল করতেই হবে আমাকে।'

'পারডন মি, স্যর,' পিছন থেকে শোনা গেল পরিচারক পাভেলের কণ্ঠ।

চমকে উঠল সিদোরভ। ঘুরে তাকাল। বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'তোমাকে না এক শ'বার বলেছি দরজায় টোকা না দিয়ে ভিতরে ঢুকবে না?'

'দিয়েছিলাম, স্যর,' কাঁচুমাচু হয়ে গেছে পাভেল। 'আপনি শুনতে পাননি। সে-জন্যই...'

'কী সমস্যা?'

'মিস্টার নিয়াযভ ফোন করেছেন।'

'আমার ডেস্কের সেটে ট্রান্সফার করো।'

ছুটে বের হয়ে গেল পাভেল। কিছুক্ষণ পর বেজে উঠল সিদোরভের ডেস্কের সুদৃশ্য টেলিফোনটা।

রিসিভার কানে ঠেকাল সে। 'খারাপ খবর থাকলে বলবে না,

নিয়াযভ।'

'না, খারাপ না, স্যর। এবার পাকা খবর দিয়েছে আমার সোর্স। ওই শহরে একটা অ্যান্টিকের-দোকান চালায় লোকটা। যে ওয়েবসাইটে ওই ছবিটা পোস্ট করেছে...'

'সেটা অ্যান্টিক ডিলার আর ট্রেজার হাণ্টারদের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত একটা ফোরাম,' নিয়াযভের কথাটা শেষ করে দিল সিদোরভ। 'পুরনো কথা বাদ দিয়ে নতুন কিছু থাকলে বলো। ভাঙা বোতলটার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে কেউ?'

'দেখিয়েছে। কিন্তু সেটা তেমন কিছু না। এখন পর্যন্ত সবাই একমত, ওটা ভাঙা একটা বোতলের বেশি কিছু না।'

'ভালো। তুমি কোথায়?'

'নিউইয়র্কে। প্লেনে উঠবো।'

সিদোরভ হাসল। 'সবসময় একধাপ এগিয়ে?'

'একধাপ এগিয়ে থাকার জন্যই আমাকে বেতন দেন আপনি, স্যর।'

'এবং আমি যা চাচ্ছি তা যদি যোগাড় করে দিতে পারো তা হলে বোনাসও আছে।'

'থ্যাঙ্ক য়্যু, স্যর।'

'তোমার প্ল্যানটা বলো তো শুনি। কীভাবে পাকড়াও করবে ওই অ্যান্টিক ডিলারকে?'

নীরবতা। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে সিদোরভ, সুপরিচিত একটা নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠেছে নিয়াযভের ঠোঁটের কোনায়।

'স্যর, আমি সবসময় আন্-তক্তা-মার্-পেরেক তত্ত্বে বিশ্বাসী। পদ্ধতিটা ভালো না?'

জবাব দেয়ার আগে একটু ভাবল সিদোরভ। গত বারো বছর ধরে ওর হয়ে কাজ করছে নিয়াযভ। যত নোংরা আর নিষ্ঠুর কাজই হোক, করতে কোনওদিন দ্বিধা করেনি রাশার

গোয়েন্দাসংস্থা স্পেটস্‌নায-এর সাবেক এই সদস্য। এবং কোনও কাজেই ব্যর্থ হয়নি কখনও।

'তক্তা এনে পেরেক মারো আর যেভাবে খুশি সেভাবে করো,' নিয়াযভের চেহারাটা আরেকবার কল্পনা করে নিয়ে বলল সিদোরভ, 'আমার কাজ হওয়া দিয়ে কথা। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। সাবধানের মার নেই।'

'মনে আছে, স্যর। সে-জন্যই আমি টিকে আছি, আপনি টিকে আছেন। আর আপনার শত্রুরা কবরের আজাব ভোগ করছে।'

'হুঁ। রাখো এখন। কোনও খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।'

'জানাবো, স্যর।'

রিসিভার নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল সিদোরভ, এমন সময় একটা কথা মনে হলো হঠাৎ করে। 'হ্যালো, নিয়াযভ? লাইনে আছো?'

'আছি স্যর।'

'এই লোকের দোকান কোথায় যেন? আমরা যেখানে অনুমান করেছি তার ধারেকাছে নাকি?'

'অবশ্যই, ধারেকাছে।'

'নাম কী শহরের?'

'সিলভার স্প্রিং।'

তিন

ভিক্সবার্গ হিল।

হোটেলের রিসেপশনে, সিঁড়ির কাছের দেয়ালে হেলান দিয়ে

দাঁড়িয়ে আছে রানা। একটা রেস্টুরেন্টে ডিনার করার জন্য রিযার্ভেশন আছে ওদের। ঘড়ি দেখল ও। দেরি করিয়ে দিয়েছে সোহানা। রুম থেকে বেরিয়ে হাত ধরাধরি করে নামছিল, হঠাৎ তার মনে হলো, পোশাকটা তেমন মানানসই হয়নি। একছুটে আবার ফিরে গেছে রুমে। কাপড় পাল্টাচ্ছে এখন।

হোটেলের লবিটা দেখতে কেমন অদ্ভুত। মনে হয় অপরিকল্পিত। কিন্তু এটাই নাকি মূল নকশা। এখনকার আর্কিটেক্টদের চিন্তা বোঝা মুশকিল। লোকের দৃষ্টিতে যা বিতিকিচ্ছি, ওদের ভাষায় সেটাই ক্ল্যাসিক। লবির দেয়ালে ঝুলছে স্থানীয় চিত্রশিল্পীদের আঁকা জলরঙের বিভিন্ন ল্যাণ্ডস্কেপ। অনতিদূরের জ্বলন্ত ফায়ারপ্লেসে ফটাস্ করে ফাটল একটুকরো কাঠ। মাথার উপরের লুকানো লাউডস্পিকারে মৃদু ভলিউমে বাজছে কেল্টিক লোকসঙ্গীত।

সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। মুখ তুলে তাকাল রানা। দ্রুত পায়ে নামছে সোহানা। পরনে মাখনরঙা ট্রাউজার। সঙ্গে গোলাকার আঁটসাঁট উঁচু গলাওয়ালা কাশ্মীরি সোয়েটার। কাঁধে জড়িয়েছে লালচে-বাদামি একটা শাল। টাট্টুঘোড়ার লেজের মতো করে ঝুঁটি করেছে কালো চুল। হালকা মেকাপ নিয়েছে।

রানার পাশে এসে দাঁড়াল সোহানা। 'সরি, রানা। বেশি দেরি করে ফেলেছি?'

'ক্ষমা করা গেল,' রানার গলায় কপট গাম্ভীর্য। 'কারণ তোমাকে দেখাচ্ছে, যাকে বলে...'

'আবার?' হেসে রানার হাত জড়িয়ে ধরল সোহানা। 'চলো।'

ওর দিকে কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল রানা। 'তুমি আসলেই সুন্দরী।'

'চুপ!' রানার হাত ধরে টান দিল সোহানা। 'কীভাবে যাচ্ছি

আমরা? হেঁটে না গাড়িতে?'

'হেঁটে। আকাশে আধখানা চাঁদ। বাতাসে লাইলাকের হালকা সুবাস। চারদিক চুপচাপ। আমার পাশে তুমি। এত সুন্দর রাত জীবনে আবার কবে আসবে কে জানে!'

'তোমার মাথা!' সোহানার চকচকে চোখ বিশ্বাসঘাতকতা করছে ওর মুখের সঙ্গে। 'বলো, আরেকবার যাতে টিকিট খেতে না হয় সে-ভয়ে আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছ।'

জলাভূমি থেকে ফেরার পথে ঝামেলা হয়েছে। মালিকের কাছে মোটরবোট জমা দিয়ে ভাড়া-করা বি.এম.ডাব্লু. হাঁকিয়ে ফিরছিল ওরা। ডিনারের কথাটা ঘুরপাক খাচ্ছিল রানার মাথায়। স্পিডলিমিট ছাড়িয়ে গেছে ও। পড়বি তো পড় মালির ঘাড়ে—লোকাল শেরিফ তখন রাস্তার ধারে একটা বিলবোর্ডের আড়ালে বসে বোলোনিয়া স্যাণ্ডউইচ গিলছিল... আর যায় কোথায়!

'হুঁ, উড়িয়ে দেয়া যায় না কথাটা,' স্বীকার করল রানা।

হোটেলের বাইরে চলে এল দু'জনে।

শীত বিদায় নিয়েছে। তারপরও বসন্তের বাতাসে লেপ্টে আছে ঠাণ্ডা। তবে হাড়কাঁপানো না। ফুটপাথের ধারে ঝোপ। আড়াল থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝির ডাক। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে আলোপ্রেমী পতঙ্গের ভিড়।

রেস্টুরেন্টটা বেশি দূরে না। মাত্র দুই ব্লক পরে। হেঁটে গেলে পাঁচ মিনিট লাগে। মালিক ইটালিয়ান বংশোদ্ভূত। রেস্টুরেন্টের ভিতরের চেয়ে বাইরেটা বেশি সুন্দর। কারণ ভিতরে সিগারেটের গাঢ় ধোঁয়া আর পানোন্মত্তদের খিস্তিখেউড়। কিন্তু বাইরে সবুজ-সাদা শামিয়ানার নীচে মৃদুমন্দ খোলা বাতাস। সঙ্গে আলো-আঁধারিতে ভরা রোমান্টিক পরিবেশ।

নির্দিষ্ট টেবিলে মুখোমুখি দুটো চেয়ার। বসল ওরা। খাবারের

অর্ডার দেয়ার দায়িত্ব সোহানার উপর ছেড়ে দিল রানা। পকেট থেকে প্যাকেট আর লাইটার বের করে একটা সিগারেট ধরাল।

'তারপর?' চেয়ালে হেলান দিল সোহানা। 'কী দেখলাম বিকেলে?'

'একটা সাবমেরিন।'

এদিক-ওদিক তাকাল সোহানা। 'আস্তে বলো। কেউ শুনে ফেললে?'

'আস্তেই বলছি। তা ছাড়া কেউ নেই আশপাশে। থাকলেও বাংলা বুঝত কি না সন্দেহ।'

'প্রশ্ন হচ্ছে, সাবমেরিনটা ওখানে কেন?'

'এই প্রশ্নের জবাব বের করতে হবে আমাদেরকে,' নাকমুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছেড়ে নিঃশব্দে হাসল রানা। 'হবে না?'

হাসল সোহানাও। 'ইভলিন রোযের কী হবে তা হলে?'

'আপাতত কিছু না। বেচারীকে কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে আর কী।'

'সাবমেরিনের ঠিকানা লাগাবে কীভাবে?'

'অপিকে বলবো। রহস্য আর ইতিহাসের উপর ভালো দখল আছে মেয়েটার। এসব ব্যাপারে আগ্রহও আছে।'

ইয়োরোপ-আমেরিকার বড় বড় শহরে রানা এজেন্সির শাখা আছে। কয়েক জায়গায় আছে সেইফহাউস। গড়ে তোলা হয়েছে পৃথিবীখ্যাত ইন্টেলিজেন্সগুলোর আদলে। ইটালির বারিতে আছে এ-রকম একটা। সেখানে স্বামী রবিনকে নিয়ে থাকে বাংলাদেশী মেয়ে অপি।

নেহাৎ ঘটনাচক্রে রবিনের সঙ্গে পরিচয় রানার। বছর পাঁচেক আগে একটা মিশনে গিয়েছিল বারিতে। সেখানেই তুমুল ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েছিল রবিন কতগুলো বখাটের সঙ্গে। ওই রাস্তা দিয়ে যখন রানা যাচ্ছিল, তখন সিরিয়াস মারপিটে রূপ নিয়েছে কলহ।

হঠাৎ রবিনের মুখে অকথ্য একটা বাংলা গালি শুনেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ও। তারপর যা হবার হয়েছে।

জখমগুলোয় স্যাভলন লাগিয়ে নিয়ে একটা কফি হাউসে গিয়ে ঢুকেছিল ওরা। জানা গেল, সংসারের প্রয়োজনে দিনমজুরের চাকরি করতে ইটালি এসেছে বি.কম. পাস হাসিখুশি বাংলাদেশী যুবক। বেশ অনেকদিন ধরেই আছে। পরে বিয়ে করে বউকেও নিয়ে এসেছে। ইচ্ছা আছে এখানে স্থায়ী হবে।

কাজ শেষে রবিন-অপির সংসারে একদিন না গিয়ে পারেনি রানা। রবিনের কামাইয়ের প্রায় সব টাকাই চলে যাচ্ছে দেশে। পড়ি পড়ি করছে এ-রকম একটা বাড়ির স্যাঁতসেঁতে একতলায় বারো বাই দশ ফুটের একটা ঘরে থাকছে ওরা। একমাত্র দরজাটাও যেখানে আটকানো যায় না ঠিকমতো, "অন্দরমহলের" বর্ণনা দেয়া সেখানে বাহুল্য। রবিন বের হয় কাকডাকা ভোরে। রাত দশটা-এগারোটার আগে ফেরে না। অপি সারাদিন একঘরে বন্দি। নিরাপত্তা বলে কিছু নেই।

ওদের অবস্থা দেখে মায়া হয় রানার। অপির বুদ্ধিমত্তায় আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে চমক লাগে। মেয়েটা ইতিহাসে পড়ত। মেধাবী ছাত্রী। কিন্তু অনার্সও শেষ করতে পারেনি। প্রবাসী ছেলের কাছে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে বাপ-মা।

নিজের পরিচয় তখন কিছুটা বলে রানা রবিন-অপিকে। বারিতে একটা সেইফহাউস খোলার চিন্তা করছিল ও অনেকদিন থেকে, নতুন কাউকে নেবে ভাবছিল। অপিকে বেছে নেয়। ভালো জায়গায় থাকতেও পারবে মেয়েটা, ভালো বেতনও পাবে। বিনিময়ে মূলত গবেষণাধর্মী কাজ করতে হবে।

প্রস্তাবটা লুফে নেয় অপি। ওর উপযুক্ত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে রানা। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারে, রত্ন চিনতে ভুল করেনি।

'হোটেলরুমে তুমি যখন গোসল করছিলে,' আরও একবার ধোঁয়া ছাড়ল রানা, 'আমি তখন কিছুটা পড়াশোনা করেছি।'

'ওই সাবমেরিনের ব্যাপারে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'হুঁ। যা জানতে পেরেছি তাতে আমার কী মনে হয় জানো? এবারের ছুটিটা জমবে।'

খাবারের ঝুড়ি নিয়ে হাজির হলো ওয়েটার। ঝুড়িতে গরম চিবাটা, মানে, একজাতের ইটালিয়ান রুটি। সঙ্গে বড় একটা পিরিচে জলপাইয়ের তেল। ওয়েটারের আরেকহাতে বড় ট্রে। তাতে লাল সস মেশানো ক্যালামারি। আছে পরসিনি মাশরুম। শেষে ক্রিম সস মাখানো ভাপ-ওঠা গলদা চিংড়ি। সুদৃশ্য ছোট্ট বালতিতে কেজিখানেক বরফের ভিতরে শ্যাম্পেনের গাঢ় সবুজ বোতল।

শেষবারের মতো টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে জ্বলন্ত সিগারেটটা পিষে মারল রানা।

ছিপি খুলে দিয়ে ওয়াইনগ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে দিল ওয়েটার। বোতলটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ছোট করে নড করল। তারপর বিদায় নিল। হাত বাড়িয়ে রুটির ঝুড়িটা তুলে নিল রানা।

'ছুটি জমবে মানে?' একচুমুক শ্যাম্পেন খেল সোহানা।

'মানেটা বুঝতে পারবে পরে। আপাতত জেনে রাখো, ওটা ফুল সাইজের সাবমেরিন না। হতে পারে না। কারণ ওই কাদাপানির খাঁড়িতে বড় কোনও সাবমেরিন ঢুকতে পারবে না। তা ছাড়া পেরিস্কোপটাও অনেক ছোট।'

'তারমানে ওটা কী? কোনও মিনি-সাব?'

'সে-সম্ভাবনাই বেশি। শুরু করো। খেতে খেতে কথা বলি।'

রুটির টুকরোয় জলপাইয়ের তেল মাখাতে মাখাতে বলল সোহানা, 'পেরিস্কোপটা খেয়াল করেছ? অনেক পুরনো মনে হলো না?'

'অনেক মানে? বলো কয়েক যুগ। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না।'

'কী?'

'যতদূর জানি সাবমেরিন ব্যবহৃত হয় মূলত দুটো কাজে। হয় যুদ্ধে নয়তো জরিপে। যেগুলো জরিপ করে সেগুলোকে বলে কমার্শিয়াল সাব। কিন্তু ওগুলোর পেরিস্কোপ থাকে না।'

'কেন?'

'দরকার নেই তাই।'

'তারমানে ওটা মিলিটারি সাব,' তেল-লাগানো রুটির টুকরোটা রানার প্লেটে রাখল সোহানা। আরেকটা টুকরো তুলে নিল নিজের জন্য।

'হতে পারে,' রানা অন্যমনস্ক।

'একটা মিলিটারি মিনি সাবমেরিন,' নিচু গলায় বলছে সোহানা। 'মেরিল্যাণ্ড প্রণালী থেকে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল ভিতরে কাদাপানির খাঁড়িতে দেখা গেছে। আপাতদৃষ্টিতে পরিত্যক্ত। অনেক পুরনো। ওটা কাদের? কেন এসেছিল ওরা ওই জায়গায়? কী করছিল লোকগুলো? ...নাহ্, রানা, মনে হয় ঠিকই বলেছ। এই রহস্যের পিছনে লাগলে এবারের ছুটিটা জমতে বাধ্য।'

হেসে রুটির টুকরোয় কামড় দিল রানা। 'ডিনারের পর চলো সিলভার স্প্রিং-এ যাই।'

'তোমার বন্ধু হোগানের সঙ্গে দেখা করতে?'

'হুঁ। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখি কিছু জানা যায় কি না। এসব বিষয় এখানকার অন্য যে-কারও চেয়ে ওর ভালো জানার কথা।'

'ওখানে যেতে সময় লাগবে কিন্তু। রাত ক'টা বাজবে ভেবেছ? এত রাতে তোমার বন্ধু না আবার বিরক্ত হয়।'

'ও এমনিতে একটু আত্মকেন্দ্রিক টাইপের। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা তেমন পছন্দ করে না। কিন্তু যাদেরকে বন্ধু মনে করে

তাদেরকে যথেষ্ট খাতির করে। ইন্টারপার্সোনাল স্কিলে ঘাটতি আছে ওর।'

'মানুষের সঙ্গে খাতির না থাকলে অ্যান্টিকের দোকান চালায় কী করে?'

'ওই যে বললাম, স্থানীয় ইতিহাসে ও রীতিমতো পণ্ডিত। ওর কাছে অনেক কিছু জানার জন্য যায় লোকে। নিজের ব্যবসায়িক বুদ্ধিটা কাজে লাগিয়ে নেয় ও তখন।'

'এত রাতে আমাদেরকে দেখে সারপ্রাইয্‌ড্ হয়ে যাবে তোমার বন্ধু।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কিছুটা সারপ্রাইযে ওর ক্ষতি হবে না!'

চার

ডিনার সেরে হোটেলে ফিরে এল রানা-সোহানা। বি.এম.ডাব্লুর চাবিটা রুম থেকে নিল রানা। তারপর ফোন করল হোগানকে। কিন্তু কোনও সাড়া পেল না।

'কী ব্যাপার?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'তোমার বন্ধু ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'এত তাড়াতাড়ি তো ঘুমানোর লোক ও না! কী হয়েছে কে জানে! চলো যাই আমরা। ঘুমিয়ে পড়লেও অসুবিধা নেই। আমাকে দেখলে বিরক্ত হবে না।'

সিলভার স্প্রিং-এর উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল দু'জনে। শহর ছাড়িয়ে আসতে বেশি সময় লাগল না। হাইওয়ে ধরে ছুটছে

ওদের গাড়ি।

এখানকার আবহাওয়ার মতিগতি বোঝা মুশকিল। আকাশ একটু আগেও পরিষ্কার ছিল। এখন মেঘের আনাগোনা। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিও পড়ছে। ওয়াইপারটা চালু করে দিল রানা। ঠাণ্ডা টের পাওয়া যাচ্ছে এবার। শালটা ভালোমতো জড়িয়ে নিল সোহানা। ভ্রূকুটি করল ও। 'রানা, আমার মনে হয় আবারও স্পিডলিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছ তুমি।'

'না, ঠিকই আছে,' আশ্বস্ত করল রানা। 'চিন্তা কোরো না।'

'রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে আছে...'

'অ্যাক্সিডেন্টের ভয় করছ? কখনও ও-রকম কিছু শুনেছ আমার ব্যাপারে?'

'কেন? গত অ্যাসাইনমেন্টেই তো...'

'দোষ আমার না। ডাম্পট্রাক নিয়ে যে-খ্যাপাটে লোকটা তাড়া করছিল, তার। তা ছাড়া একটা টায়ার ওভাবে বার্স্ট না হলে...'

'থাক, আর সাফাই গাইতে হবে না,' হাত বাড়িয়ে রেডিয়োর সুইচ অন করল সোহানা। লোকসঙ্গীত হচ্ছে এই চ্যানেলে। 'এদের এখানে লোকসঙ্গীত খুব চলে, না?'

জবাব দিল না রানা। আনমনে ভাবছে কী যেন।

আর কথা হয় না। নীরবে এগিয়ে চলেছে ওরা। হাইওয়ের দু'ধারে অন্ধকার। বেশ কিছুক্ষণ পর আধ মাইল দূরে দেখা গেল সিলভার স্প্রিং-এর আলো।

ওটাকে শহর বলতে রাজি না অনেকে। বলে, ওটা একটা গ্রাম। জনসংখ্যা দু'হাজারের মতো। শহুরে সুযোগসুবিধাও তেমন একটা নেই।

হাইওয়ে থেকে বাঁক নিয়ে সিলভার স্প্রিং-এ ঢুকে পড়ল রানা। কিছুদূর এগিয়ে বাঁক নিল আবার। মাউন্ট নোভেরনের রাস্তা ধরে এগোচ্ছে। এক মাইলের মতো এগোল। তারপর বাঁক নিতে

হলো উত্তরে। এবার উঠেছে ওয়েস্টল্যাণ্ড রোডে। এই রাস্তাটা শহরের প্রান্তবর্তী। গতি কমাল রানা। হোগানের দোকানটা কাছিয়ে আসছে।

নিজের বাড়ির একতলাতেই দোকান সাজিয়েছে হোগান। দোতলায় থাকে সে। ওয়েস্টল্যাণ্ড রোড থেকে ড্রাইভওয়ে ধরে সিকিমাইল ভিতরে ঢুকতে হয়। ড্রাইভওয়ের দু'ধারে মেইপল গাছের সারি, যেন সীমানা নির্দেশ করছে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে, এমন সময় একটা কালো বুইক লুসার্ন সিডান সাঁ করে ওদের পাশ কাটিয়ে গেল। বি.এম.ডাব্লুর হেডলাইটের আলো একমুহূর্তের জন্য গিয়ে পড়ল সিডানের উইণ্ডশিল্ডে। প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে যে-লোকটা তাকে দেখা গেল স্পষ্ট।

সিডানটা বাঁক নিয়ে চোখের আড়াল হতেই ব্রেক করল রানা।

ঝাঁকুনিটা সামলে নিয়ে রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'কী হলো?'

'রে হোগান। সিডানের প্যাসেঞ্জার সিটে বসা ছিল। স্পষ্ট দেখেছি।'

'এত রাতে কোথায় গেল তোমার বন্ধু?'

'জানি না। কিন্তু ওর চেহারাটা...'

'কী হয়েছে?'

'দেখে ঠিক স্বাভাবিক মনে হলো না। মনে হলো যেন ভয় পেয়েছে।'

'একটা অসামাজিক লোকের চেহারায় ভয় আর বিরক্তি ছাড়া আর কোন্ আবেগের প্রকাশ আশা করো?'

জবাব দিল না রানা। স্টিয়ারিং ঘুরাচ্ছে।

'পিছু নেবে?'

'হুঁ। ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না।'

ওয়েস্টল্যাণ্ড রোডে বেশিক্ষণ থাকল না সিডানটা। কয়েক মাইল এগোনোর পর দক্ষিণে মোড় নিয়ে উঠে পড়ল বাল্টিমোর রোডে।

পিছন পিছন ছুটছে বি.এম.ডাব্লু। স্ট্রিটলাইটের সারি শেষ হয়ে গেছে আগেই। দু'পাশের ঘুটঘুটে অন্ধকার হেডলাইটের আলোয় আরও বেড়েছে মনে হচ্ছে। একটানা বৃষ্টি হচ্ছে এখন। অবিরাম চলছে ওয়াইপার। বৃষ্টির ছাঁটের সঙ্গে মিল রেখে ছন্দবদ্ধ আওয়াজ তুলেছে। সিডানের টেললাইটের আলো বেশ দূরে।

হেডলাইট নিভিয়ে দিল রানা। গাড়ির গতি বাড়াল।

'দেখতে পাবে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'রাস্তায় খানাখন্দ নেই। অনুমানে ভর করে এগোবো। ঝুঁকি নিচ্ছি। হোগান ছাড়া আর যে বা যারাই থাকুক সিডানে, আমি চাই না ওরা জানুক ফলো করা হচ্ছে।'

'কী ঘটে থাকতে পারে? কিডন্যাপ করা হয়েছে হোগানকে?'

ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে থুতনির কাছটা চুলকাল রানা। 'সম্ভবত। তবে আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলে খুশি হবো।' গাড়ির ভিতরের বাতিটা জ্বেলে দিল ও। 'ম্যাপটা বের করো তো।'

গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে ম্যাপ বের করে খুলল সোহানা।

'বাল্টিমোর রোডটা খুঁজে বের করো,' বলল রানা। 'কোন্‌দিকে যাচ্ছি বলতে পারবে?'

টানা ত্রিশ সেকেণ্ড ম্যাপটা দেখল সোহানা। 'এখানে তো...ঘরবাড়ি কিছুই নেই, রানা। এই রাস্তাটা অনেকদূর এগিয়েছে। তারপর গিয়ে উঠেছে হাইওয়েতে। মাঝখানে অবশ্য...কী যেন লেখা আছে ম্যাপে। অনেক ছোট লেখা। পড়তে পারছি না।'

সিডানের ব্রেকলাইটটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিছুদূর যাওয়ার

পর আবার। এরপর আচমকা ডানে মোড় নিল গাড়িটা। উধাও হয়ে গেল বেশকিছু গাছের আড়ালে। বিপজ্জনকভাবে গতি বাড়িয়ে জায়গামতো হাজির হলো রানা। একেবারে শেষ সময়ে দেখল আবার জ্বলে উঠেছে সিডানের টেইললাইট। এবার বাঁয়ে মোড় নিচ্ছে। মূল রাস্তা ছেড়ে এক শ' গজমতো এগিয়ে ঢুকে যাচ্ছে একটা ড্রাইভওয়েতে।

ইঞ্জিন বন্ধ করল রানা। দরজার কাঁচ নামাল। গাছপালার আড়ালে সিডানের হেডলাইটের আলো দেখা যাচ্ছে। নিভিয়ে দেয়া হলো আলোটা। দরজা খুলে নামল কেউ। সজোরে লাগানো হলো দরজাটা। দশ সেকেণ্ড পর খুলল আরেকটা দরজা।

ভারী গলায় বলে উঠল কেউ, 'না, না, প্লিয...'

রে হোগান। ভয় পেয়েছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে সোহানার দিকে তাকাল রানা। 'আমার অনুমান ঠিক?'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'কী করতে চাও?'

'গাড়ি থেকে নামছি আমি। তুমি বসো ড্রাইভিংসিটে। কাছেপিঠের কোনও বাড়িতে অথবা দোকানে চলে যাও। পুলিশকে ফোন করতে হবে। আমি...'

'খালিহাতে? যে বা যারা কিডন্যাপ করেছে হোগানকে তাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকতে পারে।'

'হ্যাঁ, পারে। কিন্তু আমি বোকা না।'

আবারও মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'আমিও নাছোড়বান্দা। তোমাকে একা যেতে দিচ্ছি না।'

রানা ভেবে দেখল, তর্ক করলে মূল্যবান সময় নষ্ট হবে। এখন সোহানাকে মানানোর সময় না।

কাজেই ইগনিশন কী ধরে মোচড় দিল ও আবার।

পাঁচ

হেডলাইট এখনও নেভানো। ধীরগতিতে এগোচ্ছে রানা। খানাখন্দ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। চাচ্ছে না এমন কোনও শব্দ হোক যাতে সতর্ক হয়ে ওঠে শত্রুপক্ষ। বি.এম.ডাব্লুটাকে ড্রাইভওয়ের পঞ্চাশ গজের মধ্যে এনে ব্রেক চাপল। ইঞ্জিন বন্ধ করল আবার।

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নিশ্চয়ই গাড়ির ভিতরে অপেক্ষা করতে সমস্যা নেই?'

ওর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল সোহানা। 'কী ব্যাপার, রানা? আমাকে কচি খুকি ভাবছ নাকি?'

কিছু বলল না রানা। দরজা খুলে নামল। সোহানাও বেরিয়ে এল।

ড্রাইভওয়ে ছেড়ে সরে গেল ওরা। কাছেই একটা নর্দমা। পানি নিষ্কাষণের জন্য কিছুটা গভীর করে বানানো হয়েছে। দু'পাশে ঘাসে-ছাওয়া শক্ত মাটির স্তূপ। এখান দিয়ে সাবধানে হেঁটে যাচ্ছে দু'জনে। নর্দমাটা এগিয়ে গেছে ড্রাইভওয়ে বরাবর। যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে ফানেলের মতো আকৃতি ধারণ করেছে। দূর থেকে কালভার্টের মতো দেখাচ্ছে জায়গাটা।

সতর্ক পায়ে এগোচ্ছে ওরা। কান খাড়া। নর্দমার পাড় ধরে ড্রাইভওয়েতে হাজির হতে বেশি সময় লাগল না। আলগা মাটির

ঢাল পার হয়ে ঢুকে পড়ল গাছপালার আড়ালে। ফুট বিশেক এগোনোর পর কমতে শুরু করল গাছের সংখ্যা। সামনে এখন খোলা জায়গা।

জায়গাটা বিশাল, সম্ভবত দুই-তিন একর হবে। আকৃতিতে বেঢপ চোঙাকার। চোখে অন্ধকার সইয়ে নেয়ার পর রানা দেখল আসলে একটা বয়লার-জাঙ্কইয়ার্ডে হাজির হয়েছে ওরা। মেরিল্যাণ্ডের এই জায়গায় কবে এবং কীভাবে গড়ে উঠল জাঙ্কইয়ার্ডটা, জানে না রানা। কিন্তু চোখের সামনে ছোট-বড়, চিকন-মোটা, খাটো-লম্বা শত শত বয়লার। কোনোটা এসেছে বাতিল গাড়ি থেকে, কোনোটা ডুবে-যাওয়া জাহাজ থেকে, কোনোটা আবার বেচে-দেয়া কারখানা থেকে।

বৃষ্টি পড়ছে। গাছের পাতায়, অনতিদূরের বয়লারগুলোর ধাতব গায়ে অদ্ভুত ঐক্যতান। কান পাতলে মৃদু প্রতিধ্বনি শোনা যায় কি যায় না।

'হঠাৎ করে এ-রকম কোনও জাঙ্কইয়ার্ডে হাজির হতে হবে ভাবতেই পারিনি,' রানার কানে ফিসফিস করল সোহানা।

'আমিও না,' স্বীকার করল রানা।

একটা বিষয় পরিষ্কার। যে বা যারাই ধরে এনে থাকুক হোগানকে, এই জাঙ্কইয়ার্ড ভালোমতো চেনে তারা। অথবা কাজের সুবিধার জন্য চিনে নিয়েছে। কিন্তু রানা এখানে পা দিয়েছে প্রথমবার।

খোলা জায়গাটার মাঝখানে থামানো হয়েছে সিডানটাকে। কিন্তু গাড়িটার চালক কিংবা হোগানের কোনও পাত্তা নেই। বোঝা যাচ্ছে বয়লারের গোলকধাঁধায় উধাও হয়ে গেছে তারা।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এখানে নিয়ে আসা হলো হোগানকে? সম্ভাব্য উত্তর, ওকে গুম করে ফেলতে চায় কিডন্যাপাররা। খুন করে লাশ গুম করার জন্য এই জাঙ্কইয়ার্ডের চেয়ে ভালো জায়গা মেরিল্যাণ্ডে

খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু নিরীহ নির্বিবাদী রে হোগান হঠাৎ করে কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে?

জানে না রানা। জানতে হবে। টের পেল, ওর হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে।

'একসঙ্গে না থেকে আমরা যদি আলাদা আলাদাভাবে এগোই,' রানার কানে আবারও ফিসফিস করল সোহানা, 'তা হলে কম সময়ে বেশি জায়গা কাভার করতে পারবো।'

'দরকার নেই,' সোজা মানা করে দিল রানা। 'শত্রু কে জানি না আমরা। ওর ক্ষমতা কতখানি তা-ও জানা নেই। এখন যা-ই করি না কেন নিজেদের পিঠ বাঁচিয়ে করতে হবে।' একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল, বের হতে যাবে এমন সময় একটা বুদ্ধি খেলে গেল ওর মাথায়।

অনতিদূরে দাঁড়িয়ে-থাকা সিডানটা বুইক লুসার্ন। জি.এম.সি. মডেলের। তারমানে...

এক পা এগিয়ে গিয়েছিল সোহানা, হাত বাড়িয়ে ওকে টেনে আনল রানা।

ভ্রূ কুঁচকে রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'কী?'

'তুমি থাকো এখানে। আমি যাচ্ছি।'

'কিন্তু...'

'বেশিদূর যাবো না।'

সোহানাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না রানা, পা বাড়াল। অন্ধকারে কোনও নড়াচড়া চোখে পড়ে কি না দেখার জন্য তাকাল এদিক-ওদিক। না, কিছু দেখা যাচ্ছে না।

সিডানটার দিকে এগোচ্ছে রানা। কাছে পৌঁছাতে বেশি সময় লাগল না। ড্রাইভারের পাশের দরজার কাছে চলে এল ও। বসে পড়ল গোড়ালিতে ভর দিয়ে। "বিসমিল্লা" বলে হাত বাড়িয়ে টান

দিল দরজার হাতলে। ক্লিক করে খুলে গেল দরজাটা।

ভিতরের আলোটা জ্বলে উঠল। ইগনিশন কী-হোলের দিকে তাকাল রানা। না, চাবিটা নেই।

ঠেলে দরজা লাগিয়ে দিল রানা। সিডানের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে। ভিতরে কেউ থাকলে কৌতূহল জাগবে লোকটার। কে দরজা খুলল, ভিতরে ঢুকতে গিয়েও কেন ঢুকল না—জানার আগ্রহ হবে। হয়তো বেরিয়ে আসবে গাড়ি থেকে। অথবা অন্তত উঁকিঝুঁকি দেবে।

পুরো একটা মিনিট পার হলো। গাড়ির ভিতরে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। আবারও হাত বাড়িয়ে দরজাটা খুলল ও, তারপর চট করে ঢুকে পড়ল ভিতরে। টেনে লাগিয়ে দিল দরজা।

বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করেছে। মুহুর্মুহু আলোকরশ্মির কারণে কিছুটা ফিকে হয়েছে অন্ধকার। গাড়ির ভিতরে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে রানা। একইসঙ্গে হাতড়াচ্ছে ড্যাশবোর্ড। যা খুঁজছে তা পেয়ে গেল শেষপর্যন্ত।

ড্যাশবোর্ডের উপর "অনস্টার" লেখা একটা বাটন। ওটার গায়ে চাপ দিল রানা। বিশ সেকেণ্ড কোনও আওয়াজ নেই। তারপর একটা পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল রেডিয়োর স্পিকারে, 'অনস্টার থেকে জো মিলার্ড বলছি। কীভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

'সাহায্য?' নিচু গলায় কাতরানি প্রকাশ করার চেষ্টা করছে রানা, 'ঠিকই বলেছেন, সাহায্য দরকার আমার।'

'কী হয়েছে, স্যর?'

'অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে...গাড়ি চালাচ্ছিলাম। কীভাবে যে...। আমি আহত। আমার সাহায্য দরকার।'

'স্যর, আপনি ঠিক কোথায় আছেন এখন?'

'কোথায়?' খানিক বিরতি দিল রানা, চাচ্ছে মিলার্ড ভাবুক কোথায় আছে বোঝার জন্য এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে আহত লোকটা। 'ঠিক...বুঝতে পারছি না। অন্ধকার। বৃষ্টি হচ্ছে।'

'একটু লাইনে থাকুন, স্যর।' দ্রুতগতিতে কী-বোর্ডে আঙুল চালাচ্ছে মিলার্ড, সে-আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে রেডিয়োতে। জি.পি.এস. কিংবা স্যাটেলাইট নেভিগেশন সিস্টেমের সাহায্যে কিছু একটা করছে সে কম্পিউটারে। পনেরো-বিশ সেকেণ্ড পর বলে উঠল, 'আপনার পজিশন জানতে পেরেছি, স্যর। মেরিল্যাণ্ডের সিলভার স্প্রিং-এ আছেন আপনি। 'এবং...হ্যাঁ পেয়েছি...বাল্টিমোর রোডের কাছাকাছি কোথাও।'

'হ্যাঁ, ঠিক ঠিক,' যেন খুব খুশি হয়েছে এমন ভঙ্গিতে বলল রানা। 'মনে পড়েছে এবার। বাল্টিমোর রোডে উঠেছিলাম...'

'নাইন ওয়ান ওয়ানে ফোন করে এখনই জানিয়ে দিচ্ছি, স্যর। আপনাকে সাহায্য করার জন্য রওনা হচ্ছে ওরা।'

'কতক্ষণ লাগবে?' গুঙিয়ে উঠল রানা, অভিনয়টা নিখুঁত হলে ভালো হয়।

'ছ'-সাত মিনিট, স্যর। ঘাবড়াবেন না, ততক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা চালিয়ে যাবো আমি...'

কিন্তু রানার আর দরকার নেই। দরজা খুলে পিছলে নেমে পড়ল সে। গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসে লাগিয়ে দিল দরজাটা। পকেটনাইফটা বের করে খুলল। ফলাটা জোরে বসিয়ে দিল সিডানের চাকায়। টেনে লম্বা করছে ছিদ্রটা। কেটে গেছে টায়ার, শব্দ করে বেরিয়ে যাচ্ছে বাতাস।

সময় নষ্ট করল না রানা। মাথা নিচু করে ছুটে গেল আরেকপাশের টায়ারের কাছে। বসিয়ে দিল এই টায়ারটাকেও। তারপর যত-জোরে-সম্ভব ছুটে এসে হাজির হলো সোহানার পাশে।

'অনস্টার?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল সোহানা।

হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'পুলিশ আসতে কতক্ষণ?'

'ছ'-সাত মিনিট। ওরা আসার আগেই কেটে পড়তে চাই। সওয়াল-জওয়াবের ইচ্ছা নেই আমার।'

'আমারও নেই। শীত লাগছে। তোমার বন্ধুর কথা ভেবে চিন্তাও হচ্ছে।'

'রেডি? ...এখন আমাদেরকে চোর-পুলিশ খেলতে হবে।'

'আছি।'

রানা বা সোহানার কেউই দেখেনি কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে হোগানকে। এখন কাদার উপর পায়ের ছাপই ভরসা।

জাঙ্কইয়ার্ডে বয়লারগুলো রাখা হয়েছে অপরিকল্পিতভাবে। ফলে বিশালাকার কোনও কোনও বয়লারের ভিতর দিয়ে তৈরি হয়েছে টানেল। আবার অপেক্ষাকৃত ছোটগুলোর মুখোমুখি সারির মাঝখানে ঘাসে-ছাওয়া পথ আছে। এ-রকম টানেল আর পথ দিয়ে এগোল ওরা দু'জন।

কোনও বিল্ডিং বানানোর কাজে এককালে ব্যবহৃত হয়েছিল এ-রকম দুটো রডের-টুকরো খুঁজে পেয়েছে রানা। এগুলোকে বলে রিবার— পুরো নাম রিইনফোর্সিং বার। বড়টা রেখেছে নিজের হাতে। ছোটটা দিয়েছে সোহানাকে। নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

পঞ্চাশ কদমের মতো এগোনোর পর বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল কণ্ঠ। উত্তেজিত ভঙ্গিতে কী যেন বলছে একজন।

আরও কিছুদূর এগোল রানা-সোহানা।

'বুঝতে পারছি না কীসের কথা বলছেন আপনি,' ভেঙে পড়েছে হোগান। 'কীসের টুকরো?'

জবাবে কী যেন বলল ভারী একটা পুরুষকণ্ঠ। একটা শব্দও বুঝতে পারল না ওরা কেউই।

'ও, ওটা?' আবারও বলল হোগান। 'ওটা সামান্য একটা বোতল। বলতে গেলে কোনও গুরুত্বই নেই।'

এদিক-ওদিক ঘাড় ঘোরাল রানা। বুঝতে চেষ্টা করছে ঠিক কোন্‌দিক থেকে আসছে হোগানের গলার আওয়াজ। বয়লারের টানেলের প্রতিধ্বনি বিভ্রম ঘটাচ্ছে।

দিক অনুমান করার পর হাতের ইশারায় সোহানাকে দেখাল রানা। তাকাল সোহানা।

সামনে বাঁ দিকে, বড়জোর বিশ-বাইশ গজ দূরে বিশাল একটা ভাঙা বয়লার। হয়তো মাটিতে গড়াগড়ি খেত অনেক আগেই, সঙ্গের আরেক বয়লারের গায়ে হেলান দিয়ে থাকার কারণে টিকে আছে এখনও। মুখটা কেমন আর্চওয়ের মতো আকার পেয়েছে।

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। সতর্ক কিন্তু দ্রুত পায়ে দু'জনে গিয়ে হাজির হলো "আর্চওয়ের" নীচে। কিডন্যাপারের কণ্ঠ স্পষ্ট এখন।

'বোতলটা কোথায় পেয়েছ সেটাই জানতে চাই,' বলছে লোকটা। 'একটা কথা এতবার জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে কেন?'

কী ভারী কণ্ঠ! কথায় অন্যরকম টান। অনেকটা পূর্ব ইয়োরোপিয়ান কিংবা রাশানদের মতো।

'বললাম তো, জানি না,' অসহায় গলায় জবাব দিল হোগান। 'ওই বোতল কোত্থেকে পেয়েছি ভুলে গেছি। আমি...'

ঠাস্‌ করে চড় মারার শব্দ হলো। কাদাপানিতে পড়ে গেল কেউ, সম্ভবত হোগান। এবার আরেকটু ভারী শব্দ। রানার অনুমান হোগানকে লাথি মারছে কিডন্যাপার। দাঁতে দাঁত পিষল ও।

'ওঠ্‌ শালা!' ধমকে উঠল কিডন্যাপার লোকটা।

'পারছি না,' হোগানের গলায় অনুনয়।

'ওঠ্ বলছি,' হুমকি দিচ্ছে কিডন্যাপার।

ইশারায় সোহানাকে অপেক্ষা করতে বলে সাবধানে আগে বাড়ল রানা। বিশাল বয়লারটার একদিকের দেয়ালের সঙ্গে বলতে গেলে সেঁটে গেছে। শেষপ্রান্তে এসে উঁকি দিয়ে তাকাল।

সামনে খোলা একটা জায়গা। পিকআপ ট্রাকের সমান দুটো বয়লার পড়ে আছে মুখ থুবড়ে। ও-দুটোর মাঝখানে পড়ে আছে হোগান। পড়ে আছে না বলে বলা ভালো পড়ে ছিল, হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করছে এখন। ঠিকমতো পারছে না। কাদায় বার বার পিছলে যাচ্ছে হাঁটু। বেচারার দুই হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। ওর মুখোমুখি, রানার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিডন্যাপার লোকটা। ওর বাঁ হাতে একটা ফ্ল্যাশলাইট। ডান হাতে রিভলভার। অস্ত্রটা তাক করে রেখেছে হোগানের বুক বরাবর।

'মিস্টার রে হোগান,' টেনে টেনে বলছে লোকটা। 'আপনি ভালো মানুষ। আপনার সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। শুধু একটা প্রশ্নের জবাব জানতে চাই আপনার কাছে। বলে দিন, কথা দিচ্ছি যেখান থেকে নিয়ে এসেছি আপনাকে সেখানেই দিয়ে আসবো। চড়-থাপ্পড় পরের কথা, আর একটা ফুলের-টোকাও দেবো না আপনার গায়ে। শুধু বলুন ওই বোতলটা কোত্থেকে পেয়েছেন আপনি।'

বোলো না, হোগান, মনে মনে বলল রানা, একটা শব্দও উচ্চারণ কোরো না। যদি শুধু ওই উত্তরটা জানার দরকার থাকত শয়তানটার তা হলে তোমাকে এতদূরে নিয়ে আসত না। তুমি কিছু বলামাত্র ট্রিগার টানবে সে।

রানার মাথায় চিন্তার ঝড়। প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে ওই লোকটা একাই কিডন্যাপ করেছে হোগানকে নাকি সঙ্গে আরও কেউ আছে। আগ্নেয়াস্ত্রধারী একটা লোককে সামলানো খুব কঠিন

কোনও কাজ না, কিন্তু একের বেশি হলে...

মাথাটা আরেকটু বের করল রানা। দ্রুত এদিক-ওদিক তাকাল। সোহানাকে বাদ দিয়ে বললে চতুর্থ কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিডন্যাপার আপাতত একা। ওর সঙ্গে যদি কেউ এসেও থাকে, ধরে নেয়া যায় যথেষ্ট দূরে আছে লোকটা।

কিছুক্ষণ ভাবল রানা। একটা প্ল্যান এসেছে ওর মাথায়। তবে প্ল্যানটা কতখানি কাজে লাগবে, কিংবা আদৌ লাগবে কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না। কিন্তু এখন এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। হাতে সময়ও খুব কম।

আবার টানেলের ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা। দৌড়ে ফিরে এল সোহানার কাছে। নিচু গলায় সংক্ষেপে বলল কোথায় এবং কী অবস্থায় আছে হোগান। কী করতে চায় তা-ও বলল।

'এটা স্রেফ পাগলামি,' রানার প্ল্যান মানতে নারাজ সোহানা। 'এত বড় ঝুঁকি নিতে চাচ্ছ কেন?'

'বন্ধুকে বাঁচানোর জন্য। ওকে মুখ খুলতে বাধ্য করবে কিডন্যাপারটা। তারপর খুন করবে। আমরা এটা হতে দিতে পারি না।'

'কিন্তু...যদি নিশানা ফস্কে যায় আমার? তা ছাড়া...তোমাকে চিনে ফেলে যদি বোকার মতো কিছু করে বসে হোগান?'

'নিশানা ফস্কাবে না। তোমার ওপর পূর্ণ আমার আস্থা আছে। আর হোগানের কথা বলছ? আশা করছি ও-রকম কিছু করবে না ও। এই ব্যাপারটা ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিতে হচ্ছে আমাদেরকে। ...দাঁড়াও, আসছি।'

দৌড়ে গাছপালার আড়ালে চলে গেল রানা। ফিরে এল ত্রিশ সেকেণ্ড পর। হাতে গ্রেপফ্রুটের সমান একটুকরো পাথর। 'এটা নিয়ে চড়তে পারবে ওই বয়লারের ওপর?' জিজ্ঞেস করল সোহানাকে, ইঙ্গিতে দেখাচ্ছে মরচে-ধরা মইটা। সম্ভবত কোনও

মেরামতি কাজের জন্য বিশাল বয়লারটার গায়ে হেলান দিয়ে রাখা আছে ওটা।

'যদি না পারি,' হাত বাড়িয়ে রানার হাত থেকে পাথরটা নিল সোহানা, 'তা হলে বারো-চোদ্দ ফুট ওপর থেকে কাদাপানিতে আমার আছড়ে পড়ার আওয়াজ পেয়ে যাবে।' খালি হাতটা বাড়িয়ে রানার শার্টের কলার খামচে ধরল আচমকা, টানল নিজের দিকে। রানা কিছু বুঝে ওঠার আগেই চুমু দিল ওর ঠোঁটে। তারপর ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'শোন, রানা। যা-ই করো সাবধানে করবে। যদি কিছু হয়ে যায় তোমার, তা হলে কিন্তু কোনদিনও ক্ষমা করবো না তোমাকে।'

কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা। উল্টোদিকে ঘুরে ছুট লাগাল। কোন্‌দিকে আছে হোগান আর কিডন্যাপার জানা হয়ে গেছে, কিছুটা ঘুরে হাজির হতে চায় ওদের সামনে। শয়তান লোকটার পিছন থেকে গিয়ে চমকে দিতে চায় না। বরং চায়, লোকটা বিশ্বাস করুক যেন কপালগুণে বা কপালদোষে ওদেরকে দেখে ফেলেছে রানা।

ছুটতে ছুটতেই হাতঘড়ি দেখল ও। অনস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর ছ'মিনিট পার হয়েছে। যে-কোনও মুহূর্তে সাইরেনের আওয়াজ শোনা যাবে।

জায়গামতো পৌঁছে থামল রানা। দম নিচ্ছে। একটা নিরীহ, কৌতূহলী ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে চেহারায়। প্যান্টের বেল্টে, পিঠের কাছে আটকে নিল রিবারটা। তারপর পা বাড়াল সামনে। বয়লারের ও-প্রান্তে ফ্লাশলাইটের আলো।

'হ্যালো, কী খবর ভাইয়েরা?' চিৎকার করে উঠল রানা। 'সব ঠিকঠাক?'

হোগান আর কিডন্যাপার দু'জনই চমকে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানার দিকে। উজ্জ্বল ফ্ল্যাশলাইট সরে গেছে হোগানের

উপর থেকে। রানার উপর আলো ধরেছে কিডন্যাপার।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'বন্ধু বলতে পারো,' চোখের কাছে হাত তুলে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ঠেকানোর চেষ্টা করছে রানা। উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেলে বিপদ। জরুরি মুহূর্তে কিছু করতে পারবে না।

'এখানে কেন?' আবার জিজ্ঞেস করল কিডন্যাপার।

'ওই ড্রাইভওয়ে ধরে যাচ্ছিলাম,' হাত তুলে ইঙ্গিত করল রানা, আসলে কিডন্যাপারকে দেখিয়ে দিল নিরস্ত্র ও, মনে মনে প্রার্থনা করছে ওকে চিনে ফেলে উল্টোপাল্টা কিছু যাতে না করে হোগান। 'হঠাৎ দেখি কে বা কারা যেন ভুল জায়গায় পার্ক করেছে একটা সিডান। কারও কোনও সমস্যা হয়েছে ভেবে তখন নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। খুঁজতে খুঁজতে হাজির হয়েছি এখানে। ...আলোটা আমার চোখের উপর থেকে সরাও না, ভাই। কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

সাইরেনের আওয়াজ শোনা গেল এমন সময়।

রিভলভার নামিয়ে ফেলেছিল, আবার তুলল কিডন্যাপার লোকটা। হোগানের দিকে তাক করেও সরিয়ে নিল নিশানা। রানার বুক বরাবর ধরে আছে এখন।

চমকে ওঠার ভান করল রানা, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে তুলে দিয়েছে দু'হাত। 'ও ভাই, পিস্তল-বন্দুক কেন আবার?' এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

'খবরদার!' ধমকে উঠল কিডন্যাপার। 'এক পা-ও নড়বে না। যেখানে আছো সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।'

'কিন্তু...কিন্তু...আমি তো সাহায্য করার জন্য এসেছি। বিশ্বাস করো খারাপ কোনও নিয়ত নেই আমার,' আরও এক পা আগে বাড়ল রানা। কিডন্যাপারের সঙ্গে ওর দূরত্ব এখন বড়জোর পনেরো কদম। 'ভেবেছিলাম কারও হয়তো বিপদ হয়েছে,' বাজে

বকে সময় নষ্ট করার চেষ্টা করছে, চাচ্ছে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকুক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটা। 'ভেবেছিলাম...'

'চুপ!' ধমকে উঠল কিডন্যাপার।

'রাগ করছ কেন, ভাই? যদি বলো তা হলে ভালোমানুষের মতো চলে যাবো এখান থেকে। কাউকে কিচ্ছু বলবো না, জীবনেও।'

'নিকুচি করি শালা...' আরও কিছু বলতে চেয়েছিল লোকটা কিন্তু বলতে পারল না।

বয়লারের ছাদে চড়েছে সোহানা, স্থির দাঁড়িয়ে থেকে নিশানা করেছে সময় নিয়ে, তারপর সর্বশক্তিতে ছুঁড়ে মেরেছে পাথরটা। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। লোকটার মাথার পিছনে, বাঁ দিকে সজোরে আঘাত করেছে ভারী পাথর।

মাত্র একটা মুহূর্ত। রানাকে দেখলে কেউ বলত ইলেকট্রিক শক খেয়েছে যেন। কিডন্যাপারের ডান হাতে ধরা ছিল রিভলভার, সেদিকে আচমকা লাফ দিয়েছে ও। শূন্যে থাকা অবস্থায় বের করে ফেলেছে বেল্টে আটকানো রড। একটা প্রান্ত চেপে ধরেছে ছুরির মতো করে। পনেরো কদমের তিন ভাগের দু'ভাগ পার হলো একলাফে। মাটিতে পড়েই গড়ান খেল, সরে গেল শত্রুর আরেকটু ডান দিকে। জানে এখনও ধাতস্থ হতে পারেনি লোকটা। শেষ হয়নি চোখে সর্ষে ফুল দেখা।

উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, এমন সময় ট্রিগারে টান দিল কিডন্যাপার। চোখের কোনা দিয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখল রানা। বুলেটের আওয়াজে কানে তালা লাগার যোগাড়।

না দেখেই এবং সম্ভবত আতঙ্কিত হয়ে গুলি করেছে লোকটা। নিশানা করেছিল রানাকেই। কিন্তু রানা ততক্ষণে সরে গেছে। পঁচিশ-ত্রিশ ফুট দূরের একটা বয়লারে গিয়ে লাগল বুলেট। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের বিশ্রী আওয়াজ হলো।

দেরি করার মানে হয় না। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই রড দিয়ে লোকটার রিভলভার-ধরা হাতে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মারল রানা। কব্জির জয়েন্টে লেগেছে আঘাত। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল লোকটা। একদিকে কাত হয়ে গেছে আপনা থেকে। রিভলভার ধরা আঙুলগুলো অবশ হয়ে গেছে।

রডটা হাত থেকে ছেড়ে দিল রানা। একইসঙ্গে প্রচণ্ড থাবায় কেড়ে নিল রিভলভার। ওটা পকেটে রেখেই বাঁ হাতের আঙুলগুলো সোজা করে খোঁচা দিল শত্রুর চোখে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল লোকটা। সুযোগটা নিল রানা। ধাঁই করে ঘুসি মারল নাক বরাবর। এবার পিছন দিকে হেলে পড়ল লোকটা।

ওর আহত কব্জিটা চেপে ধরল রানা। এক ঝাঁকিতে হাতটা তুলে ঠেলে নিয়ে গেল পিছনে। একইসঙ্গে ডান পা সামনে বাড়িয়ে নিয়ে রেখেছে লোকটার ডান পায়ের পিছনে। ভারসাম্য হারিয়ে বেকায়দা অবস্থায় পড়ে গেল লোকটা। ওর আহত কব্জি মুচড়ে ধরে নীচের দিকে টান মারল রানা। সেইসঙ্গে পায়ে পা বাঁধিয়ে ল্যাং মেরেছে। কাদাপানিতে আছড়ে পড়ল লোকটা... মুখে যীশুর নাম।

বাকি কাজ সহজ। একটু সরে গেল রানা। লোকটার ডান কানটাকে ফুটবল মনে করে পেনাল্টি কিক্ মারল জুতোর ডগা দিয়ে। নিথর হয়ে গেল লোকটা। এতক্ষণে আরও কাছিয়ে এসেছে সাইরেনের আওয়াজ।

কাছে চলে এসেছে সোহানাও। এসেছিল রানাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে, দরকার নেই বুঝতে পেরে এগিয়ে গেছে হোগানের দিকে। পকেটনাইফটা বের করে ওর দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। লুফে নিল সোহানা। ফলা বের করে হোগানের বাঁধন কেটে দিল। ধরাধরি করে দাঁড় করাল ওকে।

ফ্ল্যাশলাইটটা পড়ে আছে মাটিতে। জ্বলছে এখনও। দু'পা

এগিয়ে গিয়ে ওটা তুলে নিল রানা। আলো ফেলল কিডন্যাপারের চেহারায়।

মানুষটা রোগাটে। রঙ রোদে পুড়ে গাঢ়। চেহারা বৈশিষ্ট্যহীন। প্রথম দেখায় ঠিক ঠাহর করা যায় না কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী। চোখের নীচে কালো দাগ। নাকটা ভাঙা। একাধিকবার ভেঙেছে। তারমানে এককালে বক্সার ছিল সম্ভবত। হালকা একটা কাটাদাগও দেখা যাচ্ছে। ডান নাকের বাঁশির কাছ থেকে শুরু হয়েছে। শেষ হয়েছে ডান ভ্রূর কাছে গিয়ে।

ছুরির পোঁচ, ভাবল রানা। এ-রকম লোকদের ভালোমতো চেনে ও। এরা শক্তপাল্লা। এবং খুব নিষ্ঠুর। বেশিরভাগ সময়ই ভাড়া খাটে। কখনও কখনও কারও বেতনভুক কর্মচারী হিসেবে কাজ করে। এরা প্রফেশনাল। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে-কোনও কিছু করতে পারে।

এত মার খেয়েছে, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, জ্ঞান হারায়নি লোকটা। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় চোখ পিটপিট করছে। তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কেন পাকড়াও করেছিলে রে হোগানকে?'

জবাবে নিচু গলায় কিছু একটা বলল লোকটা। বুঝতে পারল না রানা। সম্ভবত রাশান, অনুমান করল ও। এ-ও অনুমান করল, গাল দিয়েছে লোকটা।

'কে তুমি?' জানে লাভ হবে না, জানে সময় নষ্ট হচ্ছে, তারপরও আবার জিজ্ঞেস করল রানা। 'কেন কিডন্যাপ করেছিলে আমার বন্ধুকে?'

জবাবে কিছু বলল লোকটা। এবার কোনও শব্দ না, পুরো একটা বাক্য। আগেরবারের মতোই মানে বুঝতে পারল না রানা। কিন্তু এটা বুঝতে পারছে, ওকে গাল দিচ্ছে লোকটা বাপ-মা

তুলে।

এতক্ষণ ঝুঁকে ছিল, এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। বুক ভরে দম নিল। তারপর হঠাৎ আবার কিক্ মারল লোকটার ডান কানে। এবার আগের চেয়ে অনেক জোরে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখল, কিডন্যাপার লোকটার দু'চোখ বন্ধ হয়ে গেছে।

'আমি আবার হাত-পা থাকতে মুখে বিশ্বাসী না, দোস্ত,' কিডন্যাপারকে বলল রানা। তারপর এগিয়ে গিয়ে ধরল হোগানকে। দৌড়ানোর ইঙ্গিত করল সোহানাকে। হোগানকে একহাতে জড়িয়ে ধরল, ওর একটা হাত তুলে নিল কাঁধে, তারপর চলতে শুরু করল যত দ্রুত সম্ভব।

বি.এম.ডব্লুর কাছে পৌঁছাতে বেশি সময় লাগল না। ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল সোহানা। প্যাসেঞ্জার সীটে রানা আর হোগান পাশাপাশি।

সাইরেন যেদিক থেকে আসছে তার উল্টোদিকে গাড়ি ছোটাল সোহানা।

রে হোগান এলিয়ে পড়েছে সীটের উপর। কথা বলার মতো অবস্থা নেই। আর রানার মনে চলছে চিন্তার ঝড়।

ছয়

সিলভার স্প্রিং-এ না, ভিক্সবার্গ হিলে ফিরে এসেছে ওরা। হোটেলে, নিজেদের রুমে হোগানকে নিয়ে এসেছে রানা-সোহানা। স্প্রিং হিল থেকে অন্তত কিছুদিন দূরে দূরে থাকা উচিত

হোগানের। ওর ওপর আবারও অ্যাটেম্প্ট নিতে পারে শত্রুপক্ষ।

বন্ধুর দিকে একগ্লাস ব্র্যাণ্ডি বাড়িয়ে ধরল রানা। 'নাও, এটা খেয়ে নাও।'

'কী?' অন্যমনস্ক থাকায় বুঝতে পারেনি হোগান।

'ব্র্যাণ্ডি,' বলল রানা। 'খাও। ভালো লাগবে।'

গ্লাসটা নিল হোগান। একচুমুক খেল। ঘরের ভিতরে ঠাণ্ডা তেমন নেই, তারপরও ইচ্ছাকৃতভাবে দাঁতে দাঁত বাড়ি দিচ্ছে হোগান। কেন, ও-ই ভালো বলতে পারবে। একটু পর আবার চুমুক দিল ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে।

ছোটবেলায় পড়া একটা কবিতা মনে পড়ে গেল রানার—সফদর ডাক্তার, মাথা ভরা টাক তার, খিদে পেলে পানি খায় চিবিয়ে...

ফায়ারপ্লেসের দিকে এগিয়ে গেল ও। আগুনে কিছু লাকড়ি ফেলে দিয়ে ফিরে এল। সোফায় বসে পড়ল সোহানার পাশে। ওদের মুখোমুখি একটা রকিং চেয়ারে বসে আছে হোগান। এখনও বোধহয় টেনশনে ভুগছে বেচারা। অকারণে দোল খাচ্ছে। মনের অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে কাজে।

'কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কেমন লাগা উচিত?' খেঁকিয়ে উঠল হোগান, দোল খাওয়া থামিয়ে পিঠ সোজা করেছে। 'কিডন্যাপ করা হয়েছিল আমাকে। আমার উপর হাতের ঝাল মিটিয়েছে লোকটা। এখন তুমিই বলো কেমন লাগা উচিত আমার।'

জবাব দেয়ার আগে বন্ধুর দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা। বয়স ষাটের কাছাকাছি। সফদর ডাক্তারের মতোই মাথাভরা টাক। চেহারায় সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী ভাব আছে। নাকের উপর নেমে-আসা চশমা কেন যেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভাসা ভাসা নীল দু'চোখে প্রাণের ছোঁয়া বলতে

গেলে নেই। ক্লিনশেভড্ চেহারার এখানে-সেখানে মারের দাগ। থুতনির কাছে একজায়গায় থেঁতলে গেছে। রিভলভারের বাঁট দিয়ে ওখানে বাড়ি মেরেছিল কিডন্যাপার লোকটা।

'সন্দেহ নেই, কিডন্যাপ করা হয়েছিল তোমাকে,' বলল রানা। 'সন্দেহ নেই, তোমার উপর হাতের ঝাল মিটিয়েছে লোকটা। কিন্তু এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই, এখনও বেঁচে আছো তুমি।'

'কী বলতে চাও?' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল হোগান। 'আমাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল হারামজাদাটা?'

'কেন, তোমার কী মনে হয়?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'কিছু একটা জানতে চাচ্ছিল সে তোমার কাছ থেকে। ওটা বলে দিলে তোমাকে পায়ে ধরে সালাম করত? দু'গালে দুটো চুমু খেয়ে ফিরিয়ে দিয়ে আসত বাড়িতে?'

নরম হলো হোগান। ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে চুমুক দিল আরেকবার। বিড়বিড় করে বলল কী যেন।

'কী বললে?' জানতে চাইল রানা।

'আমার জীবন বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ দিলাম তোমাদের দু'জনকে।'

'কিন্তু আপনার জীবন এখনও বাঁচাতে পেরেছি কি না জানি না,' মুখ খুলল সোহানা। 'যে-লোকটা হামলা করেছিল আপনার উপর সে প্রফেশনাল। ওর চ্যালাচামুণ্ডা থাকতে পারে। যা জানার জন্য আপনাকে পাকড়াও করেছিল লোকটা তা জানতে পারেনি। কাজেই আবারও হামলা হতে পারে আপনার ওপর। এবং দ্বিতীয়বার অনেক সতর্ক থাকবে ওরা।'

মাথা ঝাঁকাল হোগান। 'হুঁ। তারপরও তোমাদের দু'জনকে ধন্যবাদ। তোমরা যদি সময়মতো না যেতে, আজই তা হলে...' কথা শেষ না করে একচুমুকে গ্লাসের ব্র্যাণ্ডিটুকু শেষ করল সে।

'হয়েছিল কী, বলবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি রাত জাগার অভ্যাসটা বদলানোর চেষ্টা করছি ইদানীং। সকাল সকাল শুয়ে পড়ি। কাকডাকা ভোরে বিছানা ছাড়ি। খেয়াল করে দেখেছি পড়াশোনাটা রাতের চেয়ে ভোরে করলে মনে থাকে ভালো...'

হাত তুলে হোগানকে থামিয়ে দিল রানা। 'গাল-গল্প বাদ দিয়ে আসল কথায় আসো।'

'ঠিক আছে। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঠিক বলতে পারবো না ক'টার দিকে, শুনতে পাই কে যেন সমানে কিল মারছে দরজায়। ধড়মড় করে জেগে উঠলাম। টলতে টলতে কোনওরকমে নীচে নেমে জিজ্ঞেস করলাম, "কে?" জবাবে ভারী গলায় উত্তর এল, "আমি পিট হ্যামিল্টন। আপনার প্রতিবেশী। এই রাস্তার আরেক প্রান্তেই থাকি। নামে হয়তো চিনতে পারছেন না, কিন্তু চেহারা দেখলেই চিনবেন।" বললাম, "এত রাতে কী চান?" লোকটা বলল, "হঠাৎ করেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে আমার স্ত্রী। বিপদ যখন আসে সবদিক দিয়েই আসে—টেলিফোনটাও বিকল হয়ে গেছে। হাসপাতালে খবর দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স আনাতে পারছি না। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন! শুধু একটা ফোন করতে চাই।"'

'পিট হ্যামিল্টন নামে আসলেই কেউ আছে আপনাদের ওখানে?' জানতে চাইল সোহানা।

মাথা ঝাঁকাল হোগান। 'আছে। আমার বাড়ি থেকে কয়েক ব্লক উত্তরে একটা ফার্মহাউসের মালিক।'

তারমানে, ভাবছে রানা, কিডন্যাপার লোকটা স্থানীয় কেউ না। হোগানের ব্যাপারে যথেষ্ট খোঁজখবর করেছে। হামলা করার আগে প্ল্যান করেছে। লোকটার চেহারায়, কাজে প্রফেশনালিযম। প্রশ্ন হচ্ছে, হোগানের মতো একটা মানুষের বিরুদ্ধে এ-রকম

একটা লোককে লেলিয়ে দিল কে? এবং কেন?

সোহানা বলল, 'ওর কথা শুনে কী করলেন আপনি? দরজা খুলে দিলেন?'

'দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে ভিতরে ঢুকে গেল লোকটা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাত-পা চালাল আমার গায়ে। যখন বুঝতে পারলাম কী হচ্ছে তখন আর কিছুই করার ছিল না আমার। অসহায়ের মতো শুয়ে আছি মেঝেতে, রিভলভার বের করে আমার কপালে ঠেকিয়ে রেখেছে লোকটা। এরপর শুরু হলো জেরার পালা।'

'কী নিয়ে?'

'কী নিয়ে সেটা ভাবতে গিয়েই তো তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে আমার। ভেবেছিলাম টাকা চাইবে, ঘরের কোথাও মূল্যবান কিছু আছে কি না জানতে চাইবে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এ-সব ব্যাপারে কিছুই বলল না সে! কিছুদিন আগে একটা মদের বোতল, বলা ভালো বোতলটার ভাঙা একটা টুকরো পেয়েছি আমি। ওটা নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল বার বার।'

'কী প্রশ্ন?'

'কোথায় আছে বোতলটা। বলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত বেঁধে ফেলল শয়তানটা। তারপর গিয়ে ঢুকল দোকানে। শুনতে পেলাম ধুমধাম আওয়াজ হচ্ছে। পানির-দামে-কেনা বোতলটা খুঁজতে নরক গুলজার করছিল হারামিটা। ঈশ্বর জানেন কী কী ভেঙে তছনছ করেছে সে!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল হোগান।

'তারপর?'

'তারপর ওই ভাঙা টুকরোটা নিয়ে ফিরে এল আমার কাছে। আবারও জিজ্ঞেস করতে লাগল কোত্থেকে পেয়েছি ওটা।'

'কোত্থেকে পেয়েছ?'

'বিশ্বাস করো, রানা, আমার মনে নেই। তুচ্ছ একটা জিনিস। না আছে গায়ের দাম, না আছে অ্যান্টিক ভ্যালু। এ-রকম হাজারটা জিনিস এখান থেকে সেখান থেকে পেয়েছি আমি। এখনও পাই। এসব কি মনে রাখার মতো, বলো? তবে...' কথা শেষ না করে থেমে গেল হোগান। ভ্রূ কুঁচকে ভাবছে কী যেন।

'তবে?'

'যতদূর মনে হয়...একবার মেরিল্যাণ্ড সোয়াম্পের কাছাকাছি কোথাও মাছ ধরতে এসে...' মাথা নাড়ল হোগান। 'জায়গাটা সম্ভবত এই ভিক্সবার্গ হিলের দক্ষিণে হবে। আমি শিওর না।'

'আপনি মাছ ধরেন?'

সোহানার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল হোগান। 'অবসরে। সারাদিন তো আর অ্যান্টিক নিয়ে পড়ে থাকা যায় না। 'যা-ই হোক, অগভীর পানিতে ছিপ ফেলেছি, হুক পড়তে-না-পড়তেই টান লাগল। আমি তো তাজ্জব! এত জলদি মাছ ধরা পড়ল! না জানি মাছটা কতদিন না খেয়ে ছিল! দেরি না করে হুইল ঘুরাতে শুরু করলাম। পানি থেকে কী উঠে এল জানো?' ওর দু'চোখে কৌতুক।

'কী?'

'একপাটি বুট। পুরনো। চামড়া দিয়ে বানানো। যতদূর মনে পড়ে ভাঙা বোতলটা ওটার ভেতরেই ছিল।'

'বুটটা কি এখনও আছে তোমার কাছে?'

বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকাল হোগান। 'কী মনে করো আমাকে? গারবেজম্যান? কী করবো একপাটি নষ্ট বুট দিয়ে? ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।'

বন্ধুকে শান্ত করার জন্য হাত তুলল রানা। 'রাগ করো কেন? এমনি জিজ্ঞেস করেছি আর কী। তোমার গল্প শেষ করো। তোমার কাছে ফিরে এসেছে কিডন্যাপার। জিজ্ঞেস করছে

কোত্থেকে পেয়েছ বোতলটা। তারপর?'

'তারপর হঠাৎ করেই ফোন বেজে উঠল।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমি করেছিলাম।'

'কিডন্যাপার জানতে চাইল কারও আসার কথা আছে কি না। ভাবলাম, যা পাওয়ার তা তো পেয়েই গেছে, এখন যদি বলি কেউ আসবে তা হলে আমাকে ছেড়ে দেবে হয়তো। তাই বললাম, "হ্যাঁ, আমার কয়েকজন বন্ধু আসছে।" কিন্তু কথাটা শুনে আমাকে ছাড়ল না। টেনেহিঁচড়ে দাঁড় করাল। পিঠে রিভলভার ঠেকিয়ে বাধ্য করল সিডানে উঠতে। বাকিটা জানা আছে তোমাদের।'

'ভাঙা বোতলটা হয়তো কিডন্যাপারের কাছেই ছিল,' বলল সোহানা। 'ভুল করেছি আমরা। তাড়াহুড়ো করে চলে আসতে গিয়ে খোঁজ করিনি।'

'না, ভুল করিনি,' বলল রানা। 'কারণ আমরা তখনও জানি না কেন কিডন্যাপ করা হয়েছে হোগানকে। তা ছাড়া পুলিশও অনেক কাছে চলে এসেছে। ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালাতে পেরেছি—আমি বলবো আমাদের কপাল ভালো।'

রকিং চেয়ারের পাশে ছোট্ট একটা টেবিলের উপর ব্র্যাণ্ডির গ্লাসটা নামিয়ে রেখেছিল হোগান। ওটা তুলে নিল সে। রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরেকটু হবে?'

উঠল রানা। হোগানের হাত থেকে গ্লাসটা নিল। ব্র্যাণ্ডিতে পূর্ণ করে নিয়ে এসে দিল ওকে। তারপর আবার বসে পড়ল সোহানার পাশে। হোগান তখন অল্প অল্প চুমুক দিচ্ছে গ্লাসে।

'বোতলটার ব্যাপারে কিছু বলো, হোগান,' কিছুক্ষণের নীরবতার পর বলল রানা।

'মামুলি জিনিস। বলা ভালো ফালতু জিনিস। কোনও লেবেল নেই। কিচ্ছু লেখা নেই। তবে...অদ্ভুত একটা...কী বলবো...প্রতীক বলা কি ঠিক হবে? বরং ছবিই বলি। হ্যাঁ, অদ্ভুত

একটা ছবি আছে ওটার গায়ে।'

'ছবি?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকল রানা। 'কীসের ছবি?'

'মনে নেই। তবে ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে আমার ওয়েবসাইটে পোস্ট করে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম কেউ হয়তো চিনতে পারবে প্রতীকটা। তখন যোগাযোগ করবে আমার সঙ্গে।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সোহানার দিকে তাকাল রানা।

ও কী বলতে চায় বুঝে ফেলেছে সোহানা। কফি টেবিলে চার্জে দিয়ে রেখেছিল নিজের ল্যাপটপটা, উঠে গিয়ে ওটা নিয়ে এল। রানার পাশে বসে হাঁটুর উপর রাখল। লগ ইন করল হোগানের ওয়েবসাইটে। ত্রিশ সেকেণ্ড পর বলল, 'হ্যাঁ, পেয়ে গেছি।' ল্যাপটপটা ঘুরিয়ে স্ক্রীনটা দেখাল হোগানকে। 'এটাই তো?'

অনেকখানি সামনে ঝুঁকে এল হোগান। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে ল্যাপটপের স্ক্রীনের দিকে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'হ্যাঁ, এটাই। দেখো ভালোমতো, রানা। কিছু বোঝার উপায় আছে?'

ল্যাপটপটা সোহানার কাছ থেকে নিল রানা। হাঁটুর উপর রেখে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল স্ক্রীন। দেখার সুবিধার জন্য ছবিটা কপি-পেস্ট করে আলাদা একটা সফটওয়্যারে ওপেন করেছে সোহানা। যুম করেছে।

সবুজ রঙের একটা ভাঙা অবতল মদের বোতল। ঠিক মাঝখানে একটা ছবি। অথবা কোনও প্রতীক:

একটা মৌমাছি। দু'দিকে ডানা মেলে দিয়েছে পতঙ্গটা। উড়ছে সম্ভবত। দর্শকের দিকে ওটার পেট মাথার অ্যান্টেনা দুটো দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে দুটো পা দ্বিধাবিভক্ত দুই ডানায় বিচিত্র নকশা।

সময় নিয়ে ছবিটা দেখল রানা। তারপর বলল, 'আমার কাছে পরিচিত মনে হচ্ছে না।' তাকাল সোহানার দিকে। 'তোমার কী

মনে হয়?'

'আমিও...ঠিক বুঝতে পারছি না। মৌমাছির ছবিটা অনেক পুরনো। তা ছাড়া লম্বা একটা সময় ধরে পানির নীচে ছিল। ঝাপসা হয়ে গেছে সে-কারণে।' হোগানের দিকে তাকাল সোহানা। 'আপনার কী মনে হয়?'

'আগেও বলেছি। কিছুই মনে হয় না। এ-রকম ছবি আগে কখনও দেখিনি। কারও কাছ থেকে এ-রকম কোনকিছুর ব্যাপারে শুনিওনি কখনও।'

'তোমার ওয়েবসাইটে ছবিটা দেয়ার পর কেউ ফোন করেনি? ই-মেইল পাঠায়নি? কেউ কোনও কৌতূহল দেখায়নি?'

'না, না, না.' মাথা নাড়ল হোগান। 'রানা. আমি খুব ক্লান্ত। বাসায় যেতে চাই।'

'ভুল করছ, হোগান। কিছুক্ষণ আগে সোহানা কী বলেছে মনে নেই? ওরা তোমার আস্তানার খবর পেয়ে গেছে। জানে তুমি একা। হামলা করলে ঠেকাতে পারবে না। মনে রেখো. শুধু বোতলটা নেয়ার জন্য আসেনি ওরা। আরও কিছু চায় ওরা। এবং যতক্ষণ তা না পাচ্ছে ততক্ষণ তোমাকে খুঁজতেই থাকবে। নাগালে পেলেই পাকড়াও করবে। তারপর ওই বয়লার জাঙ্কইয়ার্ডের মতো গোপন কোনও জায়গায় নিয়ে যাবে। শুরু করবে অত্যাচার। সহ্য করতে পারবে না তুমি। বলে ফেলবে ওদের প্রয়োজনীয় কথাটা। ব্যস. মাত্র একটা বুলেট খরচ করে শেষ করে দেবে সব।'

'তারমানে আমার জীবনের ঝুঁকি আছে?' শুনে মনে হলো ফোঁপাচ্ছে হোগান।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কারও কাছে, আমার অনুমান, গোপন কোনও সংগঠনের কাছে সবুজ মদের-বোতলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে হঠাৎ করে। ওটার ছবি ওয়েবসাইটে পোস্ট করে

মারাত্মক ভুল করেছ, হোগান। এই ভুলের মাশুল জীবন দিয়ে না দিতে হয় তোমাকে!'

'তা হলে কী করবো এখন?' জানতে চাইল হোগান। 'পুলিশের কাছে যাবো? একটু আগের ঘটনাটা বলবো?'

'তাতে লাভ হবে কোনও? প্রমাণ করতে পারবে কিডন্যাপ করা হয়েছিল তোমাকে? কিডন্যাপিং-এর মোটিভ জানতে চাওয়া হলে কী বলবে? সামান্য এক ভাঙা বোতল? তোমার কথার গুরুত্ব দেবে না পুলিশ। সবদিক চিন্তা করে একটা পরামর্শ দিই তোমাকে। যদি নিজের ভালো চাও আমার কথা শোন।'

'কী?'

'এখান থেকে প্রায় তিন শ' মাইল পুবে চিযাপীক উপসাগরে গিবসন নামে ছোট্ট একটা দ্বীপ আছে। জানো?'

'চিযাপীক উপসাগরের নাম শুনেছি। কিন্তু গিবসন আইল্যাণ্ডের ব্যাপারে...'

'শোননি কখনও, তা-ই তো? আমেরিকায় চমৎকার কিছু জায়গা আছে যেগুলোর নাম অনেকেই জানে না। গিবসন আইল্যাণ্ড সে-রকম একটা জায়গা। তুমি রাজি থাকলে আমার এক পরিচিত লোককে ফোন করতে পারি। কাল সকালেই এখানে হাজির হয়ে যাবে সে। তোমাকে নিয়ে যাবে ওই দ্বীপে। যতদিন পরিস্থিতি শান্ত না হয়, ততদিন ওখানে থাকতে পারবে তুমি, বিনা খরচায়। রাজি?'

'কিন্তু...'

'আমার এই প্রস্তাবে রাজি থাকলে একটা শর্ত পালন করতে হবে তোমাকে,' হোগানকে কথা শেষ করতে দিল না রানা।

'কী?',

'আমার ওই পরিচিত লোককে, কিংবা গিবসন আইল্যাণ্ডে যা দেখবে সে-ব্যাপারে কাউকে কোনও প্রশ্ন করতে পারবে না। যা

বলার বললাম, এবার সিদ্ধান্ত নাও।'

মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবল হোগান। তারপর বলল, 'আমি রাজি, রানা। কিন্তু আজ রাতটা কাটাবো কোথায়?'

মুচকি হাসল রানা। 'এই হোটেলে এখনও কিছু রুম খালি আছে। ম্যানেজারকে বলে এক রাতের জন্যে ভাড়া নিয়ে দিচ্ছি একটা।'

হোগানকে ওর রুমে দিয়ে এসে নিজেদের কামরায় ঢুকল রানা-সোহানা।

চুলের ব্যাণ্ড খুলতে খুলতে সোহানা বলল, 'আমরা এখন কোন্ কাজটা করবো, রানা? ইভলিন রোযের গুপ্তধন, মিনি সাব, নাকি রে হোগানের রহস্যময় মদের-বোতল?'

ভুবনভোলানো হাসি হেসে দু'পা আগে বাড়ল রানা। জড়িয়ে ধরল সোহানাকে। সুর করে বলল, 'এই গভীর রাতে তুমি-আমি যখন "ইক কাম্‌রে মে বান্দ্ হুঁ, অওর চাবি খো যায়ে!" তখন বলো দেখি, সাবমেরিন, রোয বা ভাঙা বোতল কী? এখন শুধু তুমি, আর শুধু আমি।'

হাসল সোহানাও।

ভিক্সবার্গ স্প্রিং থেকে চল্লিশ মাইল দূরে বয়লার জাঙ্কইয়ার্ড।

প্যাঁ-পোঁ শব্দ হচ্ছে। এসে গেছে পুলিশের গাড়ি। দাঁড়িয়ে আছে সিডানের পাশে। লাল-নীল-সাদা আলোর ঝলকানি বয়লারগুলোর ফাঁকফোকরে। কানের পাশে রানার প্রচণ্ড লাথি খেয়ে বেহুঁশ নিয়াযভ। ওই অবস্থায়, সম্ভবত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের গুণে, সে টের পেল বিপদ ঘনাচ্ছে। উর্দি-পরা যে মানুষগুলো ছুঁলে ছত্রিশ ঘা হয় তারা এখন কাছেপিঠে।

ধীরে ধীরে চোখ খুলল নিয়াযভ। বাঁ চোখের কাছে কী যেন চটচট করছে। সম্ভবত রক্ত। কিছু একটা সজোরে আঘাত

করেছিল কপালের বাঁ দিকে। পাথর-টাথর হবে। নিয়াযভ টের পেয়েছিল জায়গাটা কেটে গিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। ওই লম্বা সুঠামদেহী লোকটার মার খেয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে যাওয়ার পর ভিজে গিয়েছিল বাঁ চোখের কোনা।

মারতে জানে লোকটা। নড়াচড়া দেখলেই বোঝা যায় প্রফেশনাল। প্রজাপতির মতো মুভ করে। সাপের মতো ছোবল দেয়। এবং জানে প্রতিপক্ষের শরীরের কোথায় কত জোরে আঘাত করলে কাজ হবে।

ওর ডান কব্জি অকেজো করে দিয়েছে লোকটা। ডান কানে এত জোরে লাথি মেরেছে যে, ভোঁতা হয়ে গেছে শ্রুতিশক্তি। আপাতত নষ্ট হয়ে গেছে স্বাভাবিক রিফ্লেক্স-অ্যাকশন।

নিয়াযভের মস্তিষ্ক বলছে পালাও। শরীর বলছে পারছি না। সে জানে পুলিশের হাতে পড়ার মানে কী। সে জানে, রাশান ইন্টেলিজেন্সে থাকতে শিখেছে, পুলিশের হাত থেকে কীভাবে বাঁচতে হয়।

হাত থেকে ছুটে গিয়েছিল রিভলভারটা। কাছেপিঠেই কোথাও পড়েছে আর কী। শুয়ে থেকেই ভালো হাতটা দিয়ে আশপাশের মাটি হাতড়াল নিয়াযভ। কিন্তু পেল না। অদ্ভুত একটা অস্বস্তি পেয়ে বসল ওকে। যে লোক ঘুমানোর সময়ও রিভলভার আঁকড়ে থাকে তার অস্ত্রটা হারিয়ে গেলে অস্বস্তি লাগা স্বাভাবিক। উঠে বসে ভালোমতো খুঁজবে কি না ভাবল নিয়াযভ। না, ঝুঁকি নেয়াটা ঠিক হবে না। অনেক কাছে এসে গেছে পুলিশের সাইরেন।

গড়াতে শুরু করল সে। কাদাপানির তোয়াক্কা করছে না। কোথায় যাচ্ছে জানে না। শুধু জানে পুলিশের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করতে হবে, যত বেশি সম্ভব। আপাতত লুকাতে হবে কোনও ঝোপের আড়ালে।

বৃষ্টির বেগ বেড়েছে। দূরে কোথাও বাজ পড়ল। ভালো

হয়েছে। এই খারাপ আবহাওয়ায় ওকে খোঁজার উৎসাহ পাবে না পুলিশের লোকেরা। নিয়াযভের পরনে কালো জ্যাকেট, কালো জিন্স। বড় কোনও ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকতে পারলে এ-যাত্রা বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

গড়াতে গড়াতে কতগুলো ঝোপের কাছে এসে পড়ল নিয়াযভ। টের পাচ্ছে পোশাক আর চেহারা মাখামাখি হয়ে গেছে কাদায়। হোক, অসুবিধা নেই। যার-পর-নাই কষ্ট করে উঠে দাঁড়াল সে। ঝোপ পার হয়ে এসে শুয়ে পড়ল আবার। হাঁপাচ্ছে।

এখন যেখানে আছে সে সেখানে মাথার উপর নিচু হয়ে ঝুলে আছে একটা গাছের ডাল। শুধু সামনেই না, চারপাশেই বড় বড় কিছু ঝোপ। বাতাসে ভেজামাটির গন্ধ। আবারও বাজ পড়ল দূরে।

ঝোপের আড়াল থেকে তাকিয়ে দেখছে নিয়াযভ কী করে পুলিশের লোকেরা।

কাউন্টি-শেরিফ অফিসের ডেপুটি হাজির হয়েছে। এখানে-সেখানে হেঁটে বেড়াচ্ছে লোকটা। একটা টো-ট্রাক এসেছে। ওটার ড্রাইভারের সঙ্গে টুকটাক কথা বলছে। কেবলের সঙ্গে হুক দিয়ে আটকানো হয়েছে সিডানটাকে। পরিত্যক্ত গাড়ি হিসেবে ওটা টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হবে শেরিফের অফিসে। খুঁজে পেলে নিয়ে যাওয়া হবে নিয়াযভকেও।

বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর নিশ্চিত হলো নিয়াযভ, মাত্র দু'জন লোক এসেছে।

শরীর ঠিক থাকলে এমনকী খালিহাতেও দু'জনকে সামালানো কোনও ব্যাপার ছিল না। ড্রাইভার তো দুধভাত। ডেপুটিটাকেই প্রতিপক্ষ ধরা যায়। তবে এটাকেও কাবু করা যেত। বাধা দিলে বাধ্য হয়ে খুনও হয়তো করতে হতো। সেক্ষেত্রে আরও বড় ঝামেলা হতো। একজন অফিসার খুন হওয়া মানে তোলপাড়

কাণ্ড। রীতিমতো ম্যানহান্ট শুরু করে দিত পুলিশ। রোডব্লক, জায়গায় জায়গায় গাড়ি থামিয়ে সার্চ করা। এবং সম্ভবত এফ.বি.আই.। সামান্য এক অ্যান্টিক-ডিলারের কাছ থেকে একটা তথ্য জানতে এসে এত কিছু ঘটানো মানে মশা মারতে কামান দাগা।

ঝুঁকি নিতে ভয় পায় না নিয়াযভ। কিন্তু ওর নিয়োগকর্তা সিদোরভের কথা মনে পড়লে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। ওই লোক খুব হিসেবী। সবসময় চায় সাপ মরুক কিন্তু লাঠি যাতে না ভাঙে।

যেখানে আছে আপাতত সেখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নিল নিয়াযভ। কিছুক্ষণ এদিক-সেদিকে খুঁজবে ডেপুটি আর ড্রাইভার। কাউকেই পাবে না। আগামীকাল সকালে আবার আসা যাবে ভেবে চলে যাবে ওরা। তখন বের হবে নিয়াযভ। নিজের আস্তানার পথ ধরবে।

সিডানটা চলে যাচ্ছে পুলিশের কব্জায়। যাক, সমস্যা নেই। প্রথম কথা ওটা ভাড়া করা। দ্বিতীয় কথা, গ্লাভ-কম্পার্টমেন্টে রাখা ড্রাইভিং লাইসেন্সটা ভুয়া। একটা চুরি-করা ক্রেডিট কার্ডও আছে। সূত্র ধরে ওটার আসল মালিকের কাছে গেলেও নিয়াযভের সন্ধান পাবে না কাউন্টি-পুলিশ। শুধু চিন্তা হচ্ছে রিভলভারটা নিয়ে। ওটা গেল কই?

অসময়ের বৃষ্টিতে কাদার রাজ্যে পরিণত হয়েছে হতচ্ছাড়া জাঙ্কইয়ার্ডটা। ধ্বস্তাধ্বস্তির কোনও চিহ্ন ডেপুটির চোখে না পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। হয়তো চোখে পড়বে না আগ্নেয়াস্ত্রটাও। তারমানে পরিত্যক্ত একটা গাড়ি ছাড়া আর কিছু পাচ্ছে না পুলিশ। নিয়াযভের অনুমান লম্বা লোকটা সিডানের অনস্টার সুবিধা নিয়েছে। সে-জন্যেই এত তাড়াতাড়ি আসতে পেরেছে পুলিশ। আসুক, অসুবিধা কী? খোঁজখবর করলে কী জানতে পারবে ওরা? কিছুই না। শেষপর্যন্ত ধরে নেবে কৌতূহলী কোনও টিনএজার

জাঙ্কইয়ার্ডের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সিডানটা দেখে এগিয়ে এসেছিল।

কে ওই লোক? ভাবছে নিয়াযভ। ওর সঙ্গে কমপক্ষে আরও একজন ছিল। লোকটা যখন মারছিল ওকে তখন একটা ছায়ামূর্তিকে দেখেছে সে ওদের দিকে ছুটে আসতে। সম্ভবত কোনও মেয়ে।

একজন প্রফেশনাল আরেকজন প্রফেশনালকে দেখলেই চিনতে পারে। নিয়াযভের দৃঢ় বিশ্বাস ওই লোক আর ওর বান্ধবী একসঙ্গে কাজ করে। জানতে হবে কোথায় আছে ওরা, কী করছে।

লম্বা লোকটা জিজ্ঞেস করেছে, 'কেন পাকড়াও করেছিলে রে হোগানকে?' জিজ্ঞেস করেছে, 'কেন কিডন্যাপ করেছিলে আমার বন্ধুকে?'

তারমানে ওরা দু'জন রে হোগানের বন্ধু?

কিন্তু ওই হাঁদারামটাকে কিডন্যাপ করে জাঙ্কইয়ার্ডে নিয়ে আসা হয়েছে জানল কীভাবে?

যেভাবেই জানুক, প্রশ্ন দুটো জিজ্ঞেস করে ভুল করেছে সুঠামদেহী। ফাঁস করে দিয়েছে রে হোগানের সঙ্গে যোগাযোগ আছে ওর। এবং সম্ভবত ওই মেয়েটারও। ভালো হয়েছে। এই সূত্রটা নিয়াযভের কাজে লাগতে পারে।

রে হোগান কী করতে পারে এখন? লোকটা জানে ওর নাড়িনক্ষত্র জেনে গেছে শত্রুপক্ষ। জানে ওকে চোখে চোখে রাখা হতে পারে। কাজেই আপাতত গা ঢাকা দেবে সে। ওর জায়গায় নিয়াযভ থাকলে তা-ই করত।

আর সুঠামদেহী এবং ওই মেয়েটা কী করবে? কেন কিডন্যাপ করা হয়েছিল হোগানকে জানতে চাইবে। হয়তো উত্তরটা ইতোমধ্যে জেনেও গেছে ওরা। জেনে গেছে, একটা মদের-

বোতলই সবকিছুর জন্য দায়ী।

হয়তো এটাও জেনে গেছে, ওই বোতল কোত্থেকে পেয়েছিল হোগান।

জ্ঞান হারানোর আগে সুঠামদেহীর মুখ থেকে শেষ যে-কথাটা শুনেছিল নিয়াযভ তা স্মরণ করল। মুচকি হাসল সে।

তারমানে হোগানের পিছনে আর না লাগলেও চলবে। সুঠামদেহী আর ওই মেয়েটাকে পাকড়াও করতে পারলে একঢিলে দুই পাখি মারা যাবে। কথাও আদায় করা যাবে, আবার হাতের ঝালও মিটিয়ে নেয়া যাবে।

'ঠিকই বলেছ তুমি, কমরেড,' কল্পনায় সুঠামদেহীকে বলল নিয়াযভ, 'আমিও হাত-পা থাকতে মুখে বিশ্বাসী না।'

সাত

'তোমার কী মনে হয়, রানা?' আউটবোর্ড মোটরের স্টার্টার কর্ড ধরে টান দিল সোহানা। 'হোগানকে যে পাঠিয়ে দিলে গিবসন আইল্যাণ্ডে, থাকবে সে সেখানে?'

বোটে উঠে পড়ল রানা। হাতের লগি দিয়ে ঠেলা দিল তীরের মাটিতে। বলল, 'আমার মনে হয় পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে পেরেছি ওকে। তবে জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না ওর ব্যাপারে। অ্যান্টিকের দোকানটা ওর ধ্যানজ্ঞান। ওই দোকানের জন্য যদি জীবনের মায়া তুচ্ছ করে ও, আশ্চর্য হবো না।'

আকাশে ভোরের আলো ফুটেছে বেশিক্ষণ হয়নি। সূর্য ওঠেনি

এখনও। মেরিল্যাণ্ড নদীর বাতাস ঠাণ্ডা।

ইঞ্জিনটাকে কিছুক্ষণ গর্জন করার সুযোগ দিল সোহানা। তারপর এগোতে শুরু করল। স্রোতের অনুকূলে নদীমুখের দিকে যাচ্ছে।

'দিনের আলোয় সবকিছু কেমন অন্যরকম লাগে, না?' বলল ও।

কিছু না বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল রানা।

সারারাত ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়েছে। থেমেছে ভোরের কিছু আগে। আলো যত বাড়ছে আকাশ তত পরিষ্কার হচ্ছে। ছেঁড়া তুলার মতো খণ্ড খণ্ড মেঘগুলো সরে গিয়ে নীল একটা আভা ফুটে উঠছে। পানির উপরে যেন নুয়ে পড়ে ভাসছে পাতলা কুয়াশা। তীরের সারি সারি গাছে এবং দূরের সোয়াম্পের ভেসে-থাকা কাণ্ডে পাখির ঝাঁক। দিনের শুরুটা প্রাণবন্ত করে তুলেছে ওগুলো। মাঝেমধ্যে টুপ করে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে পানিতে। মোটরবোটের উপস্থিতি টের পেয়ে সরে পড়ছে বড় কোনও মাছ, কখনও আবার অসতর্ক কোনও জলপোকাকে গিলে নিচ্ছে কৌশলে।

'কিডন্যাপার লোকটার ব্যাপারে কিছু ভেবেছ?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

আবারও মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমার মনে হয় লোকটা মামুলি কোনও কিডন্যাপার না। হোগানকে কিডন্যাপ করার উদ্দেশ্যও ছিল না ওর। সে এসেছিল একটা ইনফর্মেশন জানতে। অবস্থা সুবিধার না বুঝে হোগানকে তুলে নিয়ে যায়।'

'আচ্ছা রানা, সামান্য একটা মদের-বোতলে এমন কী আছে যার কারণে কিডন্যাপ্‌ড হতে হলো হোগানকে? উড়ন্ত মৌমাছির ছবিটা ওয়েবসাইটে আপলোড করামাত্র গন্ধ শুঁকে হাজির হয়ে গেল একজন প্রফেশনাল!'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'জানি না। জানতে হবে। খোঁজখবর করতে হবে।'

আর কথা হলো না। মোটরবোটটা এগিয়ে চলল।

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে চুপ করে আছে সিদোরভ। একটু আগে যে-খবরটা ওকে দিয়েছে নিয়াযভ তা হজম করতে সময় লাগছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'বারো বছর, তা-ই না?'

হাজার মাইল দূরে থাকা নিয়াযভ তখন ঘামছে, যদিও আবহাওয়া গরম না। সিদোরভের প্রশ্নটা বুঝতে পারল না সে। বলল, 'কীসের বারো বছর, স্যর?'

'বারো বছর ধরে আমার হয়ে কাজ করছ তুমি, ঠিক না?'

'জী, স্যর।'

'এই প্রথম ভুল করলে।'

নিয়াযভের গলা শুকিয়ে কাঠ। ঢোক গেলার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। টের পেল হাতের তালু ঘামছে। সিদোরভের মন্তব্যের জবাবে কিছু বলল না। বলতে পারল না।

'ভুল করলে তার মাশুল দিতে হয়, জানো তো?'

'আমি...আমি...' তোতলাচ্ছে নিয়াযভ, 'খবর দিয়ে নিয়ে এসেছি আমার সেরা তিনজন লোককে। আমরা...আমরা...ওই লম্বা লোক আর ওর বান্ধবীকে পাকড়াও করতে বেশি সময় লাগবে না আমাদের।'

'নাম কী ওদের?'

'একজন বরিসভ। আরেকজন...'

'গাধা! তোমার লোকদের নাম জানতে চাইনি। যে-দু'জনের হাতে মার খেয়েছ তাদের নাম কী?'

'দু'জনের হাতে মার খাইনি, স্যর। একজনের হাতে খেয়েছি। তবে...তবে...' পাথরের কথাটা বলতে গিয়েও বলল না নিয়াযভ।

'লোকটার নাম মাসুদ রানা। আর মেয়েটা সোহানা মাসুদ। স্বামী-স্ত্রী।'

'তবে কী? কী বলতে গিয়ে কথা ঘুরিয়ে নিলে?'

'কিছু না, স্যর, কিচ্ছু না। মাসুদ রানার নাম মনে করতে পারছিলাম না তো, তাই...'

গত রাতে ডেপুটি আর টো-ট্রাকের ড্রাইভার চলে যাওয়ার পর ঝোপের আড়াল থেকে বের হয় নিয়াযভ। ওর মাথা তখনও ভারী হয়ে আছে। অবশ্য কীভাবে কী করবে তা ভেবে নিয়েছে।

রিভলভারটা খুঁজে বের করার তাগিদ অনুভব করছিল সে ভিতর থেকে। কিন্তু কিছুক্ষণ ভেবে চিন্তাটা বাতিল করে দেয় সে। শুধু শুধু সময় নষ্ট হবে। তা ছাড়া এই অন্ধকারের ভিতরে কোথায় খুঁজবে? এমনও হতে পারে, লাথি মেরে ওটাকে কোনও ঝোপের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে লম্বা লোকটা।

থাক তা হলে, সিদ্ধান্ত নেয় নিয়াযভ, আরেকটা যোগাড় করে নেয়া যাবে।

রাস্তার একপাশ ধরে হাঁটতে শুরু করে সে সিলভার স্প্রিং-এর দিকে। একটু ভালো বোধ করলে কখনও দু'-দশ পা দৌড়ায়। এভাবে আধঘণ্টার মধ্যে হাজির হয়ে যায় এক ফার্মহাউসে। চোরের মতো নিঃশব্দে ঢুকে পড়ে। দেখে বার্নের পিছনে পার্ক করা আছে পুরনো একটা শেভি ট্রাক। ইগনিশন কী আছে জায়গামতো।

ডান কব্জি প্রায় অবশ। লম্বা লোকটা আরেকটু জোরে মারলে ভেঙেই যেত। নিয়াযভের জায়গায় অন্য কেউ হলে ডাক্তার বা হাসপাতাল ছাড়া আর কিছুর কথা ভাবত না। কিন্তু ওসবের কাছ দিয়েও যেতে চায় না নিয়াযভ। চুরি-করা ট্রাকটা ঠিকমতোই চালিয়ে হাজির হয় সে হোগানের বাড়িতে।

গ্যারেজের পিছনে নিয়ে গিয়ে ট্রাকটা থামায় নিয়াযভ। বাড়ির

সদর-দরজাটা তখনও খুলে আছে হাঁ হয়ে। ভিতরে ঢুকে পড়ে সে। খুঁজতে শুরু করে। না, কোনও অ্যান্টিক না। কোনও মদের-বোতলও না। বরং টেলিফোন ডিরেক্টরি। কিংবা নোটবুক, ডায়রি।

যা খুঁজছিল তা পেয়ে যায় নিয়াযভ দশ মিনিটের মধ্যে, ডেস্কটপ কার্ড ইনডেক্সে।

অল্প কয়েকটা নাম। কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখেই নিয়াযভ বুঝে ফেলে ওগুলোর বেশিরভাগই হোগানের নিয়মিত খদ্দের। কার কী রকম অ্যান্টিক পছন্দ তা-ও লিখে রেখেছে হোগান ছোট করে। ব্যতিক্রম শুধু ওর বন্ধুরা। নামগুলো দেখতে দেখতে কেমন যেন খটকা লাগে নিয়াযভের। একটা নামে দৃষ্টি আটকে যায়।

হোগানের ব্যক্তিগত কিছু ডায়রি নিয়ে বসে নিয়াযভ তখন। এগুলোতে হাবিজাবি অনেক কিছু লিখে রেখেছে পাগলাটে লোকটা। একটা ডায়রির হলদেটে পাতায় অপটু হাতে স্কেচ করা হয়েছে জনৈক পুরুষের অস্পষ্ট চেহারা। নীচে লেখা: মাসুদ রানা।

সঙ্গের পাতাটা খালি। পরের পাতায় লিখেছে হোগান:

রানাকে ঠিক বুঝতে পারিনি কখনোই। অদ্ভুত একটা মানুষ। রহস্যময় গতিবিধি। কখনও একা থাকে। কখনও আবার ওর সঙ্গে জুটে যায় মেয়েরা, আলোপ্রেমী পতঙ্গের মতো।

অ্যান্টিকের উপর সহজাত আকর্ষণ আছে রানার। আমার মতোই অ্যান্টিক ভালোবাসে ও। খুঁজে বের করতে পছন্দ করে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, জমায় না। অথবা বেচে দিয়ে টাকা কামায় না। যাদেরকে কাছের মানুষ মনে করে তাদেরকে দিয়ে দেয়। এভাবে আমাকে বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য জিনিস দিয়েছে ও। ভেবে পাই না কোত্থেকে যোগাড় করল এসব!

আমাদের মধ্যে বয়সের এত ফারাক, তারপরও আমরা বন্ধু। আমি জানি, জানি মানে টের পাই, অ্যান্টিক শিকারীদের দলে ফেলা যায় না ওকে। ও অন্যকিছু করে। সেটা কী আমি জানি না।

বেশ কয়েকবার ভেবেছি জিজ্ঞেস করবো, কিন্তু সময়-সুযোগ হয়নি। ধূমকেতুর মতো দেখা দিয়েই উধাও হয়ে যায় মানুষটা।

ওর যে-বিষয়টা আমাকে সবচেয়ে অবাক করে তা হলো, আমি যখনই বড় কোনও বিপদে পড়ি তখনই কোত্থেকে যেন ত্রাণকর্তার মতো হাজির হয়ে যায় ও...

এটুকু পড়ার পর ডায়রিটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় নিয়াযভ। পরাজয়ের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে বের হয় হোগানের বাড়ি ছেড়ে। ট্রাক নিয়ে হাজির হয়ে যায় নিজের ভাড়া-করা দুই কামরার বাড়িতে। সাফসুতরো হয়। ক্ষতের পরিচর্যা করে। ফুলে উঠেছে ডান কব্জির কাছটা, কলের ঠাণ্ডা পানির নীচে ধরে রাখে অনেকক্ষণ। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে ভাবে কী করে উচিত সাজা দেবে রানাকে। ঘরে ফিরে এসে বাসি রুটি আর বোতলের জুস দিয়ে ক্ষুধা মেটায়।

সঙ্গে অল্প কিছু জিনিস, গুছিয়ে নিতে সময় লাগে না তাই। কাউকে কিছু না জানিয়ে কেটে পড়তেও সমস্যা হয় না।

এরপর ট্রাক চালিয়ে হাজির হয় সে ভিক্সবার্গ হিলে।

ওর মাথায় তখন খেলা করছে একটা অনুমান। হোগানকে পাকড়াও করার পর যখন জেরা করছিল তখন বেজে উঠেছিল টেলিফোন। সম্ভবত রানা। সিডান নিয়ে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে হোগানের ড্রাইভওয়ে থেকে তখন একটা গাড়িকে দেখেছে আসতে। সম্ভবত ওই মাসুদ রানা।

যদি রানা সিলভার স্প্রিং-এ থাকত তা হলে এত রাতে টেলিফোন করে গাড়ি নিয়ে হোগানের সঙ্গে দেখা করতে যেত না। সেক্ষেত্রে একসঙ্গে ডিনার করত ওরা। হয়তো হোগানের বাড়িতে, কিংবা সিলভার স্প্রিং-এর কোনও রেস্টুরেন্টে।

ডায়রি পড়ে বুঝেছে নিয়াযভ, রানা যে-কাজই করুক না কেন, ঘুরে বেড়াতে হয় তাকে। পরিযায়ী পাখির ঠিকানা যেমন

জলাভূমি, কাজের প্রয়োজনে ছুটে-চলা লোকদের ঠিকানাও তেমনি হোটেল-মোটেল।

ভুয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স আর ক্রেডিট কার্ডের বদৌলতে ভিক্সবার্গ হিলের একটা নিম্নমানের মোটেলে রুম ভাড়া নেয় নিয়াযভ। খবর দেয় নিজের লোকদেরকে। ওরা এসে পৌঁছানোর আগেই, সিদ্ধান্ত নেয়, জরুরি একটা কাজ সারতে হবে।

ঢুঁ মারে সে শহরের কয়েকটা হোটেলে। রিসিপশনে গিয়ে একটাই কথা, 'আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চাই। এই দু'-চারদিন হলো এখানে উঠেছে সে। নাম মাসুদ রানা। সঙ্গে ওর বান্ধবীও আছে।'

'মিস্টার রানা?' তৃতীয় হোটেলের সুন্দরী রিসিপশনিস্ট জিজ্ঞেস করে মিষ্টি গলায়, নিয়াযভ তখন "খালিহাতে" ফিরেছে আগের হোটেল দুটো থেকে, 'ইস্‌স্! আরেকটু আগে এলে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারতেন, স্যর। আর বান্ধবী বলছেন কেন?' ডেস্কে-রাখা ল্যাপটপের স্ক্রীনের দিকে চোখ রাখে মেয়েটা, কী-বোর্ডে আঙুল চালায় কিছুক্ষণ। 'ভদ্রমহিলা তো ওনার স্ত্রী—সোহানা মাসুদ।'

'ও, আচ্ছা আচ্ছা,' বিব্রত ভঙ্গিতে হাসার ভান করে নিয়াযভ, মনে মনে যাচ্ছেতাই গালি দেয় সামনে-বসা সুন্দরীকে, 'ওরা বিয়ে করেছে নাকি? দেখলেন তো, আমার বন্ধুটা কেমন কঞ্জুস? এতদিন যার সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করল তাকে বিয়ে করে ফেলল হুট করে অথচ কোনও খবর দিল না আমাদেরকে। এ-শহরে বেড়াতে এসেছে অথচ একটাবারও জানাল না পাছে পকেট থেকে কিছু মালপানি খসে যায়। ফিরুক সে, দেখাবো মজা। ...কখন বের হয়েছে ওরা? গেছে কোথায়?'

'এই তো...' ঘাড় ঘুরিয়ে দেয়ালে-ঝোলানো ঘড়িটা দেখে নেয় রিসিপশনিস্ট। 'আধ ঘণ্টা। বেশি হলে চল্লিশ মিনিট।

কোথায় গেছে ঠিক বলতে পারবো না, স্যর। তবে আমার অনুমান জলাভূমির ওদিকে কোথাও। গত দু'দিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ছেন ওঁরা। গায়ে আর কাপড়ে কাদার দাগ নিয়ে ফিরছেন রাত করে।'

'আজ ফিরবে কখন?'

'বলে যাননি।'

'উঠেছে কত নম্বর রুমে?'

'নয়। আপনার নামটা বলবেন, স্যর? ওঁরা ফিরলে জানিয়ে দেবো।'

'না, দরকার নেই। ফিরুক কপোত-কপোতী। হাতেনাতে ধরতে চাই। একটা অনুরোধ করি, আমার ব্যাপারে কিছু বলবেন না ওদেরকে, প্লিয।'

মাথা ঝাঁকায় রিসিপশনিস্ট। 'স্যর, কোনও বন্ধুকেই জানাননি মিস্টার মাসুদ রানা—কথাটা বোধহয় ঠিক না। কাল রাতে ওঁর এক বন্ধু কিন্তু পাশের রুমে, মানে দশ নম্বর রুমে ছিলেন।'

চোখ পিটপিট করে নিয়াযভ। 'বন্ধু? কে?'

আবারও ল্যাপটপের স্ক্রীনের দিকে তাকায় রিসিপশনিস্ট। 'মিস্টার রে হোগান।'

ধাক্কা লাগে নিয়াযভের বুকের ভিতরে। ঠোঁটের কোনে মেকি হাসি আনে সে। 'রে হোগান? চশমা-পরা টাকওয়ালা বুড়ো লোকটা? নীল চোখ? ক্লিন শেভ্ড?'

উজ্জ্বল হয় রিসিপশনিস্টের চেহারা। 'আপনি চেনেন?'

'চিনবো না কেন? হোগান তো আমারও বন্ধু। এখন কোথায় আছে সে? রুমে?'

'না। ভোরে একজন লোক এসেছিল। মিস্টার হোগানকে নিয়ে চলে গেছে।'

'কোথায়?'

'বলতে পারবো না, স্যর।'

তাড়া আছে এমন ভঙ্গিতে হাতঘড়ি দেখে নিয়াযভ। 'আচ্ছা, আসি তা হলে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আবারও বলছি, আমার ব্যাপারে প্লিয কিছু জানাবেন না রানা-সোহানাকে। ওদেরকে সারপ্রাইয দিতে চাই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসে রিসিপশনিস্ট।

মোটেলের পথ ধরে নিয়াযভ। কাছাকাছি পৌঁছে রাস্তার পাশের এক ফোনবুথ থেকে যোগাযোগ করে সিদোরভের সঙ্গে। গতরাতের ব্যাপারে জানায়। বলা বাহুল্য, যে-কথাগুলো বললে নিজের ব্যর্থতা বেশি করে প্রকাশ পাবে তা চেপে যায় এবং যে-কথাগুলো বললে কেন সে ব্যর্থ হয়েছে তা রঙ মাখিয়ে বলে।

'ওদের নাম জানলে কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল সিদোরভ।

আবারও রঙ মাখিয়ে প্রশ্নটার জবাব দিল নিয়াযভ।

'মাসুদ রানা...সোহানা মাসুদ...এ-রকম নাম কেন? কোন্ দেশের মানুষ এরা?'

'ঠিক জানি না, স্যর। দক্ষিণ এশিয়ার কোনও দেশ হতে পারে।'

'এদেরকে নিছক ট্রেজার হান্টার বলে মনে হচ্ছে না আমার। আরেকটা কথা। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় হাজির হতে পেরেছে ওরা—এটা কাকতালীয় হতে পারে না। আমার মনে হয় রে হোগান আগেই সব জানিয়েছে রানা-সোহানাকে। সে-ই খবর দিয়ে নিয়ে গেছে ওদেরকে।'

'হতে পারে, স্যর। আবার না-ও হতে পারে। রাশান ইন্টেলিজেন্সে অনেকদিন কাজ করেছি আমি। আপনার কাছে আছি বারো বছর। বিভিন্ন সময়ে অনেক লোককে জেরা করতে হয়েছে। কে সত্যি বলছে আর কে মিথ্যা বলছে, ধরতে পারি আমি। ওই বোতলের ব্যাপারে রানা-সোহানাকে যদি কিছু বলেও

থাকে হোগান, বেশি কিছু বলতে পেরেছে বলে মনে হয় না। কারণ আমার ধারণা আসলেই বেশি কিছু জানে না সে ওই ব্যাপারে।'

'হুঁ। তোমার জায়গায় আমি থাকলে কী করতাম জানো?'

'কী, স্যর?'

'ধরে নিতাম মিথ্যা বলেছে হোগান। ধরে নিতাম এ-রকম, কিছু করে রানা-সোহানা, যে-কাজে আনআর্মড কমব্যাটের প্রয়োজন হয়। এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতাম।'

'আমিও করবো, স্যর।'

'যেমন?'

'হোটেলের রিসিপশনিস্টের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি প্রতিদিনই নাকি জলাভূমির দিকে যাচ্ছে রানা-সোহানা। কাজের সুবিধার জন্য একটা মোটরবোটও নাকি ভাড়া নিয়েছে। আমার লোকেরা এসে পড়লেই রওনা হবো ওদেরকে নিয়ে। কপোত-কপোতীকে পাকড়াও করতে বেশি সময় লাগবে না আশা করি। তারপর...'

বাকিটুকু না শুনেই লাইন কেটে দিল সিদোরভ। নিয়াযভের উপর বিরক্ত হয়েছে সে। আস্তে আস্তে বাড়ছে বিরক্তিটা। ওর কাছে ব্যর্থতা মানে মৃত্যু। আর মৃত্যু মানেই লাশ।

লাশ শব্দটা শুনলে এত বছর পরও বিধ্বস্ত আমু ডার্য়ার ছবিটা ভেসে ওঠে সিদোরভের স্মৃতিতে। অসহ্য প্রতিশোধস্পৃহায় কাঁপতে থাকে ওর পুরো অস্তিত্ব। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না সে।

মেহগনি কাঠে-বানানো নির্দোষ পারস্য টেবিলটার উপর দুম্ করে কিল বসিয়ে দিল সিদোরভ।

বিশেষ খাঁড়িটার অবস্থান ম্যাপে দাগিয়ে রেখেছিল রানা। তাই

সেটা খুঁজে পেতে সমস্যা হলো না। গতরাতের বৃষ্টিতে আরও ডালপালা ভেসে এসে জমেছে খাঁড়িমুখে। জলাভূমির পাখি-শিকারীরা শিকারের সময় যে-রকম আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকে, খাঁড়িমুখটা হয়েছে ঠিক সে-রকম—পিছনে মরা ধূসর কাণ্ড, সামনে ঘন সবুজ পাতা।

মোটরবোটটা জায়গামতো নিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল সোহানা। মজবুত একটা কাণ্ডের সঙ্গে বাঁধল পেইন্টার লাইন। ওটা ঠিকমতো এঁটে না বসা পর্যন্ত নৌকাটাকে দুলতে দিল ওরা। বাঁধনটা দেখল রানা। নিশ্চিত হলো আলগা হবে না ওটা, স্রোতে ভেসে যাবে না মোটরবোট। সোহানার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল ও।

পানিতে নেমে পড়ল সোহানা। আগেরবারের মতোই ডুবসাঁতার দিয়ে চলে গেল খাঁড়িমুখের ভিতরে। ওদের সরঞ্জামবাহী ডাফ্ল ব্যাগ দুটো নিয়ে রানাও নেমে পড়ল পানিতে। খাঁড়িমুখ পার হয়ে দেখল ইতোমধ্যে তীরে উঠে পড়েছে সোহানা। রানাকে মাথা তুলতে দেখে হাত বাড়িয়ে দিল ও। সাঁতরে এগিয়ে গিয়ে ওর হাতে ব্যাগ দুটো তুলে দিল রানা। তারপর উঠে পড়ল তীরে। দু'জনে দুটো ব্যাগ তুলে নিল কাঁধে। এগিয়ে চলল লম্বা ঘাস-গুল্মের জঙ্গল মাড়িয়ে, তীর বরাবর। খাঁড়ির আরেকপ্রান্তে হাজির হতে বেশি সময় লাগল না।

বাঁয়ে বিক্ষিপ্তভাবে জন্মে আছে গুটিকয়েক ঝোপঝাড়। স্রোতে ভেসে এসে যেন এগুলোর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে কিছু ডালপালা। দূরে তাকালে চোখে পড়ে নদীর মেইন চ্যানেল। মনে হয়, এই খাঁড়ি যেন একটা টানেল। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। ধূসর সবুজে মোড়া। রহস্যে ঢাকা। আর পানির কয়েক ফুট উপরে মাথা তুলে-থাকা, শ্যাওলায় ঢাকা পেরিস্কোপটার দিকে তাকালে মনে হয়, ওটা যেন প্রাচীনকালের কোনও সামুদ্রিক

সাপের ঘাড়।

বুকের উপর দু'হাত আড়াআড়িভাবে রেখে আঙুলগুলো দিয়ে দু'বাহু ডলল কিছুক্ষণ সোহানা। শীত শীত লাগছে। নিচু গলায় বলল, 'কেমন ছমছমে পরিবেশ, না?'

কিছু না বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল রানা। ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। পেরিস্কোপটার দিকে তাকিয়ে আছে।

'কীভাবে কী করবে, ভেবেছ?' জানতে চাইল সোহানা।

আবারও মাথা ঝাঁকাল রানা। 'প্রথমে দেখবো সাবমেরিনটার কী অবস্থা। ওটার গায়ে বিশেষ কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় কি না খুঁজবো। সম্ভব হলে ভিতরে ঢুকতে চাই।'

'ভিতরে ঢোকাটা কি একটু বেশি হয়ে যাবে না?' সোহানার গলায় শঙ্কা।

'আমার ডাইভিং স্কিলের উপর সন্দেহ আছে নাকি তোমার?' মুচকি হাসল রানা। 'ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত যেতে চাই। তা ছাড়া আমি একা না। সঙ্গে তুমি আছো।' ব্যাগ খুলল ও। ভিতরের জিনিসগুলো একে একে বের করছে।

প্রথমে একটা ডাইভিং মাস্ক। তারপর একজোড়া ট্রাঙ্কেটেড সুইমিং ফিন। এরপর ওয়াটারপ্রুফ ফ্ল্যাশলাইট, সঙ্গে এক্সট্রা ব্যাটারি। চার কয়েল নাইলনের দড়ি। তিনটা র‍্যাচেট ব্লক। এই ব্লকগুলো আসলে হুকযুক্ত দাঁতালো চাকা। হুক থাকার কারণে এগুলো শুধু একদিকে ঘুরতে পারে। ইচ্ছা করেই ব্লকগুলো নিয়ে এসেছে রানা—যদি সাবমেরিনের ভিতরে ঢুকতে হয়, নড়াচড়ায় যাতে স্থানচ্যুত না হয় ওটা। সবশেষে তিনটে স্পেয়ার এয়ার ইমার্জেন্সি পনি ট্যাঙ্ক। এগুলোর একেকটা কাজে লাগিয়ে কম পক্ষে ষাটবার দম নেয়া যাবে। তারমানে দরকার হলে টানা পাঁচ মিনিট থাকা যাবে পানির নীচে।

'এতকিছু যোগাড় করলে কখন?' আশ্চর্য হয়ে গেছে সোহানা।

'কোত্থেকে?'

'আজ ভোরে। তুমি তখনও ঘুম থেকে ওঠোনি। গতরাতে ভেবে রেখেছিলাম কী কী লাগবে। তখনই এস.এম.এস. পাঠিয়ে দিই মোটরবোটের মালিককে। পাল্টা মেসেজে সে জানায় সবকিছুর ব্যবস্থা করতে পারবে। আজ ভোরে ডেলিভারি দিতে পারবে তা-ও জানায়।'

'তারমানে সাবমেরিনের ভিতরে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছ?'

'সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি বলবো না। যদি সুযোগ পাই চেষ্টা করে দেখবো।' উঠে দাঁড়াল রানা। অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে হাত রাখল সোহানার কাঁধে। 'ঘাবড়িয়ো না। বোকার মতো কিছু করবো না।'

'ঠিক আছে,' সন্তুষ্টির হাসি হাসল সোহানা।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পাড় থেকে পিছলে নদীতে নেমে পড়ল রানা। সাঁতার কেটে এগিয়ে যাচ্ছে পেরিস্কোপটার দিকে। কাছে গিয়ে শক্ত করে ধরল ওটাকে। জোরে টান দিল কয়েকবার। ঝাঁকাল। নাহ্, এখনও শক্তপোক্ত আছে জিনিসটা।

নাইলন রোপের একটা কয়েল তুলে নিল সোহানা। একটা প্রান্ত বাঁ হাতে ধরে রেখে বাকি কয়েলটা ছুঁড়ে দিল রানার দিকে। ওটা লুফে নিল রানা। পেরিস্কোপের সঙ্গে বাঁধল শক্ত করে। তারপর সোহানার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

হাতে-থাকা দড়ির প্রান্তটা র‍্যাচেট ব্লকের সঙ্গে বাঁধল সোহানা। তারপর ব্লকটা আটকে দিল কাছের এক গাছের কাণ্ডের সঙ্গে।

'এবার আরেকটা কয়েল, সোহানা,' উঁচু গলায় বলল রানা।

দ্বিতীয় কয়েলটার একপ্রান্ত পেরিস্কোপের সঙ্গে, আরেকপ্রান্ত র‍্যাচেট ব্লক হয়ে গাছের কাণ্ডের সঙ্গে বাঁধা হয়ে গেল।

সাঁতরে পাড়ে ফিরে এল রানা। টেনেটুনে দেখল দড়ির বাঁধন। সন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'ঠিক আছে। প্রচণ্ড ঝড় না হলে ধরে নেয়া যায় কোথাও যাচ্ছে না ওই সাবমেরিন। যাচ্ছি আমি।' নিচু হয়ে তুলে নিল একটা পনি ট্যাঙ্ক। 'প্রথমে চেষ্টা করবো দম চেপে কাজ করতে। যদি বেশি নীচে নামতে হয় সেক্ষেত্রে কাজে লাগবে এটা।'

'কিন্তু আমি...'

কথাটা শেষ করতে পারল না সোহানা। ঝট্ করে ঘাড় ঘুরিয়ে ফেলেছে রানা। ঠোঁটের কাছে আঙুল তুলে কথা বলতে নিষেধ করছে।

পাঁচ সেকেণ্ড কাটল। এবার শোনা যাচ্ছে শব্দটা। অস্পষ্ট, কিন্তু খেয়াল করলে কানে আসে।

একটা মোটরবোটের ইঞ্জিন।

'এদিকেই আসছে,' নিচু গলায় বলল রানা।

'জেলে?' শুনেই বোঝা গেল যে বা যারা মোটরবোটে আছে তারা জেলে কি না সে-ব্যাপারে সন্দেহ আছে সোহানার।

'জানি না। মদের বোতলটা এখানেই কোথাও পেয়েছিল হোগান। যে-লোকটা কাল রাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ওকে, হতে পারে ওকে কিছু কথা বলেছে হোগান। হতে পারে সত্য-মিথ্যা যাচাই করার জন্য মোটরবোট ভাড়া করে এখানে হাজির হয়ে গেছে লোকটা।' পনি ট্যাঙ্কটা হাত থেকে ছেড়ে দিল রানা। ঘাসের পুরু কার্পেটে নিঃশব্দে পড়ল ওটা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে ব্যাগের ভিতর থেকে বিনকিউলার বের করল রানা। উঠে দাঁড়িয়েই ছুট লাগাল। পিছন পিছন আসছে সোহানা।

খাঁড়িমুখের কাছে যেখানে ওদের মোটরবোট বাঁধা আছে সেখানে পৌঁছে থামল রানা। উঁচু ঘাসের জঙ্গলে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে জলাভূমির দিকে তাকাল

রানা।

কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরই দেখা গেল নৌকাটাকে। মোটরবোট না। পাওয়ারবোট। জলাভূমির একটা বাঁক ঘুরে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে। চারজন লোককে দেখা যাচ্ছে। হুইল ধরে দাঁড়িয়ে আছে একজন। গলুইয়ের কাছে আরেকজন। বাকি দু'জন বসে আছে আফটারডেকে।

হুইল ধরে যে-লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, তার চেহারায় যুম করল রানা।

রোগাটে বৈশিষ্ট্যহীন চেহারা। রঙ রোদে পুড়ে গেছে। চোখের নীচে কালো দাগ। ভাঙা নাক। নাকের কাছে লম্বা কাটাদাগ।

গতরাতের সেই কিডন্যাপার।

'এসে গেছে কাটামুখ,' নিচু গলায় বলল রানা। 'সঙ্গে তিন চ্যালা।'

খবরটা হজম করতে সময় লাগল সোহানার। 'দুষ্টুমি করছ না তো?'

একলাফে উঠে দাঁড়াল রানা। দু'পা দৌড়ে পাড় থেকে পিছলে নেমে পড়ল পানিতে। জরুরি কণ্ঠে বলল, 'আমাদের মোটরবোট! জলদি এসো।'

আট

সিকি মাইল দূরে আরেকটা খাঁড়ির কাছে পাওয়ারবোট ভিড়িয়েছে কাটামুখ। গলুইয়ের কাছের লোকটা চোখে ঠেকিয়েছে

বিনকিউলার। উঁচু গলায় কী যেন জিজ্ঞেস করছে কাটামুখ। প্রতিধ্বনিত হয়ে ওর কণ্ঠ রানার কানে বাজছে। প্রশ্নটার জবাব রাশান ভাষায় দিল কেউ।

'এবার তা হলে রাশানরা?' বিড়বিড় করে নিজেকেই জিজ্ঞেস করল রানা। লম্বা করে দম নিয়ে ডুব দিল। কয়েক মুহূর্ত পর ভেসে উঠল ওদের মোটরবোটের পাশে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। দূরের ওই খাঁড়িমুখের ভিতরে কিছুটা বাঁক নিয়ে ঢুকে যাচ্ছে পাওয়ারবোট। তারমানে একটা চক্কর দিয়ে বের হয়ে আসবে। অর্থাৎ হাতে আছে মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড।

দ্রুত হাতে পেইন্টার লাইনের বাঁধন খুলে ফেলল রানা। খাঁড়িমুখের যে-জায়গায় ডালপালা আটকে আছে তার পাশেই নলখাগড়ায় ছাওয়া নরম মাটির পাড়, ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে সোহানা, সাঁতরে গিয়ে হাজির হলো রানা ওর পাশে। আঁকড়ে ধরল মোটরবোটের গলুইয়ের খিল। পেইন্টারটা জড়িয়ে ধরল আরেক হাতে।

কিছুটা এগিয়ে এসে সোহানাও ধরল গলুইয়ের একটা প্রান্ত। দু'জনে মিলে সর্বশক্তিতে টানতে শুরু করল। তীরের নরম মাটিতে ধাক্কা খেল নৌকার তলা। আলগা কিছু মাটি খসে পড়ল পানিতে। দাঁতে দাঁত চাপল রানা, জোর বাড়াল। এবার ইঞ্চি ইঞ্চি করে উপরে উঠছে নৌকাটা। টানতে টানতেই দূরে তাকাল রানা।

পাওয়ারবোটটা প্রায় তিন শ' গজ দূরে আছে। ওদিকের খাঁড়িমুখ থেকে একটু একটু করে বের হচ্ছে ওটার নাক। গলুইয়ের লোকটা বিনকিউলার চোখে তাকিয়ে আছে সোজা সামনের দিকে। ঘাড়টা বাঁয়ে কাত করলেই রানাদেরকে দেখতে পাবে। কাটল কয়েকটা সেকেণ্ড। এবার দেখা গেল কাটামুখকে। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের দু'জনের সঙ্গে কথা বলছে সে।

দু'পা ছড়িয়ে দিয়েছে রানা। ওর পা দেবে গেছে নরম

মাটিতে। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে ও। প্রচণ্ড টান লেগে ফুলে উঠেছে গলার রগ। টের পাচ্ছে দু'কাঁধের পেশী যেন খামচে ধরেছে কেউ। দাঁতে দাঁত চেপেই বলল, 'টানো, সোহানা।'

মোটরবোটের নাকটা উঠে এল তীরে। ভাগ্য ভালো, পাড়ের মাটি নরম। তা ছাড়া গতরাতের বৃষ্টি আর সকালের কুয়াশায় ভিজে নলখাগড়াগুলোও পিচ্ছিল হয়ে আছে।

শেষপর্যন্ত নৌকাটা উঠে এল তীরে। ওটাকে টানতে টানতে ঘাসের জঙ্গলের ভিতরে ঢুকাল রানা-সোহানা।

'মাথা নামাও, সোহানা,' বলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। সোহানাও শুয়ে পড়ল ওর পাশে।

ঘাসের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দূরে তাকিয়ে আছে রানা। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসছে শ্বাসপ্রশ্বাস।

'কী মনে হয়?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সোহানা, 'কাজ হয়েছে?'

রানাও ফিসফিস করে বলল, 'কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবো।'

'যদি না হয়?'

'সেক্ষেত্রে দৌড়ে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে যাবে তুমি।'

'আর তুমি?'

জবাব না দিয়ে ঠোঁটের কাছে আঙুল তুলল রানা।

কাছিয়ে এসেছে পাওয়ারবোটের ইঞ্জিনের আওয়াজ। শুনে বোঝা যাচ্ছে এদিকেই আসছে।

কাটামুখের গলা শোনা গেল কিছুক্ষণ পর, 'কিছু চোখে পড়ল?'

'না,' ফ্যাঁসফ্যাঁসে কণ্ঠে জবাব দিল কেউ।

'কিন্তু...' কাটামুখের কণ্ঠে দ্বিধা, 'বারো-চোদ্দ ফুট লম্বা মোটরবোটে করে এদিকেই কোথাও এসেছে ওরা। সে-রকমই

বলা হয়েছে আমাকে।'

'মোটরবোট যে ধার নিয়েছে ওরা সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই,' বলল তৃতীয় একটা কণ্ঠ, 'কিন্তু আমার মনে হয় এখানে আসেনি। এলে আমাদের কারও-না-কারও চোখে পড়তই এতক্ষণে। বিনকিউলারও ব্যবহার করছি আমরা। কই, এই চ্যানেলে তো কাউকেই দেখতে পেলাম না?'

'আমার মনে হয় পাশের কোনও চ্যানেলে গিয়ে ঢুকেছে ওরা।'

আরও জোরে আওয়াজ করছে পাওয়ারবোটের ইঞ্জিন। তারমানে সম্ভবত নাক ঘুরিয়ে নেয়া হচ্ছে ওটার। ইঞ্জিনের আওয়াজ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে দূরে। একসময় ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না।

'পাশের কোনও চ্যানেলে গিয়ে ঢুকেছে ওরা,' হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা, বিনকিউলারটা ঠেকিয়েছে চোখে। 'হ্যাঁ, ঠিকই। কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। চলে গেছে সবাই।'

চিৎ হলো সোহানা। 'বাঁচা গেল!'

ওর পাশে শুয়ে পড়ল রানা। হাত বাড়িয়ে ধরল সোহানার হাত। জিজ্ঞেস করল, 'কী করবে এখন? থাকবে, না চলে যাবে?'

উত্তর দিতে দ্বিধা করল না সোহানা, 'থাকবো। আমি পরাজয় মেনে নিতে রাজি না। এতদূর পর্যন্ত যখন আসতে পেরেছি তখন গুণ্ডাদের ভয়ে রহস্যের সমাধান না করে চলে যাবো? বিপদের মোকাবেলা আগেও করেছি। তা ছাড়া,' মিষ্টি করে হাসল, 'এখন আমার পাশে তুমি আছো।'

'কে বলে নারী অবলা?' কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো রানা, সোহানার ঠোঁটে চুমু দিল আলতো করে, 'চলো। কাজে নেমে পড়ি।'

থু করে মাস্কের কাচে থুতু দিল রানা। তারপর ওটা পানিতে ধুয়ে ভালোমতো আটকে নিল চেহারায়। সোহানা দাঁড়িয়ে আছে ওর পাশে। কোমরে হাত রেখে দেখছে রানার কাজ। চেহারায় কিছুটা দুশ্চিন্তা।

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ক্রুসেডে যাচ্ছে তোমার প্রিয়তম!' ঠাট্টা করল রানা, 'জীবিত ফেরার সম্ভাবনা খুবই কম।'

সোহানা কিছু বলল না।

'যাবো, ধরো আধ ঘণ্টা কাটিয়ে চলে আসবো। খাঁটি বাংলায় যাকে বলে উঁকি মেরে দেখা। পরীক্ষানিরীক্ষা করবো না। বোতলের অক্সিজেনের চেয়ে নিজের চেপে-রাখা দমের উপর নির্ভর করবো বেশি। বোতলগুলো যত বেশি সম্ভব অব্যবহৃত রাখতে চাই। পরে সাবমেরিনের ভিতরে ঢুকলে কাজে লাগবে। আমি নীচে থাকার সময় যদি দেখো র‍্যাচেট ব্লকে টান লেগেছে, চেষ্টা কোরো ওগুলোকে জায়গামতো রাখার। আর যদি দেখো চার-পাঁচ ঘণ্টা পার হয়েছে কিন্তু আমার উপরে আসার কোনও লক্ষণ নেই; তখন ইচ্ছে হলে দু'-এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলো...'

'তোমার কি ভয় বলতে কিছু নেই, রানা? সবকিছুই কি তুমি এমন সহজভাবে নিতে পারো?'

জবাব না দিয়ে মুচকি হাসল রানা। বলল, 'দুর্গ সামলাও। আসছি আমি।'

ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালল ও। লম্বা করে দম নিয়ে ডুব দিল পানির নীচে। বাঁ হাত চালিয়ে নেমে যাচ্ছে আরও নীচের দিকে।

পানিতে শ্যাওলা ভরা। সবুজ আভা ছড়িয়ে আছে চারদিকে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় আরও দেখা যাচ্ছে নানান রকমের ভাসন্ত জলজ গাছ। ভাসছে অতি ক্ষুদ্র প্রাণীকণা। পরিবেশটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে রানার কাছে। মনে হচ্ছে যেন কোনও স্লো-

গ্লোবের ভিতরে আটকা পড়ে গেছে।

বেশ কিছুদূর নেমে ডুবসাঁতার দিয়ে এগিয়ে গেল ও সাবমেরিনটার দিকে। কাছে পৌঁছে হাত বাড়িয়ে দিল। শক্ত মতো কী যেন লাগল হাতে। ফ্ল্যাশলাইটটা কাছে আনল ও।

সাবমেরিনের তলার একটা অংশ। আরেকটু নামল রানা। এখানকার পানিতে জলজ আগাছার পরিমাণ বেশি। ওগুলোর সঙ্গে জড়াজড়ি করে থাকা কাদাও বেশি তাই। ফ্ল্যাশলাইটটা বার বার এদিক-ওদিক করে আলো ফেলল রানা। কীসের সঙ্গে আটকে আছে সাবমেরিনটা বুঝতে চায়।

ঝড়ে হোক অথবা অন্য যে-কোনও কারণে হোক, বিশাল কিছু গুঁড়ি ডুবে আছে পানিতে। সাবমেরিনের তলার প্রায় মাঝখানের অংশটা বেশ ভালোভাবেই ফেঁসে গেছে গুঁড়িগুলোর সঙ্গে। ব্যালেন্স কতখানি ঠিক আছে বা থাকবে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু হঠাৎ খসে গিয়ে রানাকে ভর্তা বানিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা কম।

স্বস্তি বোধ করল রানা। টের পেল বাতাসের জন্য আকুলিবিকুলি করছে ফুসফুস। দু'পা বুকের কাছে জড়ো করে এনে লাথি মারল নীচের পানিতে। একইসঙ্গে দু'হাত চালিয়ে উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে।

ভুস্‌স্‌ করে মাথা তোলার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল সোহানীর কণ্ঠ, 'সব ঠিকঠাক?'

হাঁ করে কিছুক্ষণ দম নিল রানা। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'কয়েকটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ভালোমতো আটকে গেছে ওটা। হঠাৎ করে খসে পড়বে বলে মনে হয় না।' ফুসফুস দুটো ভর্তি করে নিল বাতাসে। 'আবার যাচ্ছি আমি।'

ডুব দিল ও। সাহস বেড়েছে, তাই সরাসরি চলে এল সাবমেরিনের নীচে। ডুবসাঁতার দিয়ে হাজির হলো ওটার আরেক দিকে, লেজের কাছাকাছি। এখানে সাবমেরিনটার গায়ে, দৈর্ঘ্য

বরাবর ব্র্যাকেটের মতো কী যেন দেখা যাচ্ছে। ফ্ল্যাশলাইটা আরও একবার কাছে আনতে হলো। ব্র্যাকেটের মতো ওই জিনিস এত পরিচিত হওয়ার পরও ধক্ করে উঠল রানার বুকের ভিতরে।

টর্পেডো হোল্ডিং রেইল।

সাঁতার কাটা থামাল রানা। ফ্ল্যাশলাইটটা বার বার ঘুরাচ্ছে এদিকে-সেদিকে। গাছের গুঁড়ির মতো দেখতে অনতিদূরের ওই জিনিসগুলোর সবগুলোই কি কাণ্ড? নাকি কোনওটা আবার...

সাঁতার কাটতে শুরু করল রানা। ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে সাবমেরিনটার দৈর্ঘ্য বরাবর, সামনের দিকে। সিগারের মতো দেখতে মুখটার কাছাকাছি পৌঁছাতে সময় লাগল না। যা খুঁজছে তা-ও পেয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। সাবমেরিনটার পিঠের কাছে আঠারো ইঞ্চির মতো উঁচু একটা গর্ত। ব্যাস ইঞ্চি বিশেক হবে। সঙ্গে হুইলওয়ালা ঢাকনা।

এন্ট্রি হ্যাচ।

আবারও বাতাসের জন্য কাতরাচ্ছে ফুসফুস। উপরে উঠে এল রানা। সাঁতার কেটে হাজির হলো তীরে। ওকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল সোহানা। বাড়ানো হাতটা ধরে পানি ছেড়ে উঠল রানা। কিছুটা হেঁটে বসে পড়ল ঘাসের জঙ্গলে। প্রথমে ফিন, তারপর মাস্ক খসাল। সোহানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মল্‌শ্।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল সোহানার। 'মানে?'

'শব্দটা জার্মান। মানে হচ্ছে স্যালাম্যাণ্ডার।'

'কী বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না। দেখতে গেলে সাবমেরিন। এসে বলছ মল্‌শ্...স্যালাম্যাণ্ডার...'

হাসল রানা। 'ওই সাবমেরিনটার নাম মল্‌শ্। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে নাৎযিরা বানিয়েছিল। খুব সম্ভব উনিশ শ' চুয়াল্লিশ সালে। আর টিকটিকির মতো দেখতে উভচর প্রাণীদের যত প্রজাতি আছে তাদের সবাইকে একশব্দে বলে স্যালাম্যান্ডার।

সাধারণ সাবমেরিনের চেয়ে অনেক ছোট তো, এজন্য নাৎযিরা আদর করে নাম দিয়েছিল স্যালাম্যাণ্ডার বা মল্‌শ্‌।'

'কিন্তু...'

'আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল,' সোহানাকে কথা শেষ করতে দিল না রানা, 'গত রাতে ইণ্টারনেটে সার্চ করেছি। আজ সামনাসামনি দেখে নিশ্চিত হলাম। ব্রেমেনের একটা কোম্পানি জার্মান নৌবাহিনীর জন্য বানায় ওটা। বুদ্ধি যুগিয়েছিলেন ডক্টর হেনরিখ ড্র্যাগার নামের এক বিজ্ঞানী। সাবমেরিনটা লম্বায় পঁয়ত্রিশ ফুট। ডেক থেকে তলা পর্যন্ত তিন ফুট, এক বিম থেকে আরেক বিম পর্যন্ত ছ'ফুট। ডিজাইন করা হয়েছে এমনভাবে, যাতে ভিতরে মাত্র একজন কি বেশি হলে দু'জন নৌ-সেনা থাকতে পারে। তলার দু'পাশে দুটো টর্পেডো হোল্ডিং র‍্যাক, সেখানে দুটো "জি সেভেন ই" টর্পেডো । এই মল্‌শ্‌ একশ' বিশ ফুট গভীরতায় তিন নট গতিতে পঞ্চাশ নটিকাল মাইল পর্যন্ত যেতে পারে। একজনের জন্য চালানো কষ্টকর, তার উপর অন্য কোনও জলযানের সাহায্য ছাড়া বেশিদূর যেতেও পারে না—মূলত এ দুটো কারণে জার্মানদের মল্‌শ্‌ প্রজেক্ট ব্যর্থ হয়।'

'বুঝলাম,' কোমরে হাত দিল সোহানা। 'কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই মার্কিন মুল্লুকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এত বছর পরে কী করছে একটা মল্‌শ্‌? তুমি বলছ অন্য কোনও জলযানের সাহায্য ছাড়া বেশিদূর যেতে পারত না সাবমেরিনটা। তা হলে এত দূর এল কী করে? মার্কিন নৌবাহিনী কি ঘুমাচ্ছিল তখন?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল রানা। 'নেটে পড়লাম হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে আর ভূমধ্যসাগরের কয়েকটা দ্বীপে অ্যাকশন চালিয়েছিল মল্‌শ্‌। কিন্তু এত দূরে এসেছিল বলে রেকর্ড নেই। অন্তত আমি পাইনি।'

'এ-রকম ক'টা সাবমেরিন বানিয়েছিল নাৎযিরা?'

'চারশ'র মতো। বেশিরভাগই হারিয়ে গেছে। হয় ডুবে গেছে নয়তো স্রেফ উধাও। আমি বলবো যে-সব নৌ-সেনা সওয়ার হয়েছে মল্‌শ্‌-এ তাদেরকে বোকা বানানো হয়েছে। কারণ একেকটা মল্‌শ্‌ আসলে একেকটা মৃত্যুফাঁদ।'

'একজন মাত্র নৌ-সেনা চালাত সাবমেরিনটা। তারমানে...'

'ভিতরে না ঢুকলে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাবে না।'

অপলক চোখে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা, দৃষ্টিতে প্রশ্ন।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ, সাবমেরিনটার ভেতরে ঢুকবো।'

প্রতিবাদ করল না সোহানা। জানে কিছু বললে লাভ হবে না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে রানা। ওকে ঠেকানো যাবে না।

'টর্পেডোর ব্যাপারটা কী?' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জানতে চাইল সোহানা।

'আমার মনে হয় না খুঁজলে কোনও টর্পেডো পাওয়া যাবে আশপাশে। ও-রকম কিছু থাকলে ওজনে অনেক ভারী হতো সাবমেরিনটা। সেক্ষেত্রে প্রচণ্ড ঝড়ে স্রোতের ধাক্কায় উপকূল থেকে এত ভিতরে আসতে পারত না। ভাসমান গুঁড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আটকে যেত না।'

'রানা, এক কাজ করলে কেমন হয়? চলো গিয়ে সব বলি কোস্ট-গার্ডদেরকে। যা করার ওরাই করুক। না পারলে খবর দেবে নেভিকে।'

'তবে তার আগে,' হাত বাড়িয়ে মাস্ক আর ফিন নিল রানা, 'আমাকে নিশ্চিত হতে হবে অন্তত সাবমেরিনটার আশপাশে কোনও লাইভ টর্পের্ডো নেই। ধরো কোস্ট গার্ডরা এল। উদ্ধার কাজ করতে গিয়ে টর্পেডো ফুটে মরল। সেটা কি ভালো হবে?'

নয়

স্পেয়ার এয়ার পনি ক্যানিস্টার নিয়ে পানিতে নেমে পড়েছে রানা। সাবমেরিনটার তলা ভালোমতো দেখছে ও। প্রথমবার মাথা থেকে শুরু করে লেজ পর্যন্ত। পরেরবার লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত। কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না।

কোমরে ঝোলানো ডাইভিং নাইফটা খুলল রানা। এগিয়ে গেল গুঁড়িগুলোর দিকে। কাছে পৌঁছে বাঁট দিয়ে বাড়ি মারল ওগুলোর গায়ে। পচা কাঠে ছুরির বাঁটের ভোঁতা আওয়াজ শোনা গেল।

ছুরিটা কোমরে গুঁজে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে রানা। হাতে-ধরা ফ্ল্যাশলাইটটা বার বার ঘোরাচ্ছে। আলোটা শেষপর্যন্ত স্থির হলো গুঁড়িগুলোর উপর। কোনও কোনওটার গায়ে এখনও ছাল আছে, পচে খসে যায়নি। তারমানে বেশিদিন হয়নি এখানে জড়ো হয়েছে কাণ্ডগুলো। সুতরাং ধরে নেয়া যায় সাবমেরিনটাও এখানে হাজির হয়েছে ইদানীং।

প্রচণ্ড ঝড়ে বিক্ষুব্ধ স্রোত উপকূল থেকে ঠেলে এই খাঁড়িতে নিয়ে এসেছে ওটাকে, ভাবল রানা। যদি ধরে নেয়া হয় ওটার সঙ্গে টর্পেডো ছিল তা হলে শক্তিশালী স্রোতের মাতামাতিতে আপনাথেকেই খসে গেছে, হয়তো শুয়ে আছে মূল উপকূলের অগভীর সী-বেডে। তারমানে এখান থেকে কম করে হলেও বিশ মাইল দক্ষিণে।

সাবমেরিনের তলাটা আরেকবার দেখল রানা। অন্তত

টর্পেডোজাতীয় কিছু নেই নিশ্চিত হওয়ার পর শুরু করল পরের কাজ। ফ্ল্যাশলাইটটা খুব কাছ থেকে ধরে সাবমেরিনটার পিঠ দেখল এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত। তারপর দেখল দু'পাশ। না, কোনও ফাটল বা ফুটো নেই। তারমানে যেহেতু এণ্ট্রি হ্যাচ বন্ধ সেহেতু ধরে নেয়া যায় ভিতরে পানি ঢোকেনি।

উপরে উঠে এল রানা।

'কী খবর?' ওকে দেখামাত্র জিজ্ঞেস করল সোহানা।

মাস্ক সরাল রানা। মুখ থেকে বের করল এয়ার ক্যানিস্টারের পাইপ। বলল, 'ভালো আর খারাপ দুটোই আছে। কোন্‌টা শুনতে চাও আগে?'

'ভালোটা।'

'আমি শতকরা নব্বই ভাগ নিশ্চিত নীচে কোনও টর্পেডো নেই।'

'আর?'

'শতকরা নিরানব্বই ভাগ নিশ্চিত সাবমেরিনের ভিতরে পানি ঢোকেনি।'

'খারাপ খবরটা?'

'ধারেকাছে টর্পেডো আছে কি নেই সে-ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত না। যদি থেকে থাকে এবং হঠাৎ ফুটে যায়...'

'তা হলে তুমি-আমি একসঙ্গে মরবো,' হাসল সোহানা। 'জানি তোমাকে সারাজীবনের জন্য আপন করে পাবো না, তাই তোমার সঙ্গে মরতে পারলে সেটাকেই বড় একটা সৌভাগ্য মনে করবো।'

পরের এক ঘণ্টা একটানা কাজ করল রানা।

র‍্যাচেট ব্লকের লাইনগুলো সাবমেরিনের সঙ্গে ভালোমতো আটকিয়েছে ও। প্লেসমেন্ট ঠিকমতো হয়েছে কি না তা কয়েকবার

চেক করেছে। খাঁড়ির তীরে, তিনটা বিশাল গাছের কাণ্ডের সঙ্গে বেঁধেছে তিনটা ব্লক। পানির উপরে লাইনসহ তিনদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে আছে ওগুলো যে, দেখলে সিলিংফ্যানের কথা মনে পড়ে যায়। তিনটা লাইন এখন জড়িয়ে আছে সাবমেরিনটার তিনটা জায়গা—বো-ক্লিট, এণ্ট্রি হ্যাচ আর প্রোপেলার শাফ্‌ট।

এই এক ঘণ্টার মধ্যে দু'বার শোনা গেছে ইঞ্জিনবোটের গর্জন। দু'বারই কাজ ফেলে ঘাসের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছে রানা-সোহানা। ঝুঁকি নিয়ে দেখেছে কে বা কারা এসেছে ধারেকাছে।

প্রথমবার দেখা গেছে একটা মোটরবোট। অনেকটা রানাদের মতো। ফুট বিশেক লম্বা। চার ফুটের মতো চওড়া। দশ হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন বাদ দিলে ওজন সত্তর-পঁচাত্তর কেজি। এ-অঞ্চলের লোকেরা এ-ধরনের নৌকাকে বলে ফিশিং মোটর-ক্যানৌ। নৌকায় এক মাঝবয়সী লোক আর এক কিশোর। সম্ভবত বাপ-ব্যাটা। ছেলেটা দক্ষ হাতে ধরে আছে হালের হাতল। বাপ জাল গুটাচ্ছে। জালের ভিতরে দাপাদাপি করছে কিছু মাছ।

নিরীহ জেলে।

দ্বিতীয়বার দেখা-যাওয়া ইঞ্জিন বোটটা কাটামুখের পাওয়ার বোট। চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে পুরো জলাভূমি তন্ন তন্ন করে খুঁজছে লোকটা। কিন্তু যা দেখতে চাইছে তা দেখতে পাচ্ছে না। রানা খেয়াল করল, ধীর গতিতে ভিক্সবার্গ হিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে নৌকাটা।

ঘাসের জঙ্গলের ভিতরে টানা দশ মিনিট পড়ে ছিল রানা-সোহানা। একসময় মিলিয়ে যায় পাওয়ার বোটের আওয়াজ। তারপর কাজে ফিরে আসে দু'জনে।

'আমরা আসলে কী করছি বুঝিয়ে বলবে?' সিলিংফ্যানের মতো ছড়িয়ে-থাকা লাইনগুলোর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল সোহানা।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এণ্ট্রি হ্যাচটা বন্ধ। ধরে নিচ্ছি সাবমেরিনের ভিতরটা ভর্তি হয়ে আছে বাতাসে। ওটাকে পানির উপরে তুলে আনতে চাই আমি।'

'কিন্তু...' সোহানার গলায় সন্দেহ, 'মাত্র তিনটা র‍্যাচেট ব্লক দিয়ে কি করা যাবে কাজটা?'

'যাবে। যদি আমরা সঠিকভাবে সঠিক পরিমাণ বল প্রয়োগ করতে পারি। এই দেখো,' হাতের নোটপ্যাডটা সোহানার দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা, 'অঙ্ক কষে হিসাবটা বের করেছি। ফোর্স ভেক্টর আর বয়্যান্সির ভ্যারিয়েবল কত হওয়া উচিত সে-ব্যাপারে নিশ্চিত আমি এখন।'

'বুঝতে পেরেছি।'

'গুঁড়িগুলোর আশ্রয় ছেড়ে সাবমেরিনটা উঠতে শুরু করামাত্র টের পেয়ে যাবো। যদি আমার হিসাব ভুল হয়, যদি উপরের দিকে না উঠে ডুবে যায় ওটা, তা হলে খেল খতম। কিন্তু যদি ভেসে থাকে তা হলে ধরে নাও ভিতরে ঢুকতে পারবো। আমি গিয়ে দাঁড়াচ্ছি সেণ্টার র‍্যাচেট ব্লকে। তুমি স্টার্ণ ব্লকটার কাছে যাও।'

যার যার "ব্লকের" কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। রানা জিজ্ঞেস করল, 'রেডি?'

'রেডি,' জবাব দিল সোহানা।

'সাবমেরিনটা সরতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ক্র্যাঙ্ক ঘোরাতে শুরু করবে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

ধীর গতিতে র‍্যাচেটের ক্র্যাঙ্ক ঘোরাতে শুরু করল রানা। লাইনে টান লেগে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হচ্ছে। থেকে থেকে যেন আর্তনাদ করে উঠছে স্টিলের হুক। ত্রিশ সেকেণ্ড পর, রানা তখন ওর ক্র্যাঙ্ক চল্লিশবার ঘুরিয়েছে, পানির নীচ থেকে ভেসে এল

কোনও কিছু খসে পড়ার আওয়াজ। সাবমেরিনের পেরিস্কোপটা স্লো-মোশন ছবির মতো এগিয়ে আসছে ওদের দিকে, এদিক-ওদিক দুলছে।

চাপা মচ্‌মচ্‌ শব্দ শোনা গেল আবারও। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে রানা সাবমেরিনের তলার নীচের গুঁড়িগুলো খসে পড়ছে কিংবা ফেটে যাচ্ছে। পায়ের নীচে মৃদু কম্পন টের পাচ্ছে ও। তারপর হঠাৎ করেই বুঝতে পারল, আর ঘোরানো যাচ্ছে না ক্র্যাঙ্ক। দু'বার চেষ্টা করল ও। কিন্তু লাভ হলো না। তারমানে আর ঘুরবে না ওটা।

ঝট্‌ করে সোহানার দিকে তাকাল রানা। জরুরি কণ্ঠে বলল, 'জলদি, সোহানা! যত জোরে পারো ঘোরাও!'

এবার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ শুরু করল সোহানার "ব্লকটা"।

কিছুটা হালকা হয়েছে রানার ব্লকের লাইন। আবার ক্র্যাঙ্ক ঘোরাতে শুরু করল ও। কিন্তু দশ সেকেণ্ড যেতে-না-যেতেই আবারও আটকে গেল ওর ক্র্যাঙ্ক। ওটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে একদৌড়ে বো র‍্যাচেট ব্লকের কাছে গিয়ে হাজির হলো রানা। ঘোরাতে শুরু করল ক্র্যাঙ্ক। লাইনে টান পড়ল একসময়। টানের চোটে রীতিমতো কাঁপছে ওটা। সোহানার দিকে তাকাল রানা। দেখল ওর "লাইনও" কাঁপছে।

'হয়েছে, থামো!' জোরে বলল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে ক্র্যাঙ্ক ঘোরানো বন্ধ করল সোহানা।

'শোনো সোহানা, এবার যা বলবো লক্ষ্মী মেয়ের মতো তা-ই করবে। ক্র্যাঙ্কটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে যাও। গিয়ে ঢোকো ঘাসের জঙ্গলে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বে। আমি না ডাকা পর্যন্ত আসবে না এখানে।'

'কেন?'

'আমার বয়্যান্সির ভ্যারিয়েবলে গণ্ডগোল হলে সাবমেরিনের

ভার সহ্য করতে না পেরে ছিঁড়ে যাবে সবগুলো ব্লকের লাইন। প্রচণ্ড গতিতে ছুটে এসে আঘাত করতে পারে গায়ে। স্টিলের লাইন এত জোরে বাড়ি মারলে...। এবার যাও। আমি না ডাকা পর্যন্ত আসবে না।'

পিছিয়ে গেল সোহানা।

পায়ে পায়ে এগোতে শুরু করল রানা। বো র‍্যাচেট ব্লকের লাইনে আলতো করে হাত বুলাচ্ছে। খাঁড়ির কিনারায় এসে দাঁড়াল একসময়। নীচের দিকে তাকাল।

'লোকে যে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির জয়গান গায়, শুধু শুধু গায় না,' বিড়বিড় করে বলল ও।

বলতে গেলে ওর পায়ের কাছেই এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে সাবমেরিনটা। ত্রিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বেঁকে আছে। ডালপালা ভেদ করে মাথা তুলে আছে পেরিস্কোপটা। পানির ইঞ্চি তিনেক উপরে দেখা যাচ্ছে এণ্ট্রি হ্যাচ।

'ওয়াও!' পিছন থেকে বলে উঠল সোহানা।

কিছুটা চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা। 'তোমাকে না বলেছিলাম...'

'কী মনে করো আমাকে?' মুখ ঝামটা মারল সোহানা। 'কচি খুকি?'

জবাব দিল না রানা। পিছিয়ে গিয়ে ব্যাগের ভিতর থেকে বের করল আরেকটা র‍্যাচেট ব্লক। এণ্ট্রি হ্যাচের সঙ্গে ভালোমতো বাঁধল ওটার লাইন। তারপর ফিরে এসে আরেকটা গাছের সঙ্গে আটকে দিল ব্লকটা। বো আর স্টার্ন ব্লক দুটো খুলল একে একে, খুব সাবধানে। আরও কাছের দুটোর গাছের সঙ্গে আগের মতো মজবুত করে আটকে দিল ওগুলো। এরপর চড়ে বসল সাবমেরিনের ডেকে, ব্যালেন্স রক্ষা করার জন্য একহাতে ধরে রেখেছে একটা লাইন। মৃদু ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হচ্ছে আবার।

সাবমেরিনটা পানির নীচে ঢুকে গেল ইঞ্চিখানেক। দম বন্ধ হয়ে গেছে রানার। বার বার এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে। কোনও ব্লক খসে গিয়ে লাইন ওর দিকে ছুটে আসতে দেখলেই লাফিয়ে পড়বে পানিতে।

কিন্তু সে-রকম কিছু ঘটল না।

'আমার ব্যাগের ভিতরে একটা হাতুড়ি আছে,' সোহানাকে বলল রানা। 'ওটা নিয়ে এসে দাও আমাকে।'

হাতুড়িটা নিয়ে এসে তীরে দাঁড়িয়ে রানার দিকে ছুঁড়ে দিল সোহানা।

ওটা একহাতে লুফে নিল রানা। এগিয়ে গেল কয়েক পা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এণ্ট্রি হ্যাচের পাশে।

চারটা লিভার দেখা যাচ্ছে। চারটের গায়েই জোরে বাড়ি মারল রানা। হাতুড়ি সাবধানে নামিয়ে রাখল পাশে। হাতল ধরে ঘোরানোর চেষ্টা করল। কিন্তু একচুল নড়ল না ওটা।

হাতুড়িটা তুলে নিল রানা। ঠিক করেছে পিটিয়ে ভেঙে ফেলবে লিভারগুলো। জোরে জোরে তিনবার বাড়ি মারতে হলো প্রতিটা লিভারে। হ্যাচ থেকে আলগা হয়ে লিভারগুলো খসে পড়ল সাবমেরিনের পিঠে।

এবার হাতল ঘোরাতে পারল রানা। হ্যাচটা খুলল সশব্দে। সোহানার দিকে তাকাল। দাঁত বের করে হাসল নিঃশব্দে। তারপর উবু হয়ে খোলা হ্যাচ দিয়ে মাথা ভিতরে ঢুকিয়ে দিল কিছুটা।

বোঁটকা একটা গন্ধ এসে বাড়ি মারল নাকে। নাক সরিয়ে নিয়ে বাইরের মুক্ত বাতাস নিল বুক ভরে, তারপর আবার ঢোকাল মাথা। ধক্ করে উঠল রানার বুকের ভিতরে।

পলকহীন চোখে ঠিক ওর দিকেই তাকিয়ে আছে লোকটা।

লোকটার, বলা ভালো, লাশটার মাথায় একটা ক্যাপ। গুমোট পরিবেশে অনেকদিন থাকার কারণে কালচে-ধূসর হয়ে গেছে ওটা। তবে একেবারে উপরের দিকে ডানা-মেলে-থাকা সোনালি ঈগলটা চেনা যায়। চেনা যায় নাৎযি প্রতীকযুক্ত ঈগল-লেজের নীচের বলয়টাও। একেবারে নীচের দিকে "ক্রিগ্স্মেরিন" লেখাটাও চোখে পড়ল।

গাঢ় নীল একটা জাম্পস্যুট লোকটার গায়ে। সাবমেরিনের ভিতরের বাতাসহীন পরিবেশে পঁয়ষট্টি-ছিষট্টি বছর ধরে থাকার কারণে আপনাথেকেই যেন মমি হয়ে গেছে লাশটা।

'আমি নিশ্চিত, দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে বেচারা,' রানার পাশে-দাঁড়িয়ে সোহানা বলে উঠল ফিসফিস করে, যেন জোরে কথা বললে কোনও সমস্যা হবে। 'এই এতক্ষণে বেরিয়ে গেল দমটা। মরার পর স্বাভাবিকভাবেই পচন ধরার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। কারণ অক্সিজেনের অভাব। ব্যাকটেরিয়াগুলো ঠিকমতো কাজ করতে পারেনি।'

কিছু বলছে না রানা। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হতভাগ্য লোকটার দিকে। বুঝতে পারছে মরার সময় কতখানি কষ্ট পেতে হয়েছে বেচারাকে। খোলা হ্যাচের কাছেই স্ক্রু দিয়ে আটকানো আছে মই, ওটার শেষ ধাপের কাছে আধশোওয়া হয়ে আছে লাশটা। চেহারায় দুর্বিষহ যন্ত্রণার ছাপ। হাঁ হয়ে আছে মুখটা। দুই চোখ বিস্ফারিত, যেন অলৌকিক কোনও কিছুর প্রত্যাশা করছিল শেষনিঃশ্বাসের আগ পর্যন্ত। বাঁ হাতটা আঁকড়ে ধরে আছে মইয়ের একটা ধাপ। নিষ্প্রাণ ঝুলছে ডান হাত।

'তুমি থাকো এখানে,' সোহানাকে বলল রানা, 'আমি নীচে গিয়ে দেখে আসি।'

রানার চোখে চোখ রাখল সোহানা, চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। 'তোমাকে আগেও বলেছি, আমি খুকি নই।'

কিছু বলল না রানা, কাঁধ ঝাঁকিয়ে পা রাখল মইয়ের প্রথম ধাপে। নামছে। ওর পিছন পিছন আসছে সোহানা।

সাবমেরিনের মেঝেতে পা রেখে প্রথমেই ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালল রানা। ওটা সোহানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে মই থেকে আলগা করল লাশটাকে। আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল চিৎ করে। আবারও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ভাগ্যাহত মানুষটার দিকে। টের পেল কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। অমূলক কিছু ভাবনা আপনাথেকেই ডালপালা ছড়াতে চাইছে মনের ভিতর।

মাথা ঝাঁকাল রানা। ফালতু চিন্তাগুলো ঝেড়ে ফেলতে চায়। সোহানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'লাইট।'

ফ্ল্যাশলাইটটা রানার হাতে দিল সোহানা।

এদিকে-সেদিকে আলো ফেলছে রানা। সাবমেরিনের ভিতরে আগেও ঢুকেছে ও। কিন্তু এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের, হয়তো সে-কারণে অন্যরকম একটা অনুভূতি কাজ করছে। মইয়ের কাছে খেলা করছে দিনের আলো। লাশের পেট থেকে হাঁটু পর্যন্ত সে-আলোয় আলোকিত। ভিতরের বাকি জায়গায় গাঢ় অন্ধকার। ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বল আলো বার বার চিরে দিচ্ছে এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত বারো গজের দূরত্বটা। দু'পাশের দেয়াল অপ্রশস্ত, রানার মনে হচ্ছে হাত বাড়ালেই বুঝি ছুঁতে পারবে। মনে হচ্ছে সাবমেরিন না, সরু কোনও ডানজনের ভিতরে এসে ঢুকেছে সোহানাকে নিয়ে।

বাল্কহেডের উপর আলো ফেলল রানা। সাদা রঙ করা হয়েছিল এককালে, এখন ধূসর হয়ে গেছে। ওখানে জড়াজড়ি করে আছে একগাদা তার আর পাইপ।

'কী বুঝলে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'এখন পর্যন্ত কিছু না,' বলে লাশটার দিকে দু'পা এগিয়ে গেল রানা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। লাশের জাম্পস্যুটের পকেট

হাতড়াচ্ছে। ব্রেস্টপকেট ছাড়া বাকিগুলো খালি। ওই পকেট থেকে একটা ওয়ালেট পাওয়া গেল। জিনিসটা সোহানার হাতে দিল রানা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

এখানে মেইন ব্যাটারিটা রাখা আছে। ওটার পিছনে একজোড়া ট্রিম ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক। সঙ্গে অপারেটরের সীট আর কন্ট্রোল প্যানেল। আলো ফেলে ফেলে ওগুলো দেখছে রানা। স্টিয়ারিং, নেভিগেশন, স্পিড, পাওয়ার, ট্রিমিং—বলতে গেলে কিছুই বাদ রাখেনি জার্মানরা। কোনও শত্রুযানের উপস্থিতি টের পাওয়ার জন্য হাইড্রোফোনও আছে।

অপারেটরের সীটের নীচে দেখা যাচ্ছে একটা ছোট টুলবক্স। হাত বাড়িয়ে বাক্সটা নিল রানা। কী যেন রাখা ছিল ওটার উপর, খসে পড়ল মেঝেতে। জিনিসটার উপর আলো ফেলল রানা। একটা চামড়ার-হোলস্টার। ভিতরে একটা ল্যুগার পিস্তল। সঙ্গে স্পেয়ার ম্যাগাজিনও আছে। হোলস্টারটা ফেলে দিয়ে পিস্তল আর ম্যাগাজিনটা পকেটে ভরল রানা।

ফ্ল্যাশলাইটের আলোটা আবারও বাল্কহেডের দিকে ঘুরাল ও। প্রতিটা ট্রিম ট্যাঙ্কের নীচে দেখা যাচ্ছে একটা করে ফুট-লকার। এগুলো একধরনের কেবিনেট; সাবমেরিনের চালক সাধারণত তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখত এর ভিতরে। একটা লকার খুলল রানা। পাওয়া গেল ছ'টা জগ। সবগুলোই খালি। এক ডজন ফুডটিনও আছে। সেগুলোও খাঁ খাঁ করছে।

দ্বিতীয় ফুট-লকারটা খুলল রানা। ভিতরে দেখা যাচ্ছে একটা চামড়ার-ব্যাগ। কালো চামড়া দিয়ে বাঁধাই-করা একজোড়া জার্নালও আছে। ফ্ল্যাশলাইটটা দাঁতে কামড়ে ধরে একহাতে ব্যাগ আরেকহাতে জার্নাল দুটো নিল ও। তারপর জার্নালটা ভরল ব্যাগে। লাইটটা আবার হাতে নিয়ে এদিকে-সেদিকে আলো ফেলে দেখতে লাগল।

কিছু একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। দ্বিতীয় ফুটলকারের পিছন থেকে বের হয়ে আছে একটুকরো কাপড়। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা, আলোটা আরও কাছে নিয়ে ধরেছে।

না, ভুল মনে হয়েছিল প্রথমে। কাপড় না, আসলে ক্যানভাসের একটা বস্তা। বুনট অনেকটা ছালার-বস্তার মতো। এটার ভিতর থেকে বের হলো কব্জাওয়ালা একটা কাঠের-বাক্স। বাক্সটা খালিহাতে নিতে গেলে কষ্ট হবে, তাই বস্তাটাকেই বগলদাবা করল রানা। তারপর ফিরে এল মইয়ের কাছে।

সোহানা তখন ভ্যাপসা গরমে ঘামছে। রানার হাত থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা নিয়ে নিল ও। আলো ফেলে আপাদমস্তক দেখল রানাকে। 'কী এগুলো? গুপ্তধন?'

'হতে পারে। আবার না-ও হতে পারে। চলো বাইরে যাই। তীরে গিয়ে একে একে দেখি কী পেয়েছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মই বেয়ে উঠতে শুরু করল সোহানা।

হ্যাচ দিয়ে বাইরে বের হয়ে এসে নীচের লাশটার দিকে আরেকবার তাকাল রানা। বিড়বিড় করে বলল, 'ক্যাপ্টেন, কথা দিচ্ছি বাড়ি পৌঁছে দেবো তোমার খবর।'

সোহানা ততক্ষণে একটা লাইন ধরে সাবধানে হাঁটছে সাবমেরিনের পিঠের উপর, এগিয়ে যাচ্ছে তীরের দিকে। ও জায়গামতো পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর "গুপ্তধনগুলো" একে একে ছুঁড়ে দিল ওর দিকে। সবগুলো ঠিকমতোই লুফে নিল সোহানা।

কিছুক্ষণ পর ওর পাশে এসে দাঁড়াল রানা।

'প্রথমে কোন্‌টা খুলবে?' তর সইছে না সোহানার। ক্যানভাসের বস্তাটা তুলে ধরল একহাতে। 'এসো, এটাই খুলি। তুমি যখন ছুঁড়ে মেরেছিলে, লুফে নেয়ার সময় শুনলাম ভিতরে ঝনঝন করে উঠল কী যেন। কাঁচের কোনও কিছু হবে সম্ভবত।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল রানা।

বস্তাটা খুলল সোহানা। ভিতর থেকে বের করল কাঠের বাক্সটা। এটাতে ডালা আছে, কব্জা দিয়ে আটকানো আছে ওটা। কোনও কিছু লেখা নেই বাক্সের গায়ে। কোনও চিহ্নও নেই।

পিতলের হুক দেখা যাচ্ছে। ওটা খুলে ডালা তুলল সোহানা। ভিতরে কয়েক তা মোটা অয়েলস্কিন কাগজ। ওগুলো সরাল ও। সঙ্গে সঙ্গে ধক্ করে উঠল ওর বুকের ভিতরে।

টানা দশ সেকেণ্ড হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সোহানা খোলা বাক্সটার দিকে। তারপর কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো তাকাল রানার দিকে। নিচু গলায় বলল, 'এটা...এটা...কীভাবে সম্ভব?'

জবাব দিল না রানা। বাক্সের ভিতরে দেখা যাচ্ছে সবুজ রঙের একটা অবতল মদের-বোতল, ঝুঁকে তুলে নিল ওটা।

বোতলের ঠিক মাঝখানে পরিচিত একটা ছবি। অথবা কোনও প্রতীক।

বিচিত্র নকশাওয়ালা ডানা মেলে উড়ছে একটা মৌমাছি।

দশ

ভিক্সবার্গ হিল।

যেখান থেকে পাওয়ার বোট ভাড়া নিয়েছে সেখানে তিন "কমরেড"কে নিয়ে বসে আছে নিয়াযভ। মালিক তার প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়েছে "জেসন'স বেইট অ্যাণ্ড বোট"। স্থানীয়রা বলে এখান থেকেই মেরিল্যাণ্ড সোয়াম্পের শুরু। কিন্তু যারা জলাভূমির

আরেকদিকে থাকে তাদের দাবি, জেসনের বাড়িটা সোয়াম্পের একেবারে শেষমাথায়।

নিস্তরঙ্গ জলাভূমিতে যেন সীমানা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেসনের "বেইট অ্যাণ্ড বোট"। পানির কিছু উপরে ঘাসে-ছাওয়া খয়েরি মাটি। গেল শীতের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে কেমন ধূসর হয়ে গেছে ঘাসগুলো। সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা কয়েকটা ন্যাড়া গাছ মনে করিয়ে দিচ্ছে এখনও পুরোদমে শুরু হয়নি বসন্ত। পানিতে ভাসছে নিঃসঙ্গ জেটি, সঙ্গে পুরু কাঠের পাটাতন। তক্তাটার শেষ প্রান্ত নুয়ে পড়েছে রেলিং-দেয়া কাঠের-সিঁড়ির শেষ ধাপে।

এরপর পিচ-ঢালা রাস্তা। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে ভেঙেচুরে গেছে রাস্তাটা। এ-পাড়ে জেসনের একতলা বাড়ি। ছাদ টালি-করা, চিমনি পাথরের। বাড়ির বাইরে বাগানের মতো কিছু করার চেষ্টা করেছিল জেসন এককালে। এখন অযত্নে-অবহেলায় প্রায় জঙ্গল। এখানে বিক্ষিপ্তভাবে ছ'-সাতটা চেয়ার পাতা। ওগুলোকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে দুটো ছাতা, কালের ছোবলে জায়গায় জায়গায় ফুটো হয়ে গিয়েও রোদ ঠেকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

একটা ছাতার নীচে চারটে চেয়ার দখল করে বসে আছে নিয়াযভ আর ওর তিন সঙ্গী। জলাভূমিতে "টহল" শেষ করে কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসেছে ওরা।

নিয়াযভ বলল, 'কপোত-কপোতী কোথায় উধাও হলো বুঝতে পারলাম না।'

ফ্যাসফ্যাসে গলার বরিসভ বলল, 'আমার মনে হয় কোথাও উধাও হয়নি। ওই সোয়াম্পেই আছে। ওদের কাছ দিয়েই গেছি আমরা, কিন্তু ঠিক কোথায় আছে বুঝতে পারিনি।'

'আমরা এখন কী করবো, বস্?' জিজ্ঞেস করল আরেকজন।

পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স আর লাইটার বের করল নিয়াযভ। সিগারেট ধরিয়ে হেলান দিল গার্ডেন চেয়ারে। মাথার উপরের নোংরা ছাতাটার দিকে তাকিয়ে একটানা ধোঁয়া গিলল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ পিঠ সোজা করে তাকাল সঙ্গীদের দিকে। বলল, 'কপোত-কপোতী আর যা-ই হোক সহজ প্রতিপক্ষ না।'

মাথা ঝাঁকাল বরিসভ। 'মানলাম। সহজ হলে আপনার কাছ থেকে রে হোগানকে ছিনিয়ে নিতে পারত না।'

'কাজেই এখন ওদের জন্য ফাঁদ পাততে হবে আমাদেরকে,' আধ-খাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নিয়াযভ, কেন যেন স্বাদ পাচ্ছে না। 'এমন ফাঁদ, যেখানে ওদের ধরা পড়তেই হবে।'

'যেমন?' সরু চোখে তাকিয়ে আছে বরিসভ।

'আমরা চারজন। দুটো দলে ভাগ হয়ে যেতে হবে আমাদেরকে। পেত্রোভকে সঙ্গে রাখছি আমি। বরিসভ, তোমার সঙ্গে থাকবে গ্রিগোরিয়েভ।'

'কোথায় যাবো আমরা? আপনারাই বা যাচ্ছেন কোন্ জায়গায়?' জানতে চাইল বরিসভ।

'মোটরবোট নিয়ে আবার সোয়াম্পে যাবে তুমি আর গ্রিগোরিয়েভ। তন্নতন্ন করে খুঁজবে। কোনও ইঞ্জিনবোটের আওয়াজ পাওয়ামাত্র পিছু নেবে। সবচেয়ে ভালো হতো রানা-সোহানা যেখানে আছে তার কাছাকাছি কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকতে পারলে। তা হলে ওরা বের হওয়ামাত্র টুঁটি চেপে ধরা যেত।'

'কিন্তু ওরা কোথায় আছে জানবো কীভাবে?'

'সোয়াম্পে যারা মাছ ধরছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। মনে হয় না কেউ কিছু বলতে পারবে, তারপরও রুটিন চেক আর কী। কপাল ভালো হলে গুরুত্বপূর্ণ কোনও ইনফর্মেশন পেয়েও যেতে পারো।'

'আর আপনি, বস্? আপনি কী করবেন?'

'পেত্রোভকে নিয়ে আমি যাবো ওরা যে-হোটেলে আছে সেখানে। সুবিধাজনক কোনও জায়গায় ঘাপটি মেরে থাকবো। যদি তোমাদের কবল থেকে কোনওভাবে বেঁচে যায়ও ওরা, আমাদের খপ্পরে পড়বেই। কারণ কল্পনাও করতে পারবে না, আমরা দু'জন ওঁৎ পেতে থাকতে পারি ওদের জন্য।'

'যদি আসলেই সোয়াম্পে পেয়ে যাই কপোত-কপোতীকে তা হলে কী করবো?' জিজ্ঞেস করল বরিসভ।

'পাকড়াও করার চেষ্টা করবে। ছোট্ট একটা ইনফর্মেশন জানা দরকার, তাই ওই দু'জনকে ধরতে হবে। এর বেশি কিছু না। আমাদের হাতে সময় কম, কাজেই সবাইকে মনে রাখতে হবে, ওদের কেউ গুরুতর আহত হলে কিন্তু মুশকিলে পড়ে যাবো। আবারও বলছি, শুধু ধরবে, দরকার হলে দু'-চারটে চড়-থাপড় দেবে। কিন্তু তার বেশি কিছু না।'

'আর কিছু, বস্?' উঠে দাঁড়িয়েছে বরিসভ।

'হ্যাঁ। কাল রাতে আমাকে একা পেয়েছিল দু'জনে। শুইয়ে দিয়েছে। ওরা, আসলে পুরুষ লোকটা মারতে জানে। এবং মারতে পারে। কাজেই হালকাভাবে নিয়ো না ওদেরকে।'

'কিন্তু বস্ একটা কথা,' চলে যেতে গিয়েও গেল না বরিসভ। 'ওরা যদি পিস্তল-রিভলভার কিছু বের করে তা হলে কী করবো?'

দাঁত বের করে হাসার ভঙ্গি করল নিয়াযভ। 'আগ্নেয়াস্ত্র নেই ওদের কাছে।'

'আপনি শিওর?'

'এক শ' ভাগ।'

'এবার?' বাকরহিত রানাকে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

বোতলটা বাক্সে ভরল রানা। অয়েলস্কিন কাগজ দিয়ে যেভাবে

ঢেকে রাখা ছিল সেভাবে রাখল। বন্ধ করল ডালা। বাক্সটা ঢুকাল বস্তার ভিতরে। বলল, 'সাবমেরিনটা যেখানে যেভাবে আছে সেখানেই থাক। চলো ফিরে যাই আমরা।'

'কোথায়?'

'হোটেলে।'

'এই ব্যাগ আর বস্তা নিয়ে যাবো নিশ্চয়ই?'

'নিশ্চয়ই। এত কষ্ট করে "গুপ্তধন" উদ্ধার করলাম, এগুলো কি ফেলে রেখে যেতে পারি?'

'কিন্তু রানা, আমার কিছু প্রশ্ন আছে। দুটো বোতলের গায়ে একই ছবি, তারমানে কোনও-না-কোনও যোগাযোগ আছে ওগুলোর মধ্যে। কী সেটা? এই উড়ন্ত মৌমাছির মানেই বা কী? আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে বোতল দুটো সাবমেরিনের ভিতরেই ছিল, তা হলে আলাদা হলো কী করে? আর সবচেয়ে বড় কথা, মৌমাছির ছবিওয়ালা মামুলি বোতলের জন্য হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে কারা এবং কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এই প্রসঙ্গে আলোচনা করলে শুধু শুধু সময় নষ্ট হবে। বোতলগুলোর ব্যাপারে এখনও কিছু জানি না আমরা। বুঝতে পারছি অনেক তথ্য যোগাড় করতে হবে।' মুচকি হাসল। 'এবার মনের মতো একটা কাজ পাবে অপি।'

হাসল সোহানাও। এগিয়ে গেল ওদের ডাফল ব্যাগগুলোর দিকে। রানাও এসেছে। দু'জনে মিলে জিনিসগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে।

কাজ করতে করতে বলল রানা, 'আমার একটা অনুমানের কথা বলতে পারি তোমাকে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সোহানা, চেহারার উপর নেমে-আসা চুল সরাল ফুঁ দিয়ে।

'আমার মনে হয় কাটামুখ আসলে এই বোতলের পেছনে লাগেনি। বোতলটা কোত্থেকে এসেছে জানতে চাচ্ছিল হোগানের

কাছ থেকে, তারমানে হয়তো ওর টার্গেট ছিল সাবমেরিনটা খুঁজে বের করা।'

'কিন্তু সাবমেরিনের ভিতরে তেমন দামি কোনও কিছুই তো দেখলাম না।'

'হয়তো দেখেছি, কিন্তু আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। আসলে এ-বিষয়ে পড়াশোনা না করে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যাবে না, সোহানা।'

সোহানার কাজ শেষ। নিজের ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিয়ে তাকাল রানার দিকে। 'এবার কি ফিরছি আমরা? খিদে পেয়েছে আমার।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'চলো মোটর বোটটা নামাই পানিতে। আগেরবারের মতো কষ্ট করতে হবে না। কারণ এবার টেনে তুলবো না, ঠেলে নামাবো।'

হতাশ দৃষ্টিতে সামনের বিস্তীর্ণ জলাভূমির দিকে তাকিয়ে আছে গ্রিগোরিয়েভ। দ্রুত বর্ধণক্ষম শ্যাওলা আর একজাতের লক্ষ লক্ষ ছোট পাতার কারণে কেমন সবুজ হয়ে আছে সোয়াম্পের পানি। কোথাও কোথাও ভাসছে গাছের ভাঙা ডাল অথবা মরা কাণ্ড। ভাসতে ভাসতে কোথাও হয়তো পাওয়া গেছে একটুখানি মাটি, আর সেখানেই গজিয়েছে আগাছার ঝোপ। যেখানে একফালি জমিন আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে বড় গাছের জঙ্গল। কোথাও কোথাও শত ডালপালাযুক্ত বিশালাকারের গাছ জলপথের দু'ধারে জন্মে আছে, একটার ডাল জড়াজড়ি করে আছে আরেকটার ডালের সঙ্গে, ফলে মাথার উপর তৈরি হয়েছে পাতার প্রাকৃতিক চাদর। কোনও কোনও আগাছার আড়ালে-আবডালে পাখিদের হুটোপুটি। কোনও কোনও ভাঙা ডালের সঙ্গে জড়াজড়ি করে আছে কালচে সবুজ সাপ। ওগুলোর কোন্‌টা কতখানি বিষধর তা

ভাবতেও চাচ্ছে না গ্রিগোরিয়েভ।

ওকে ডেকে আনার জন্য মনে মনে দুষছে এখন সে নিয়াযভকে। লোকটাকে পছন্দ করে না গ্রিগোরিয়েভ। কারণ তিনটা। এক, সবার মাথার উপর ছড়ি ঘোরাতে চায় লোকটা। দুই, মাত্রা ছাড়া আত্মবিশ্বাস আছে তার। তিন, কখনও নিজের ভুল স্বীকার করে না, অথচ অন্য কেউ ভুল করলে এমন হম্বিতম্বি শুরু করে যে, দেখলে মনে হয় লেজে আগুন ধরে গেছে।

মাসুদ রানা নামের লোকটাকে ধরার জন্য একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠেছে সে। কারণ অনেক বছর পর গত রাতেই প্রথম বেদম পিটুনি খেয়েছে সে লোকটার হাতে। মার খেয়ে মগজের কিছু কোষ সম্ভবত অকার্যকর হয়ে গেছে, তাই ঠিক না বেঠিক যাচাই না করেই বরিসভ আর গ্রিগোরিয়েভকে পাঠিয়ে দিয়েছে জলাভূমিতে।

পাগল ছাড়া আর কেউ করবে এই কাজ, ভাবতে ভাবতে হাতেধরা লাঠি দিয়ে কাছের এক ঝোপে অকারণে বাড়ি মারল গ্রিগোরিয়েভ, ভয়ে চিৎকার করতে করতে হঠাৎ উড়াল দিল তিন-চারটে খয়েরী পাখি। কর্কশ আওয়াজ কানে লাগায় বিরক্তির দৃষ্টিতে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল গ্রিগোরিয়েভ।

হোটেলের ধারেকাছে বসে থাকলেই কিন্তু হতো। রানা লোকটা তার সঙ্গিনীকে নিয়ে ফিরতই কোনও-না-কোনও সময়, তখন ধরা যেত ওদেরকে। কিন্তু এই সহজ বুদ্ধিটা কেন এল না নিয়াযভের মাথায়, জানে না গ্রিগোরিয়েভ। ওর ইচ্ছা করছিল একবার বলে কথাটা, কিন্তু ইচ্ছা করে চেপে গেছে। যাদেরকে নিজের অধস্তন ভাবে নিয়াযভ, তাদের কেউ ওকে কোনও পরামর্শ দিলে সাংঘাতিক খেপে যায় লোকটা। যেমন গিয়েছিল গতবার।

ওই কাজটাও সহজ ছিল না। এক জনদরদী উঠতি নেতা নিয়াযভ অথবা সে যার নুন খায় তার মাথাব্যথার কারণ হয়ে

দাঁড়িয়েছিল, কাজেই ওই নেতার হাতে পরপারের টিকিট ধরিয়ে দেয়াটা জরুরি হয়ে পড়েছিল। গ্রিগোরিয়েভ দক্ষ হিটম্যান, দূরপাল্লার রাইফেলে ওর কাজে খুঁত ধরতে পারে না কেউ। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় অন্য জায়গায়। নিজের কাজ নিজে করতে পছন্দ করে গ্রিগোরিয়েভ, কোথায় কখন কীভাবে কাজ সারবে সে-ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে চায়। কিন্তু বাগড়া দেয় নিয়াযভ। বরাবরের মতো "সম্মানীর" ফিফটি পার্সেন্ট হাতে ধরিয়ে দেয়ার সময় দেদারসে উপদেশ ঢোকাতে শুরু করে গ্রিগোরিয়েভের মগজে। কিন্তু অত কথা শোনার মতো ধৈর্য ছিল না ওর। কাজেই এক কথায়-দু'কথায় ঝগড়া লেগে যায় নিয়াযভের সঙ্গে। কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে ওর গালে সজোরে চড় মেরে বসে নিয়াযভ। তাও আবার বরিসভের সামনে।

ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে বরিসভের দিকে তাকাল গ্রিগোরিয়েভ। দক্ষ হাতে পাওয়ার বোটের হুইল ধরে আছে লোকটা, যথেষ্ট দ্রুত গতিতে ছুটতে সক্ষম হলেও ধীর গতিতে চালাচ্ছে বোটটাকে, সতর্ক দৃষ্টিতে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে বার বার। তবে কোন্‌দিকে দেখছে তা ঠাহর করা যাচ্ছে না সানগ্লাসের কারণে। কখনও কখনও ব্যবহার করছে বিনকিউলার।

'মেজাজ খারাপ মনে হচ্ছে?' গ্রিগোরিয়েভকে তাকাতে দেখে জিজ্ঞেস করল বরিসভ।

'খারাপ হবে না?' মুখ বাঁকাল গ্রিগোরিয়েভ। 'আমাকে দিয়ে ধরে আনার কাজ হয়, বলো? তা-ও আবার এই বনেজঙ্গলে? একটা রাইফেল দাও, উঁচু কোনও বিল্ডিং-এর ছাদে গিয়ে চড়ি, যাকে খতম করতে হবে তাকে পরপারে পাঠাতে দশ সেকেণ্ডের বেশি যদি লাগে তা হলে আমার নামে কুত্তা পুষতে পারো। কিন্তু এসব কী? সাপখোপের আস্তানায় সেই সকাল থেকে ছুটে মরছি অচেনা এক লোক আর তার সঙ্গিনীকে পাকড়াও করার জন্য।

আবার দেখো কী ইচ্ছা আমাদের কর্তা সাহেবের—সঙ্গে পিস্তল-বন্দুক রাখা যাবে না। ওরা যদি আগ্নেয়াস্ত্র বের করে তা হলে আমরা কি দু'হাত উপরে তুলে ধেই ধেই করে নাচবো?'

'মিস্টার নিয়াযভ তো গ্যারান্টি দিয়েছেন আগ্নেয়াস্ত্র নেই রানা-সোহানার কাছে।'

ভেংচি কাটল গ্রিগোরিয়েভ। 'ওদের নাড়িনক্ষত্রের খবর এতই যদি রাখো তা হলে কাল রাতে ওভাবে মার খেলে কেন, বাছা?'

নিঃশব্দে হাসল বরিসভ। পাতলা কোট সরিয়ে বগলের কাছটা দেখাল। শোল্ডার হোলস্টারে শোভা পাচ্ছে একটা পয়েণ্ট থ্রি ফাইভ সেভেন ম্যাগনাম।

চেহারা কালো হয়ে গেল গ্রিগোরিয়েভের। 'এর মানে কী? তোমাকে অনুমতি দিল অথচ আমাকে...'

'কে বলেছে অনুমতি দিয়েছে আমাকে? মিস্টার নিয়াযভকে কিছু না বলেই নিয়ে এসেছি। তাঁকে এত কথা জানানোর দরকার কী? যে-কাজ করি আমরা, তাতে নিজেদের পিঠ নিজেরা না বাঁচালে আরেকজন এসে বাঁচিয়ে দেবে না নিশ্চয়ই? চিন্তা কোরো না। আমার আরেক শোল্ডার হোলস্টারে আরেকটা ম্যাগনাম আছে। দরকার লাগলে তোমাকে দেবো ওটা।'

খুশি হলো গ্রিগোরিয়েভ কিন্তু তা প্রকাশ পেতে দিল না চেহারায়। বিনকিউলারটা নামিয়ে রেখেছিল বরিসভ, কী মনে হতে ওটা টেনে নিল। দূরে একটা খাঁড়ি দেখা যাচ্ছে, জলজ উদ্ভিদ আর আগাছার কারণে প্রায় অদৃশ্য হয়ে আছে প্রবেশমুখ, বিনকিউলার চোখে তুলে তাকাল সেদিকে। সঙ্গে সঙ্গে ওর শরীরটা ঝাঁকি খেল, যেন হালকা একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে।

রোদেপোড়া চামড়ার লম্বা বলিষ্ঠ এক লোককে দেখা যাচ্ছে সেই খাঁড়িমুখের কাছে। ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে ঠেলে একটা

মোটর বোট পানিতে নামাচ্ছে সে। ওকে সাহায্য করছে অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী। কাজ করতে করতে কথা বলছে দু'জনে, এত দূর থেকে শোনা না গেলেও বোঝা যায় খুনসুটি চলছে। বিশেষ করে মেয়েটা একটু পর পর হেসে কুটিপাটি হচ্ছে। মোটর বোটটা বারো-চোদ্দ ফুট লম্বা এবং মালিক যে-রকম বর্ণনা দিয়েছিল নিয়াযভের কাছে হুবহু সে-রকম।

মুখ গোল করে মৃদু শিস বাজাল গ্রিগোরিয়েভ। চোখ থেকে বিনকিউলারটা সরিয়ে "ইউরেকা" জাতীয় দৃষ্টিতে তাকাল বরিসভের দিকে।

ওর সেই দৃষ্টির মানে বুঝতে সময় লাগল না বরিসভের। বোটের গতি আরও কমাল সে। হাত বাড়িয়ে নিল বিনকিউলারটা। যেদিকটা দেখেছে গ্রিগোরিয়েভ, তাকাল সেদিকে। টানা কয়েকটা মুহূর্ত দেখল। তারপর বিনকিউলারটা বলতে গেলে আছড়ে ফেলল বোটের মেঝেতে।

বন বন করে হুইল ঘোরাচ্ছে সে। গতিপথ বদলে যাচ্ছে পাওয়ার বোটের। একইসঙ্গে থ্রটলে চাপ বাড়াচ্ছে, বাড়ছে বোটের গতি।

হুইল ঘোরানো শেষ হওয়ামাত্র আরেকটা কাজ করল বরিসভ। বাঁ দিকের শোল্ডার হোলস্টার থেকে অভ্যস্ত হাতে একটা লোডেড ম্যাগনাম বের করে বাড়িয়ে ধরল গ্রিগোরিয়েভের দিকে।

কৃতজ্ঞচিত্তে অস্ত্রটা নিল গ্রিগোরিয়েভ, খুশিতে সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে গেছে।

মোটরবোটের পুরোটা তখনও নামেনি পানিতে। আধ মাইলের কিছু বেশি দূরে-থাকা পাওয়ার বোটটা রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দুপুরের রোদ লেগে ঝিক্ করে উঠেছে কিছু একটা। না, পাওয়ার বোটের উইণ্ডস্ক্রীন না। বিনকিউলার, অনুমান করল রানা। খেয়াল

করল, তেড়েফুঁড়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে বোটটা। হুইল ধরে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটা খালিহাতের নির্দেশনায় সমানে কী যেন বলছে একমাত্র সঙ্গীকে। দ্বিতীয় লোকটা যেন খেপে উঠেছে হঠাৎ। আগাছা, ভাসন্ত মরা কাণ্ড, নলখাগড়া—এগিয়ে আসার পথে সামনে যা পড়ছে হাতের লাঠি দিয়ে ধাক্কা মেরে সরাচ্ছে। বোঝা গেল প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকগুলোর কারণে ফুল স্পিড তুলতে পারছে না বোটটা।

তাড়াহুড়ো করার তাগিদ জাগল রানার ভিতরে। সোহানা ইতোমধ্যেই উঠে গেছে বোটে, এবার লাফিয়ে উঠে বসল ও। ইঞ্জিনের স্টার্টার কর্ডের দিকে হাত বাড়িয়েছিল সোহানা, ওকে বাধা দিয়ে বলল, 'তুমি সরে বসো। আমি চালাবো।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল সোহানা।

চোখের ইশারায় দূরের পাওয়ার বোটটা দেখিয়ে দিল রানা। 'চিনতে পারছ?'

একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখল সোহানা। তারপর মাথা নাড়ল।

'সকালে তাহলে শুধু কাটামুখকেই দেখেছিলে?' দু'-তিনবার টানার পর চালু হলো পুরনো ইঞ্জিন, ঝাঁকুনিটা সামলে নিয়ে থ্রটলে চাপ বাড়াচ্ছে রানা আস্তে আস্তে, একইসঙ্গে হাল ঘুরিয়ে নিচ্ছে। 'ওর বোটটা দেখোনি?'

ঝট্ করে ঘাড় ঘুরিয়ে আবারও পাওয়ার বোটটা দেখল সোহানা। তারপর তাকাল রানার দিকে। 'তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ ধরা পড়ে গেছি আমরা?'

'ধরা পড়ে গেছি, তা বলছি না। বলছি, ওরা দেখে ফেলেছে আমাদেরকে। এবং এখন ধরার জন্য পিছু ধাওয়া করছে।'

আবারও পিছনে তাকাল সোহানা। 'তোমার ভুল হচ্ছে না তো, রানা? এতদূর থেকে ঠিক চিনতে পেরেছ বোটটা? তা ছাড়া সকালে ওরা ছিল চারজন, এখন মাত্র দু'জনকে দেখা যাচ্ছে।'

'না, চিনতে ভুল হয়নি আমার।' থ্রটলে চাপ বাড়াচ্ছে রানা। জানে ধীরেসুস্থে করতে হবে কাজটা, কারণ পুরনো ইঞ্জিনের কাছ থেকে পূর্ণ গতি আদায় করতে হলে সময় দিতে হবে ওটাকে। 'আর চারজনের জায়গায় দু'জন কোনও ব্যাপার না। অন্য দু'জন হয়তো আমাদের হোটেল কামরায় বসে পেপসি খাচ্ছে।'

'ওরা তো...মনে হয় ধরে ফেলবে আমাদেরকে, রানা।'

'সে-সম্ভাবনাই বেশি। আমাদেরটা মোটর বোট। ইঞ্জিন কম শক্তিশালী, তা-ও আবার পুরনো। আর ওদেরটা পাওয়ার বোট। তৈরিই করা হয়েছে দ্রুত ছোটার জন্য। ইঞ্জিনও শক্তিশালী, বডিও অনেক মজবুত। তবে আপাতত একটা প্লাস পয়েন্ট আছে আমাদের।'

'কী?'

'পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখো এখন যে-জায়গায় আছে ওরা সেখান থেকে এ পর্যন্ত সিকি মাইল আগাছা আর নলখাগড়ার ছড়াছড়ি। ওগুলো সরিয়ে এগিয়ে আসতে সময় লাগবে ওদের। ততক্ষণে আশা করছি ফুল স্পিড তুলতে পারবো, দূরত্ব বাড়াতে পারবো।'

'ওদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকতে পারে, রানা।'

জবাবে শুধু মাথা ঝাঁকাল রানা, কিছু বলল না। মনোযোগ দিল সামনের দিকে। সবকিছুর আগে বোটের ফুল স্পিড তুলতে চাচ্ছে। একইসঙ্গে চিন্তার ঝড় বইছে ওর মাথায়।

ওদেরকে খুঁজে পেল কী করে রাশান লোকগুলো? সকালে এসেছিল, তারপর চলেও গেছে, নিজচোখে দেখেছে রানা। তারমানে চারজনের দলটা নিঃসন্দেহে ভাগ হয়ে গেছে দু'ভাগে। পাওয়ার বোটটা নিয়ে দু'জন ফিরে এসেছে জলাভূমিতে, বাকি দু'জন আছে অন্য কোথাও। প্রশ্ন হচ্ছে, কোথায়?

পাওয়ার বোটের আরোহীদেরকে দ্বিতীয়বার দেখার জন্য

তেমন কোনও তাগিদ অনুভব করছে না রানা এখনও, জানে যথেষ্ট দূরে আছে ওরা। ওদের ভারী ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজ পেলেই বুঝতে পারবে কতটা কাছে এসে পড়েছে। কাটামুখ কি আছে ওই দু'জনের মধ্যে?

'সোহানা,' থ্রটলে চাপ আরও একটু বাড়িয়ে ডাকল রানা, 'বিনকিউলার দিয়ে দেখো তো ওই দু'জনের একজন কাটামুখ কি না।'

দেখল সোহানা। তারপর বলল, 'না।'

'ভালো।'

দু'-তিনবার যাতায়াত করেই জলাভূমিটা মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে রানার। এখন যে-দিকে এগোচ্ছে, সে-পথের কোথায় আগাছা, নলখাগড়া আর মরা কাণ্ড জড়াজড়ি করে আছে জানা আছে ওর। সেদিকে যেতে চায় না। আসলে ও চাচ্ছে মোটামুটি বাধাহীনভাবে এগোতে এবং কোনও খাঁড়িমুখের কাছ দিয়ে যেতে। জানে পুরনো ইঞ্জিনের এই মোটর বোট নিয়ে শত্রুর পাওয়ার বোটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পালাতে পারবে না। কাজেই ধরা পড়তে না চাইলে ঝুঁকি নিতে হবে ওকে এবং ধোঁকা দিতে হবে।

কী ইন্সট্রাকশন আছে পিছনের লোকগুলোর উপর? ওরা কি রানা-সোহানাকে খুন করতে এসেছে? না, ধরতে? কাটামুখ আসলে লেগেছিল রে হোগানের পিছনে, একটা ইনফর্মেশনের জন্য। এখন রানা-সোহানাকে পাকড়াও করতে চাচ্ছে সে, হয়তো ভেবেছে কাজটা করতে পারলে হোগানের সন্ধান পাবে অথবা হোগান যদি কিছু বলে থাকে রানা-সোহানাকে তা হলে সে-তথ্য আদায় করতে পারবে।

পঁচিশ-ত্রিশ ফুট দূরে পানি ফুঁড়ে হঠাৎ মাথা তুলেছে ছোট্ট একটা চর, তাতে নলখাগড়ার জঙ্গল। হালটা প্রায় পঁয়তাল্লিশ

ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরাল রানা, কোনও মায়া দেখাল না ইঞ্জিনের ওপর। বিনা নোটিশে কাজটা করায় একদিকে কাত হয়ে গেল সোহানা, বিনকিউলারটা ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে খামচে ধরল বোটের এক প্রান্ত। চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে "চরটাকে" পাশ কাটাচ্ছে রানা।

হঠাৎ আওয়াজ বেড়ে গেছে ইঞ্জিনের, তীব্র গোঁ গোঁ শব্দে কানে তালা লাগার যোগাড়। সে-আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল সোহানার উদ্বিগ্ন কণ্ঠ, 'রানা, ফুল স্পিড পেয়ে গেছে ওদের বোট। আগাছা আর নলখাগড়া পার হয়ে এসেছে।'

এবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা।

পাওয়ার বোটের যদি কথা বলার ক্ষমতা থাকত, রানাদের মোটর বোটটাকে উদ্দেশ্য করে সম্ভবত বলত: দেখ্ আমি কী জিনিস! মাত্র পনেরো-বিশ সেকেণ্ডেই টপ স্পিড পেয়ে গেছে। প্রচণ্ড গতির কারণে পানি দু'ভাগে ভাগ হয়ে সাদা রেখা তুলে বেরিয়ে যাচ্ছে বোটটার দু'দিক দিয়ে। উইণ্ডস্ক্রীনে পূর্ণ গতিতে চলছে ওয়াইপার, পানির ছিটা পরিষ্কার করে কাঁচ স্বচ্ছ রাখছে চালকের সুবিধার জন্য। ছিটাগুলো এত উপর পর্যন্ত উঠছে যে, চালকের সঙ্গী বলতে গেলে অদৃশ্যই হয়ে গেছে।

এদিক-ওদিক তাকাল রানা। ডানে-বাঁয়ে বেশ কিছু খাঁড়িমুখ দেখা যাচ্ছে। ইচ্ছা করলে ওগুলোর যে-কোনওটাতে ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু চিন্তাটা বাতিল করে দিল ও। এখানকার কোন্ খাঁড়ি কতটা প্রশস্ত, জলপথ কিছুদূর এগিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে কি না জানা নেই ওর। এগোতে গিয়ে ওরা আটকা পড়লে খুশিতে হাততালি দেবে পেছনের লোকগুলো।

'রানা,' চিৎকার করে উঠল সোহানা হঠাৎ, 'অনেক কাছে এসে গেছে ওরা। পিছনের লোকটা কী যেন করছে।'

সোহানার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, কড়াৎ করে একটা শব্দ

হলো পেছন থেকে।

গুলি করেছে পাওয়ার বোটের চালকের সঙ্গী। তবে ফাঁকা, আসলে ভয় দেখাতে চাচ্ছে রানা-সোহানাকে।

পনেরো-বিশ ফুট দূরে আবারও একটা চর। স্পিড একটুও না কমিয়ে আগেরবারের মতো আবারও হাল ঘুরিয়ে দিল রানা হঠাৎ, গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে নাক ঘুরে গেল মোটর বোটের। তবে এবার খোলাপানিতে থাকার চেয়ে চরের মাটি ঘেঁষে যাওয়ার প্রতি রানার আগ্রহ বেশি মনে হচ্ছে। এই চর আগেরটার চেয়ে অনেক চওড়া হলেও এখানকার নলখাগড়ার জঙ্গল তেমন একটা ঘন না।

চরটাকে প্রায় ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল বোটের নাক। কিন্তু খোলাপানির দিকে না গিয়ে বরং স্পিড কমাল রানা। আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে তাকাল সোহানা। কিন্তু তাকিয়ে থাকতে পারল না বেশিক্ষণ। হাল ধরে আবারও মোচড় দিয়েছে রানা। তাল সামলাতে আরও একবার নৌকার একটা প্রান্ত আঁকড়ে ধরতে হলো সোহানাকে।

'কী করতে চাচ্ছ, রানা?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

'জলদি এসো,' জবাব না দিয়ে জরুরি কণ্ঠে ডাকল রানা। 'হাল ধরো। এখন যে-গতিতে এগোচ্ছে বোট, আমি না বলা পর্যন্ত সেভাবেই থাকবে। চরটাকে পাশ কাটিয়ে বের হয়ে যাওয়ার সময় আবার মোচড় দেবে হালে। পুরো চরটাকে একটা চক্কর দিতে চাই আমি।'

উঠে দাঁড়াল সোহানা, কিন্তু বসে পড়তে বাধ্য হলো সঙ্গে সঙ্গে। আবার গুলি করা হয়েছে পেছন থেকে, পর পর দু'বার। এবার ফাঁকা না। মোটর বোটের ইঞ্জিন বরাবর করা হয়েছে গুলিটা। কিন্তু লাগেনি জায়গামতো। ওই জায়গার কাঠ গভীরভাবে চিরে দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট দুটো।

হাঁচড়েপাঁচড়ে আগে বাড়ল সোহানা। বুঝতে পারছে কোনও

একটা প্ল্যান আছে রানার মাথায়।

সোহানা বোটের হাল ধরামাত্র সরে গেল রানা। চরের নলখাগড়াগুলো বলতে গেলে ওর গা ছুঁয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড দুলছে বোটটা। সামলানোর জন্য একদিকের প্রান্ত আঁকড়ে ধরতে হলো রানাকে। বোটের মাঝামাঝি চলে এল ও। হাঁটু দুটোকে কোনও খাঁজের সঙ্গে আটকিয়ে পজিশন নিতে যাবে, এমন সময় আবার গুলি করা হলো পাওয়ার বোট থেকে।

অনেক কাছে এসে পড়েছে ওটা। দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে আসছে চরের দিকে, চালক হয়তো শেষমুহূর্তে পাশ কাটাতে চায়। চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে ইঞ্জিনটা দেখে নিল রানা। একটু আগের বুলেটটা চুমু দিয়ে গেছে ওটার গায়ে। অনাকাঙ্ক্ষিত ওই আদরের ফলে আরও বেড়ে গেছে ইঞ্জিনের গোঙানি। প্রচণ্ড শব্দের কারণে রানার মনে হচ্ছে কালা হয়ে যাবে।

হাতের নাগালেই পড়ে আছে ওর ডাফল ব্যাগ। হাতড়ে ওটার ভিতর থেকে রিভলভারটা বের করল রানা।

গতরাতে কাটামুখকে পিটিয়ে অস্ত্রটা নিয়ে নিয়েছিল ও। হিসেবে ভুল না হলে ভিতরে অন্তত পাঁচটা বুলেট থাকার কথা। দেখা যাক।

অস্ত্রটা তুলল রানা, নিশানা করতে সময় নিল না। পর পর চারবার গুলি করল।

এত কাছ থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় বুলেটের আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে পাওয়ার বোটের উইণ্ডস্ক্রীন। চালক কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটেছে ঘটনাটা, পানির প্রচণ্ড ছিটা চোখেমুখে লাগায় আপনাথেকে মাথা নামিয়ে নিল সে।

রানার তৃতীয় বুলেটটা একটা ফুটো তৈরি করেছে পাওয়ার বোটের তলায়। চতুর্থ গুলিটা করেছিল ও ইঞ্জিন যেখানে থাকে সেদিকে নিশানা করে, কিন্তু বোটের দুর্দান্ত গতি দেখে বুঝল লক্ষ্য

ভ্রষ্ট হয়েছে।

এরপর যা ঘটল তা হয়তো শুধু সিনেমার পর্দাতেই দেখা যায়।

গতি সামলানোর কেউ নেই, তীরবেগে ছুটে এসে পাওয়ার বোটটা বাড়ি খেল চরের ভেজা আর ক্রমশ উঁচু পাড়ের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে ওটার নাক উঠে গেল আকাশের দিকে। দেখলে যে-কেউ বলবে আকশে ওড়ার সাধ জেগেছে জলযানটার। রানা-সোহানা তখন একটা নলখাগড়ার ঝোপকে পাশ কাটাচ্ছে, শরীরের কিছুটা মাটিতে কিছুটা শূন্যে রেখে নলখাগড়া দুমড়েমুচড়ে পাওয়ার বোটটা বেরিয়ে গেল মোটর বোটের ফুট দুয়েক দূর দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরল রানা, রিভলভারের পঞ্চম ও শেষ গুলিটা করল পাওয়ার বোটের চালকের সঙ্গীকে নিশানা করে। চরের পাড়ের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষে জোরালো ঝাঁকুনিতে লোকটার ম্যাগনাম গায়েব হয়ে গেছে কোথায় যেন, কিন্তু সে আগে বোটের যে-জায়গায় ছিল সেখানেই আছে।

ওকে খুন করতে চায়নি রানা, তাই বুলেটটা লোকটার কাঁধের মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। ভয়াবহ আর্তচিৎকার ছাড়ল সে, চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরে গেছে। ঠিক সে-সময় উড়ন্ত পাওয়ার বোট আছড়ে পড়ল পানিতে, জোরে ঝাঁকুনি লাগল। কোনও কিছু আঁকড়ে ধরার সুযোগও পেল না লোকটা, বোটের একদিকের প্রান্ত দিয়ে ছিটকে পড়ে গেল।

'সোহানা!' চিৎকার করে উঠল রানা। 'ঠিক আছো?'

'আছি!' চেঁচিয়ে বলল সোহানাও।

'বাঁয়ে মোচড় কাটো! একটুও দয়া করবে না ইঞ্জিনের ওপর। চরটাকে ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আবারও মোচড় কাটবে

এবং একইসঙ্গে গতি কমাবে হঠাৎ করে। মনে রেখো পাওয়ার বোটের চালক অক্ষত আছে এখনও।'

রানার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, শোল্ডার হোলস্টারের আরেকটা ম্যাগনাম বের করে পর পর তিনবার গুলি করল বরিসভ। খুনের নেশা পেয়ে বসেছে ওকে। নিয়াযভের উপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে ওর। 'কুত্তার বাচ্চা!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে নিয়াযভকে উদ্দেশ্য করে, 'এই তোর এক শ' ভাগ নিশ্চিত হওয়া? আগ্নেয়াস্ত্র নেই রানার কাছে, না?'

বরিসভের তিনটে গুলির প্রতিটাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। ওর গুলি চালানোর স্টাইল লক্ষ করে রানা বুঝে গেছে ওকে আর সোহানাকে খুন করতে চাচ্ছে লোকটা। আরও একবার চেঁচিয়ে উঠল ও, 'সোহানা, গতি কমাও! বাঁক নাও! জলদি!'

চরের একদিকের প্রান্ত ঘেঁষে মোটামুটি মধ্যম গতিতে বের হয়ে যাচ্ছে মোটর বোটটা এমন সময় আরেক দফা আশ্চর্য হতে হলো সোহানাকে। হঠাৎ ডাইভ দিয়েছে রানা। চোখের কোণ দিয়ে রানার উড়ন্ত শরীরটা দেখতে পেল ও। আর কিছু দেখতে পেল না, বলা ভালো, দেখার সুযোগ হলো না। কারণ পাওয়ার বোটের চালক আবার গুলি করতে শুরু করায় ঝট্ করে মাথা নামিয়ে নিতে হলো।

পর পর দু'বার গুলি করল বরিসভ, দু'বারই মিস্ করল। বন্দুকবাজিতে গ্রিগোরিয়েভের মতো দক্ষ না সে, বরং আনআর্মর্ড কমব্যাটে বিশেষ পারদর্শী। কিন্তু হতচ্ছাড়া এই জলাভূমিতে সে-সুযোগ মিলল কই?

পাওয়ার বোটটা কিছুদূর গিয়ে নিজেই থেমে গেছে নাকি থামিয়ে দেয়া হয়েছে বুঝতে পারছে না রানা। কিন্তু চালক যে সুবিধাজনক অবস্থায় থেকে একের পর এক গুলি চালাচ্ছে তা টের পাওয়া যাচ্ছে। লোকটার হাত পাকা না, অন্তত এত দূরত্বে না।

ভারী ম্যাগনাম থাকার পরও পাঁচবার গুলি করে রানা-সোহানার কাউকেই ঘায়েল করতে পারেনি।

চরের একদিকের পাড়ে, ভেজা মাটিতে, নলখাগড়ার একটা ঝোপের উপর এসে পড়েছে রানা। উড়ন্ত অবস্থাতেই পকেট থেকে বের করেছে ল্যুগারটা, ইউ.এম. থার্টি ফোর মল্‌শ্‌ থেকে যেটা পেয়েছে। রিভলভারের বুলেট শেষ, কাজেই এবার ল্যুগারটাই ওর ভরসা। প্রশ্ন হচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এতগুলো বছর পর ঠিকমতো কাজ করবে কি না অস্ত্রটা। ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে হবে, ভাবল রানা।

ইচ্ছা করেই মোটর বোট থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ও। পাওয়ার বোটের চালক হয় দেখেছে ওর ডাইভ, অথবা দেখেনি। যদি দেখে থাকে তা হলে রানা যেখানে আছে সেদিকে নিশানা করে গুলি করবে। ফলে সোহানার অক্ষত বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর না দেখে থাকলে মোটর বোটটাই হবে লোকটার নিশানা। সেক্ষেত্রে ম্যাগনামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখে গুলি করার মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যাবে রানা, তা-ও আবার সুবিধাজনক পজিশনে থেকে।

সময় নিচ্ছে পাওয়ার বোটের লোকটা। ম্যাগনাম লোড করছে বোধহয়। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। মাটিতে বুক ঘষে সরে এল আরেকটু বাঁয়ে। যেখানে পড়েছিল সেখানে নলখাগড়ার আড়াল তেমন একটা ঘন না। বরং এখন যে-জায়গায় হাজির হয়েছে, পাড়ের ভেজা মাটির কাছে, সেখানে নলখাগড়া বেশ ঘন। আবার ইচ্ছা করলেই মাথা তুলে দেখে নেয়া যাচ্ছে স্থির হয়ে-থাকা পাওয়ার বোটটাকে।

লোড করা শেষ হলো লোকটার। মাথা তুলল সে। নলখাগড়ার আড়ালে আড়ালে এগিয়ে যাচ্ছে মোটর বোট, ওটাকে নিশানা করল। তার মানে রানাকে ডাইভ দিতে দেখেনি।

কোনও কারণে যদি গুলি লাগে সোহানার গায়ে...আরও একবার তাড়াহুড়ো করার তাগিদ অনুভব করল রানা। ল্যুগারটা তুলে নিশানা করেই টানতে শুরু করল ট্রিগার।

এত বছর আগের আগ্নেয়াস্ত্র, অথচ মেকানিযম একটুও এদিক-ওদিক হয়নি। রানার প্রথম গুলিতে বরিসভের ম্যাগনাম উধাও হলো, দ্বিতীয় গুলিতে চিৎকার করে উঠে কব্জি চেপে ধরল সে, তৃতীয় গুলিতে চরকির মতো পাক খেয়ে পড়ে গেল সে বোটের ভিতরে।

আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়ল রানা, লোকটাকে মারতে চায়নি। তৃতীয় বুলেটটা লোকটার বুকের বাঁ দিকে লেগেছে। সম্ভবত মরণ ছিলই বদমাশটার কপালে।

ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল রানা। ল্যুগারটা ভরল পকেটে। মুখের কাছে দু'হাত জড়ো করে চেঁচিয়ে ডাকল সোহানাকে, বোটের গতি কমিয়ে ফিরে আসতে বলল।

এগারো

জেসন'স বেইট অ্যাণ্ড বোট।

পিচ-ঢালা রাস্তাটাকে উদাস দৃষ্টিতে দেখছে সোহানা। আর চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিয়েছে রানা; দু'হাত মাথার পিছনে দিয়ে তাকিয়ে আছে মাথার উপরের ছাতাটার দিকে। মাঝেমধ্যে তাকাচ্ছে জেসনের কারখানাটার দিকে।

শুধু বোট ভাড়াই দেয় না জেসন, পুরনো বা ক্ষতিগ্রস্ত বোট

মেরামতও করে। এমনকী কেউ অর্ডার করলে চাহিদামাফিক বানিয়েও দেয়। এই এলাকায় অন্য কেউ এই ব্যবসা করে না, তাই কারখানার ব্যস্ততা দেখলে বোঝা যায় দিন ভালোই যাচ্ছে ওর।

কারখানা থেকে একটু দূরে ছোট্ট একটা কফিশপও চালু করেছে সে বুদ্ধি করে। মূলত তার শ্রমিকদের নাস্তাপানির কথা ভেবে করেছে সে কাজটা, চালানোর দায়িত্ব দিয়েছে ওর স্ত্রীর উপর। বোট ভাড়া নিয়ে সোয়াম্পে কেউ গেলে জিরানোর জন্য রাস্তার পাশে ছাতার নীচে বসেই, তখন কিছু-না-কিছু কেনে ওই কফিশপ থেকে। যেমন রানা-সোহানা নিয়েছে আগুনগরম দু'কাপ কালো কফি।

কারখানার উপর থেকে মনোযোগ সরিয়ে সোহানার দিকে তাকাল রানা। 'তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা?'

'জানি না,' মৃদু গলায় বলল সোহানা। 'আমি আসলে ঠাণ্ডা মাথায় কিছু ভাবতে পারছি না। প্রথমে ভাঙা একটা বোতল, তাতে মৌমাছির ছবি। তারপর রে হোগান। কিডন্যাপার—কুৎসিত একটা কাটামুখ। সাবমেরিন, তার ভিতরে প্রায় মমি হয়ে-যাওয়া একটা লাশ। আবারও বোতল। সবশেষে আমাদেরকে ধরার জন্য পাগলপারা দুই রাশান। যাদের সম্ভবত একজন এতক্ষণে মারা গেছে তোমার গুলি খেয়ে।'

'জান বাঁচানোর জন্য করতে হয়েছে কাজটা, সোহানা। তা না হলে আমাদের দু'জনকেই মরতে হতো।'

'আচ্ছা রানা, কী মনে হয় তোমার? ওরা কি আমাদেরকে খুন করার জন্যই গিয়েছিল?'

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ ভাবল রানা। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'মনে হয় না।'

'কেন?'

'আমাদেরকে মারার জন্য গেলে সে-রকম প্রস্তুতি নিয়েই যেত। যেমন দূরপাল্লার রাইফেল রাখত সঙ্গে। স্বীকার করছি প্রথমে ফায়ার করতে শুরু করেছিল ওরাই, কিন্তু নিশানা করে গুলি করেনি। ফাঁকা গুলি করছিল। আমাদেরকে ভয় দেখাতে চেয়েছিল। আমার মনে হয় আমি যখন গুলি করে পাওয়ার বোটের উইণ্ডস্ক্রীণ চুরমার করে দিই তখন ঘাবড়ে যায় ওরা। ইচ্ছা করলে ফিরে যেতে পারত কিন্তু তা না করে দু'জনই চড়াও হয় আমাদের ওপর। কেন, বলতে পারবো না। হয় ঘাবড়ে গেছে, অথবা তাদেরকে এমন কোনও ইনফর্মেশন দেয়া হয়েছে যা ভুল প্রমাণিত হওয়ায় প্রচণ্ড খেপে গেছে।'

'বাকি দু'জনের কী খবর? বিশেষ করে কাটামুখ, ওই ব্যাটা গেল কই?'

নিজের কফি কাপের দিকে তাকাল রানা। ধোঁয়া উড়ছে, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। 'আমার মনে হয় ওরা দু'জন আমাদের হোটেলের আশপাশে কোথাও লুকিয়ে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।'

ভ্রূ কুঁচকে রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'বলো কী!'

'আমি হলে তা-ই করতাম। সকালে বোটে চড়ে চারজনই গিয়েছিল জলাভূমিতে। বেশ কিছুক্ষণ চক্কর দিয়ে বুঝে যায় এত বড় সোয়াম্পে শত শত খাঁড়ির মধ্যে আমাদেরকে খুঁজে বের করাটা প্রায় অসম্ভব। তখন ফিরতি পথ ধরে। ওদেরকে চলে আসতে দেখেছি আমি। যা-হোক, পরে হয়তো আলোচনা করে স্ট্রাটেজি বদল করে ওরা। দু'জন করে দুটো দলে ভাগ হয়ে যায়। একদল বোট নিয়ে আবার যায় সোয়াম্পে। আরেকদল, আমার অনুমান, আমাদের হোটেলের কাছেপিঠে আছে। বোট নিয়ে যারা গিয়েছিল তারা যদি কোনও কারণে ব্যর্থ হয়, কাটামুখ ধরেই নিয়েছে তার আরেক চামচাকে নিয়ে আমাদেরকে কাবু করতে

পারবে।'

'কিন্তু...আমরা কোন্ হোটেলে উঠেছি জানল কীভাবে?'

'কীভাবে জানল বলতে পারবো না। কিন্তু আমার ইনটুইশন বলছে জানতে পেরেছে। আর ধরো আমার অনুমান ভুল। তারপরও সাবধান থাকতে তো অসুবিধা নেই, নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'তা হলে আমাদের স্ট্রাটেজি কী এখন?'

'একসঙ্গে হোটেলে না ফেরা।'

পিঠ সোজা হয়ে গেল সোহানার। 'রানা, তুমি কিন্তু...'

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল রানা। 'একসঙ্গে না ফেরা বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি একসঙ্গে না থাকা।'

'এতে লাভ কী হবে?'

'আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখতে পাবে বলে আশা করে থাকবে ওরা, সেই আশার গুড়ে বালি পড়বে। আশাহত অবস্থায় আমার মোকাবেলা করতে হবে ওদেরকে, তুমি কোথায় গেছ কী করছ ইত্যাদি চিন্তা খেলা করতে থাকবে ওদের মাথায়, ফলে সতর্কতায় ঢিল পড়বে। সুযোগটা কাজে লাগাতে চাই আমি।'

'আর যদি না লাগাতে পারো? তুমি ধরেই নিয়েছ হোটেলে মাত্র দু'জন অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে, যদি তার চেয়ে বেশি হয়?'

প্যান্টের পকেটে দু'বার চাপড় দিল রানা। 'তোমার সব যদির উত্তর এখানে আছে।'

মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল সোহানা, তারপর বলল, 'তার মানে আমরা আলাদা আলাদাভাবে হোটেলে যাবো?'

'তা-ই করা উচিত। শোনো, এখান থেকে একটা রাস্তা সোজা এগিয়ে গেছে হোটেলের দিকে। এ-পথে গেলে সময় লাগে কম। এটা ধরে আমি যাবো। ধরলে প্রথমে আমাকে ধরুক ওরা।'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল সোহানা, আবার হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল রানা। 'ভুলে যাচ্ছ আমার পকেটে একটা ল্যুগার আছে, এক্সট্রা ম্যাগাজিন আছে। কাজেই দৃশ্যপটে তোমার আগে আমার আবির্ভাব জরুরি।'

কথাটা ঠিক, তাই দ্বিমত করল না সোহানা।

'আমার সঙ্গে কিছুদূর যাবে তুমি। তারপর বাঁয়ে একটা রাস্তা গেছে, ওটা ধরে ঘুরপথে হাজির হবে হোটেলে। বেশি না, জোরে হাঁটলে আমার চেয়ে আট-দশ মিনিট পর হোটেলে হাজির হতে পারবে।'

'ঠিক আছে,' কফির কাপটা সামনে টেনে নিল সোহানা। 'যদি দু'জনই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার ওপর? যদি আমি পৌঁছানোর আগেই ওরা কাবু করে ফেলে তোমাকে?'

'তা হলে স্বীকার করে নেবো আনআর্মর্ড কমব্যাটের অনেক কিছু শেখা এখনও বাকি আছে আমার।'

•

দূর থেকে হোটেলটা দেখা যাচ্ছে। হাঁটার গতি ধীর করল রানা।

কাটামুখ তার চ্যালাকে নিয়ে কোথায় অপেক্ষা করছে? কোথায় অপেক্ষা করতে পারে?

হোটেলে রুমের ভিতরে? উঁহুঁ, সে সম্ভাবনা কম। রানা-সোহানা কখন ফিরতে পারে জানে না ওরা। সেক্ষেত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা রুমের ভিতের কাটিয়ে দেয়া কষ্টকর হয়ে যাবে ওদের জন্য। তা ছাড়া ঘরটা গোছগাছ করে রাখার কথা রুম-সার্ভিসের, ওদের কেউ ভিতরে ঢুকলে কাটামুখ বা তার সঙ্গীর উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

হোটেল লবিতে? নাহ্, লোকজন আসা-যাওয়া করে ওই জায়গা দিয়ে, যারা রুম ভাড়া নিয়েছে তাদের অতিথিরা অপেক্ষা করে, এ-রকম একটা জায়গায় ধরপাকড়ের মতো কাজ করবে না

কাটামুখ।

তা হলে কোথায়?

হোটেল থেকে সামান্য দূরে ছোট্ট একটা নয়নাভিরাম লেক। তার একধারে, হোটেলের রাস্তার সঙ্গে কয়েকটা বেঞ্চ পাতা। দু'-একটা বাদে বাকি বেঞ্চগুলোয় লোক বসে আছে। একটা বেঞ্চে বসে আছে শুধু একজন, মুখের সামনে পত্রিকা মেলে ধরে আছে।

থমকে দাঁড়াল রানা, সন্দেহ জেগেছে মনে। এই সময়ে পত্রিকা?

খেয়াল করল রানা, যত না পড়ছে, তার চেয়ে বেশি পড়ার ভান করছে লোকটা। একটু পর পর পত্রিকা সরিয়ে তাকাচ্ছে হোটেলের দিকে। দূর থেকে রানাকে দেখতে পেয়ে বন্ধ হলো লোকটার পত্রিকা পড়া, ওটা ভাঁজ করে বেঞ্চের উপর রেখে উঠে দাঁড়াল। এবার সোজা হেঁটে আসছে রানার দিকে।

কাটামুখ না, তার চ্যালা।

প্রশ্ন হলো, নাটের গুরু গেল কই?

ডানে-বাঁয়ে তাকাল রানা। লোকটাকে দেখতে পেল সঙ্গে সঙ্গে। একটা ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছে রানার দিকে। ডান হাতে মুঠো করে ধরে আছে কী যেন। সম্ভবত ছুরি, ফলাটা ভাঁজ-করা।

মনে মনে হাসল রানা। এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ও সে-জায়গা প্রায় নির্জন। ওকে তা হলে এখানেই "পাকড়াও" করতে চাইছে কাটামুখ ও তার চ্যালা?

কাটামুখকে তো চেনা আছে আগেই, ওর সঙ্গীকে দেখল রানা একনজর। ছ'ফুট চার ইঞ্চির কম হবে না। হাঁটছে আর তালে তালে এদিক-ওদিক ঝাঁকাচ্ছে মাথা। একইসঙ্গে নাড়াচ্ছে দু'কাঁধ—অ্যাকশনে যাওয়ার আগে প্রস্তুত করে নিচ্ছে পেশিগুলোকে। বার বার মুঠো পাকাচ্ছে আর খুলছে। চেহারা আর

চালচলন দেখলেই বোঝা যায় পেশাদার বক্সার ছিল কোনও একসময়।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। সোহানার আসতে আরও কয়েক মিনিট দেরি আছে। যা করার একাই করবে ও, ছুঁচো মেরে যদি হাত গন্ধ করতে হয় তা হলে নিজেই করবে, সোহানাকে জড়াবে না এসবের মধ্যে। আর দরকার হলে প্রথমে হামলা করবে ও-ই। প্রতিপক্ষকে সুযোগ না দেয়াই তো ভাল।

ফুট পাঁচেক দূরে এসে দাঁড়িয়েছে কাটামুখ। রানাকে দেখিয়ে দেখিয়ে টেনে বের করল ছুরির ফলা, সময় নিল। আসলে চাইছে বক্সার যাতে এসে যোগ দিতে পারে ওর সঙ্গে।

বক্সার এল। কাটামুখের সঙ্গে রানাকে যদি এক রেখার কল্পনা করা হয়, তা হলে সে দাঁড়িয়ে গেল একটা সমকোণ তৈরি করে, পাঁচ ফুটের মতো দূরত্ব রেখে। ঘাড়টা শেষবারের মতো ঝাঁকিয়ে বাঁ পা আগে বাড়িয়ে পজিশন নিল। দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেছে, উঠে গেছে কোমরের কাছে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। কেউ দেখলে বলবে ঘটনার আকস্মিকতায় নড়তে ভুলে গেছে যেন। আসলে চাচ্ছে আর দু'-এক কদম আগে বাড়ুক বক্সার।

কিন্তু বক্সার না, ছুরিটা কোপ মারার ভঙ্গিতে তুলে ধরে এক কদম আগে বাড়ল কাটামুখ। 'একজন ইয়াং লেডি ছিল আপনার সঙ্গে, মিস্টার রানা,' লোকটার ঠোঁটের কোণে নিঃশব্দ বীভৎস হাসি, উচ্চারণে কড়া রাশান টান, 'তাকে দেখছি না যে?'

'লেডির খোঁজ করছ কেন?' চোখের কোনা দিয়ে দেখছে রানা কতটা কাছে এসেছে বক্সার, 'যেভাবে ছুরি বাগিয়ে এগোচ্ছ, দেখলে যে-কেউ বলবে তুমি একটা জেন্টসকিলার, লেডিকিলার না। কাজেই...' কথা শেষ না করে ছোট্ট একটা লাফ দিল ও, এত দ্রুত যে, একইসঙ্গে চমকে উঠল কাটামুখ আর বক্সার।

লাফিয়ে এসে পড়েছে রানা বক্সার অর্থাৎ পেত্রোভের নাগালের মধ্যে, আসলে এটা একটা ফাঁদ। পেয়েছি, ভেবে বাঁ পায়ের উপর ভর রেখে বিরাশি সিক্কার নিখুঁত একটা পাঞ্চ হাঁকাল পেত্রোভ, বাঁ-হাতি বক্সার ভাবতেই পারেনি এত সহজে নক-আউট করতে পারবে রানাকে। কিন্তু লোকটা কী করতে পারে অনুমান করে নিয়েছিল রানা, তাই পেত্রোভের বাম হাতটা নড়ে উঠতে দেখেই বাঁ পায়ের উপর ভর দিয়ে নিচু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথার ছ'ইঞ্চি উপর দিয়ে চলে গেল একটা প্রবল ঘূর্ণিঝড়।

মুহূর্তের মধ্যে নড়ে উঠল রানা। বাঁ পায়ের উপর ভর দিয়েই ছিল, ডান পা দিয়ে সজোরে সাইড কিক মারল পেত্রোভের সামনে বাড়ানো ডান হাঁটুতে। ব্যালেন্স আনতে দেরি হলো মাত্র এক সেকেণ্ড, তারপরই প্রজাপতির মতো উড়াল দিয়ে চলে গেল রানা কাটামুখের ছুরির আওতায়, এটাও একটা ফাঁদ।

রানাকে এত দ্রুত মুভ করতে দেখে থমকে গিয়েছিল নিয়াযভ, লাফিয়ে এসে ওর মুখোমুখি হাজির হতে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছুরিটা তুলল উপরে, একপোচে গলাটা দুফাঁক করে দিয়ে রানার ভবলীলা সাঙ্গ করার ইচ্ছা আছে মনে হয়।

দু'হাতে গুণচিহ্নের মতো তৈরি করে ঠেকাল রানা আঘাতটা নিয়াযভের কব্জির কাছে, সঙ্গে সঙ্গে ডান হাঁটু ভাঁজ করে প্রচণ্ড গুঁতো মারল নিয়াযভের তলপেটে। ফুসফুসের সব বাতাস মুখ দিয়ে বের করে দিয়ে ছিটকে পড়ল নিয়াযভ ছ'-সাত হাত দূরে, ছুরিটা আপনাআপনি খসে গেছে হাত থেকে।

এদিকে সার্কাসের ভাঁড়ের মতো ল্যাংচাচ্ছে পেত্রোভ, ডান হাত দিয়ে হাঁটু ডলতে ডলতে এগিয়ে আসছে "উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে" সাহায্য করার জন্য। রাশান ভাষায় অবোধ্য কিছু শব্দ উচ্চারণ করছে যার মানে বুঝতে হলে রাশান জানতে হয়

না। লোকটাকে দু'কদম এগিয়ে আসার সুযোগ দিল রানা, তারপরই অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে এক পাক ঘুরে হাঁকাল লাথি। ওর ডান বুটের গোড়ালি সজোরে আছড়ে পড়ল পেত্রোভের নাকের উপর, আরেকটা সাইডকিক। তরুণাস্থি ভাঙার আওয়াজ পাওয়া গেল, একইসঙ্গে থেমে গেল লোকটার বিশুদ্ধ উচ্চারণে অশ্লীল রাশান গালি। পঁচানব্বই কেজি ওজনের শরীরটা সশব্দে আছড়ে পড়ল রাস্তায়।

এসব দেখার সময় নেই রানার, হিসেব তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলতে চাইছে ও। পেত্রোভকে লাথি মেরেই এগিয়ে গেছে নিয়াযভের কাছে। উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা ততক্ষণে, মুখ হাঁ করে দম নিচ্ছে, টলছে অল্প অল্প। ডান হাত মুঠো করল রানা, জায়গামতো হাজির হয়ে বাঁ পায়ের উপর ভর দিয়ে প্রচণ্ড একটা নক আউট ঝাড়ল নিয়াযভের নাক-মুখের ওপর। ঠোঁট দুটো থেঁতলে গেল, নাকের দুই ফুটো দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়তে শুরু করল। ধরাশায়ী হয়েছে লোকটা, ওকে উঠে দাঁড়ানো অথবা সরে যাওয়ার সুযোগ না দিয়ে ওর কপালের পাশে প্রচণ্ড লাথি মারল রানা বুটের ডগা দিয়ে। দুর্বল জায়গায় মোক্ষম আঘাত, রানা জানে অন্তত এক ঘণ্টা বেহুঁশ হয়ে থাকবে কাটামুখ।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ও বক্সারের দিকে। যেভাবে পড়ে ছিল সেভাবেই পড়ে আছে লোকটা, এরও ভাঙা নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে। যেন রক্ত ঝরানো প্রতিযোগিতায় নেমেছে দু'জন, দেখতে চায় কে ফার্স্ট হয়। জ্ঞান হারায়নি, কিন্তু উঠে দাঁড়ানোর মতো অবস্থাও নেই ওর।

মারামারি করার সময় খেয়াল করেনি, এবার দেখল রানা কৌতূহলী কয়েকজন লোক নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখছে ওকে। একজন দরদ দেখানোর জন্য বলল, 'ঠিক আছো তো, ভায়া?'

হাত ঝেড়ে ময়লা পরিষ্কার করার অভিনয় করল রানা। প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভুল লোককে জিজ্ঞেস করা হয়ে গেল না?'

'হয়েছিল কী?'.

'কী আর? ছিনতাই করতে চাইছিল।'

'পুলিশ ডাকবো?'

জবাব দেয়ার আগে দূরের রাস্তাটার দিকে তাকাল রানা। ছুটতে ছুটতে আসছে সোহানা, বুঝতে পেরেছে কিছু একটা হয়েছে হোটেলের সামনে।

হোটেলের দিকে হাঁটতে শুরু করল রানা। হাঁটতেই হাঁটতেই বলল, 'পুলিশ? ডাকতে পারো। কিন্তু আগেই বলে রাখি আমি সে-সব ঝামেলায় নেই। চলে যাচ্ছি। পুলিশ যদি ডাকো তা হলে তাদেরকে সামলানোর দায়িত্বও তোমাদেরকেই নিতে হবে।'

ঘণ্টা পাঁচেক পর নরফোক বিমানবন্দরে হাজির হলো ওরা। সেখান থেকে সোজা ক্যালিফোর্নিয়ার সোলানা বীচে। এখানে রানার ব্যক্তিগত অ্যাপার্টমেন্ট আছে। মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান, সোহেল এবং এ-রকম অতি ঘনিষ্ঠ দু'-চারজন ছাড়া এটার কথা জানে না কেউ।

চল্লিশ তলা ভবনের ত্রিশ তলায় অ্যাপার্টমেন্টটা কিনেছে রানা। তারপর মনের মতো করে বানিয়ে নিয়েছে। বিলাসের কোনও উপকরণই বাদ দেয়নি। এটা আয়তনে তিন হাজার বর্গফুট। পর্যাপ্ত দরজা-জানালা আছে, তাই আলো-বাতাসের অভাব নেই। প্রতিটা বেডরুমের সঙ্গে বড়সড় ব্যালকনি।

মাস্টার বেডের সঙ্গের ব্যালকনিটা সাগরমুখী। এখানে দুটো বেঁটে পামগাছ ছায়া দিচ্ছে হাতলওয়ালা কয়েকটা চেয়ারের পায়ের কাছে। সুগন্ধী ফুলওয়ালা ছোট ছোট ফার্ণ আছে। বুক ভরে দম

নিলে ফুলের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে দিগন্তের দিকে তাকালে দেখা যায় ডেল মার পয়েন্ট আর সাগরের সুনীল জলরাশি। দেখা যায় বিলাসবহুল হোটেল-মোটেলের সারি। ভেজা বালির টুকরো টুকরো সৈকতও চোখে পড়ে। সেখানে সীলের মতো আয়েশী ভঙ্গিতে রোদ পোহাচ্ছে আধা উলঙ্গ নর-নারী। গায়ে সান লোশন লাগাচ্ছে করছে কেউ কেউ। কেউ আবার দাপাদাপি করছে সাগরের তিনফুটী ঢেউয়ে।

ঘরে ঢুকে সঙ্গের জিনিসগুলো জায়গামতো গুছিয়ে রাখল রানা। তারপর কাপড় ছেড়ে সেগুলো ঢুকিয়ে দিল ওয়াশিংমেশিনে। বাথরুমে চলে এল এরপর। শাওয়ার ছেড়ে ঠাণ্ডা পানির নীচে দাঁড়িয়ে থাকল টানা দশ মিনিট। গোসল সেরে গা না মুছেই বাইরে এল। ঘরের আর বারান্দার দরজা বন্ধ কি না দেখে নিয়ে বাইশে দিয়ে চালু করে দিল এসি। মেহগনি কাঠের কুচকুচে কালো আলমারির আয়নায় নিজেকে দেখল কিছুক্ষণ। ড্রেসিং টেবিল থেকে চিরুনি নিয়ে ব্যাকব্রাশ করে নিল চুলগুলো। আলমারি থেকে ইলাস্টিক লাগানো একটা পাজামা বের করে পরল। সোহানার কোনও সাড়াশব্দ নেই। পাশের ঘরের বাথরুমে আছে, ভাবল রানা, গোসল করছে। বেরোতে সময় লাগবে।

রানার গায়ে লেগে-থাকা পানির ফোঁটাগুলো এসির ঠাণ্ডায় বরফের টুকরোয় পরিণত হয়েছে যেন। আবেশে বুঁজে আসতে চাচ্ছে চোখ। খাটে শুয়ে পড়ল রানা। চিৎ হয়ে পড়ে থেকে বন্ধ করল দু'চোখ। আস্তে আস্তে ঢিল করে দিল হাত-পা, তারপর সারা গায়ের মাংসপেশী। শবাসন।

মিনিট দশেক পর যখন চোখ খুলল তখন সোহানা দাঁড়িয়ে আছে খাটের পাশে। পরনে গোলাপি বাথরোব। ভেজা চুলগুলো লেপ্টে আছে ঘাড়ে, কাঁধে। একদৃষ্টিতে দেখছে রানাকে।

রানা বলল, 'চলো ডিনার সেরে নিই। তারপর স্টাডিরুমে

বসবো। হাতে প্রচুর কাজ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল সোহানা। হাসল মিষ্টি করে। 'তোমার ঘর, তোমার বাড়ি। আমি মেহমান। কাজেই কী খাওয়াবে তুমিই ঠিক করো। রান্নাবান্না করতে হলেও কিন্তু তোমাকেই করতে হবে। আমি যাই, একটু সাজুগুজু করি।'

রানা জানে ফ্রিজে কী আছে। মাইক্রোওয়েভ ওভেনে গরম করে নিলেই হবে। তেমন কঠিন কোনও কাজ না।

মিনিট বিশেক পর ডাইনিং টেবিলে বসে ডিনার সেরে নিল দু'জনে নিঃশব্দে। এঁটো থালাবাসনগুলো ধোওয়ার কাজে রানাকে সাহায্য করল সোহানা। তারপর স্টাডিরুমে এসে ঢুকল দুজনে।

পর্দা সরিয়ে জানালা খুলে দিল রানা। বাইরে সন্ধ্যা নেমেছে। মায়াবি আলোয় আলোকিত হয়ে আছে পুরো সোলানা বীচ। সমুদ্রের বুক থেকে ছুটে এসে ঘরের ভিতরে মাতামাতি করছে বসন্তের বাতাস। পিছু হটে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল রানা। ডেস্কের ওধারে আরেকটা চেয়ারে বসে আছে সোহানা।

সাবমেরিন থেকে পাওয়া কালো চামড়ার ব্যাগটা টেনে নিল রানা। ভিতর থেকে বের করল জার্নাল দুটো। একটা জার্নাল ঠেলে দিল সোহানার দিকে। আরেকটার পাতা ওল্টাতে লাগল নিজে। কিছুক্ষণ পর বলে উঠল, 'হতভাগ্য ওই লোকটার নাম এগন বল্ডেউইন।'

সোহানা বলল, 'আমার হাতের এটা মনে হয় কোনও ডায়রি। সম্ভবত এগন নিজেই লিখেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের কিছু বর্ণনা আছে। আমি জার্মান ভালো বুঝি না। ঠিকমতো পড়তে পারছি না।'

চেয়ার ছেড়ে উঠল রানা, নিজের ল্যাপটপটা নিয়ে এসে ডেস্কের উপর রেখে চালু করল। বিশেষ সফটওয়্যার আছে ওর কাছে, তা ছাড়া গুগলে "ট্রান্সলেশন" সুবিধাও আছে। ওগুলো

এবং নিজের জার্মান বিদ্যা কাজে লাগিয়ে মোটামুটি অনেক কিছুই জানা গেল লোকটার সম্পর্কে।

আধ ঘণ্টা পর মুখ তুলে তাকাল সোহানার দিকে। 'তোমার ওই ডায়রিটা আসলে যতটা না ডায়রি তারচেয়ে বেশি উইল। এগন তার শেষ ইচ্ছাগুলো লিখেছে এখানে। আর আমার এই জার্নাল, সাবমেরিনটার শেষ দিনগুলোর দলিল। ও, ভালো কথা। সাবমেরিনটার একটা নাম উল্লেখ করেছে এগন।'

'কী?'

'ইউ.এম. থার্টি ফোর।'

'অদ্ভুত নাম তো!'

'কিন্তু নামটার মানে আছে। ইউ.এম. মানে হলো আণ্ডারওয়াটার মল্‌শ্।'

'আর থার্টি ফোর?'

'যতদূর বুঝতে পারছি এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তৈরি চৌত্রিশতম মল্‌শ্। শোনো, আমি লগবুকটা নিচ্ছি আবার। তুমি ডায়রিটা নাও, আমার ল্যাপটপও। দেখো আরও কিছু জানতে পারো কি না। মৌমাছির ছবিওয়ালা মদের বোতলগুলো দেখতে সামান্য হলেও আসলে সামান্য না। এগুলোর পেছনে বড় কিছু আছে। এবং যে-কোনওভাবেই হোক ইউ.এম. থার্টি ফোরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে ওই বোতলগুলোর। সেটা কী বুঝতে হলে আগে জানতে হবে কেন মেরিল্যাণ্ড নদীর খাঁড়িতে আটকা পড়েছিল সাবমেরিনটা। জানতে হবে কে এই এগন বল্ডেউইন। ইউনিফর্ম আর র‍্যাঙ্কের পিছনের মানুষটাকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। আরেকটা কাজ করবো। সাবমেরিনের ভিতরে যে-বোতলটা পেয়েছি, বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ওটার বেশ কিছু ছবি তুলবো। ছবিগুলো ক্যামেরা থেকে ল্যাপটপে নিয়ে মেইল করে দেবো অপির কাছে। দেখা যাক কী জানাতে পারে আমার

সেইফহাউসের গবেষক।'

ইন্টারনেটের ভিডিও কনফারেন্সিং-এ যখন উদয় হলো অপি তখন ক্যালিফোর্নিয়ায় বাজছে রাত এগারোটা।

কাজে ডুবে ছিল রানা, খুক করে কেশে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল সোহানা। বলল, 'অপি এসেছে।'

চোখ পিটপিট করল রানা।

ল্যাপটপটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল সোহানা। তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে বসল রানার পাশে।

ল্যাপটপের বিল্টইন ক্যামেরা দিয়ে সোহানাকে দেখতে পেয়ে হাসল অপি। কিন্তু কোনও মন্তব্য না করে সরাসরি চলে গেল কাজের কথায়, 'মাসুদ ভাই, ছোট্ট একটা ভুল হয়েছে আপনার।'

ভ্রূ কুঁচকাল রানা। 'যেমন?'

'আপনি বলেছেন বোতলের গায়ে কোনও লেখা নেই। আসলে আছে। প্রথম কথা মৌমাছির ছবিটা আছে একটা লেবেলে, আর লেবেলটা সাঁটানো আছে বোতলের গায়ে। ওই লেবেলের নীচের দিকে লম্বা একটা কালো দাগ। খালিচোখে দেখলে দাগ বলেই মনে হয় ওটাকে। কিন্তু দাগটা আসলে একটা লেখা। একটা ফরাসি বাক্য। যুম করে দেখে নিশ্চিত হয়েছি।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা, নিজের উপর কিছুটা বিরক্ত হয়েছে। 'এখন বলো, আমার বন্ধুর ওয়েবসাইটে যে-ছবি আছে আর তোমাকে যে-ছবিগুলো পাঠিয়েছি ওগুলো কি এক?'

'সে-রকমই মনে হচ্ছে আমার,' জবাব দিল অপি।

'মৌমাছির এই প্রতীকের মানে কী?'

'এখন পর্যন্ত জানতে পারিনি। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

'গুড। কিছু জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে। আজ অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকবো আমি।'

ভিডিওচ্যাটিং থেকে বিদায় নিল অপি।

'আচ্ছা, রানা,' মুখ খুলল সোহানা, 'দুটো বোতলই কি সাবমেরিনের ভিতরে ছিল? কোনও কারণে আলাদা হয়ে গেছে?'

'নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না এখনই। তবে সাবমেরিনের ভিতরে থাকলে আরেকটা ধাঁধা এসে হাজির হয় সামনে। হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে এণ্ট্রি হ্যাচের ঢাকনা খুলতে হয়েছে আমাকে। সে-ক্ষেত্রে বোতলটা বাইরে এল কীভাবে? অন্যটার সঙ্গে ভিতরে থাকারই কি কথা ছিল না?'

জবাব না দিয়ে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'আরেকটা কথা। এমন কী জড়িত আছে বোতলগুলোর সঙ্গে যে আমাদের; বলা ভালো রে হোগানের জান নিয়ে টানাটানি পড়ে গেল?'

'বলতে পারবো না, সোহানা,' মাথা নাড়ল রানা। 'এগুলো ছাড়াও আরও কতগুলো প্রশ্ন আর কিন্তু আছে আমাদের সামনে।'

'যেমন?'

'যেমন ইউ.এম. থার্টি ফোরের ব্যাপারে কী করা যায়? এগনকে নিয়েই বা কী করবো?'

'ফোন করে জানাবে কোস্ট গার্ডদের অফিসে?' সোহানার কণ্ঠে অনিশ্চয়তা।

'জানাবো। তবে ফোনটা আমি করবো না, আমার হয়ে অন্য কেউ করবে।'

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'রানা, কোনও হাঙ্গামা হবে না তো আবার?'

'কীসের হাঙ্গামা?'

'সবাই প্রথমেই জানতে চাইবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এত বছর পর আমেরিকায় কী করছে একটা জার্মান সাবমেরিন।'

'এবং উত্তরটা পেতেও দেরি হবে না ওদের। ওটা যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই আমেরিকায় গিয়ে আটকা পড়েছিল, আশা করি

সে-কথা তাড়াতাড়িই জানতে পারবে ওরা।'

'যদি এফ.বি.আই. অথবা ন্যাশনাল সিকিউরিটি হাজির হয়? এমনকী সি.আই.এ.-ও নাক গলাতে পারে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তাতে আমাদের কিছু যায়-আসে বলে মনে হয় না। ওই সাবমেরিনের সঙ্গে আমাদেরকে জড়াতে পারবে কেউ? কোনও প্রমাণ আছে? বেশি হলে জেসন'স বেইট অ্যাণ্ড বোটে খোঁজ করতে পারে ওরা। কিন্তু ওরা আমাদের কাছে একটা মোটর বোট ভাড়া দিয়েছে, আমরা কোথায় গেছি না গেছি, কী করেছি না করেছি, নিশ্চয়ই সে-খবর রাখেনি। ঠিক না?'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানার কথায় সায় জানাল সোহানা।

'তবে একটা কথা,' বলে চলল রানা। 'সাবমেরিনটা যেখানে আছে সে-জায়গা এখন একটা আর্কিওলজিকাল সাইট। কারও অনুমতি না নিয়ে সেখান থেকে কিছু জিনিস নিয়ে এসেছি আমরা। প্রাচীন মিশরের কাহিনি জানো নিশ্চয়ই? মৃত রাজাদের কবর খুঁড়ে দামি জিনিস হাতিয়ে নিত চোরের দল। আমাদের কাজটাও হয়ে গেছে সে-রকম। শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই সত্যি।'

'তা হলে কী করবে এখন?'

'এগনের জিনিসগুলোর ব্যাপারে কিছু করা যায়।'

'যেমন?'

'ওর যোগ্য উত্তরাধিকারীকে খুঁজে বের করে তার হাতে তুলে দিতে পারি লগবুক আর ডায়রিটা।'

ডায়রিটা টেনে নিয়ে সেটার গায়ে কিছুক্ষণ হাত বুলাল সোহানা। তারপর বলল, 'তোমার ল্যাপটপটা দাও আবার। আরও কিছুক্ষণ পড়াশোনা করি ডায়রিটা নিয়ে।'

ল্যাপটপটা সোহানাকে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠল রানা। অনেকক্ষণ একটানা বসে থাকার কারণে ব্যথা করছে ঘাড় আর

কোমর। হালকা কিছু এক্সারসাইয সেরে নিল ও। সোহানাকে একা রেখে চলে এল মাস্টার বেডরুমে।

এসি বন্ধ করার কথা খেয়াল ছিল না। ঘরটা যেন উত্তরমেরুতে পরিণত হয়েছে। রিমোট চেপে ওটা বন্ধ করল রানা। এগিয়ে গিয়ে ঠেলে সরাল বারান্দার দরজা। বাতাসের দাপট এড়ানোর জন্য দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে ধরাল একটা সিগারেট। তারপর চলে এল বারান্দায়। একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। ডান হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, বাঁ হাতটা ভাঁজ করে রেখেছে মাথার নীচে। অপলক চোখে তাকিয়ে আছে রাতের মেঘহীন আকাশের দিকে। সেখানে লক্ষ তারার ঝিকিমিকি।

সিগারেটটা শেষ করে অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল রানা। কিছুক্ষণ পর উঠল। চলে এল ডাইনিংরুমে। ফ্রিজ থেকে জুসের বোতল বের করল, দুটো গ্লাস নিল। তারপর গিয়ে বসল স্টাডিরুমে।

'এগনের বউ-বাচ্চা ছিল,' ডায়রির পাতা থেকে চোখ না সরিয়ে বলল সোহানা।

'নাম কী?' জানতে চাইল রানা।

'ড্যানিয়েলা আর স্তেফান।'

'কোথায় থাকত জানা গেছে?'

'ডুসেলডর্ফের বাইরে, আঙ্গবার্গে।'

'তারমানে ওখানে গেলে ওই পরিবারের কাউকে-না-কাউকে পাওয়া যেতে পারে।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'তুমি কি লগবুকটা নিয়ে বসছ আবার?'

'হ্যাঁ, বসতে হবে। লগবুক ধরে একটা ম্যাপ বানাতে চাই আমি।'

'কীসের ম্যাপ?'

'সাবমেরিনটা কোত্থেকে রওনা হয়ে কোথায় কোথায়

গিয়েছিল। ও, একটা কথা বলা হয়নি তোমাকে। ওটা কিন্তু একটা অক্সিলারি মাদার শিপের সঙ্গে যুক্ত ছিল।'

'মাদার শিপ?'

'হ্যাঁ। জাহাজটার নাম লুকাস।'

'লুকাস?'

'আমার মনে হয় এটা আসল নাম না। সাংকেতিক নাম।'

ছোট করে শিস দিল সোহানা, মাথা নাড়ছে। 'সাংকেতিক নাম। হারানো সাবমেরিন। রহস্যময় মদের-বোতল। আমাদের এবারের ছুটিটা একটা সাসপেন্স নভেল হয়ে যাচ্ছে, রানা।'

'খারাপ লাগছে তোমার?'

হাসল সোহানা। 'একটুও না। আচ্ছা, কাজের কথায় যাই। ডায়রির একটা জায়গায় দাগ দিয়ে রেখেছি। পড়ার সময় ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে আমার কাছে। শোনাচ্ছি তোমাকে।' বিশেষ ওই পাতাটা বের করে পড়তে লাগল, '...আজ মিকি আমাকে চমৎকার দু'বোতল মদ দিয়েছে। কিনেছিল তিন বোতল। দুটো নিয়ে এসেছে আমার জন্য। দেয়ার সময় বলল, মিশন শেষ হলে এগুলো দিয়ে সেলিব্রেট করবো আমরা।'

'মিকি?' রানার ভ্রূ কুঁচকে গেছে। 'নামটা কি আমাদের পরিচিত?'

'না...মনে হয় না। আমি কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছি না। ডায়রির আগে কোথাও নামটা আছে হয়তো, আমার চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। এবার আরেকটা লাইন শোনো।' চিহ্ন দিয়ে-রাখা আরেকটা পাতা বের করল সোহানা। 'মিকি বলেছে আমার নাকি দু'বোতল মদ পাওয়া উচিত। কারণ আমার কাজটা বেশি কঠিন।' চোখ তুলে তাকাল রানার দিকে। 'কী এই কাজ?'

'জানি না। ওই জলাভূমিতে একটা বোতল পেল কীভাবে হোগান তা-ও বুঝতে পারছি না।'

ল্যাপটপের টাস্কবারে মিনিমাইয করে-রাখা একটা উইণ্ডো জ্বলছে-নিভছে। ভিডিও কনফারেন্সিং-এ এসেছে অপি।

উইণ্ডোটা ম্যাক্সিমাইয করল সোহানা। 'কী খবর?'

'প্রথম কথা,' নাকের উপর নেমে-আসা চশমা ঠেলে উপরের দিকে তুলে দিল অপি, 'ওই মৌমাছিটার মানে কী, এখন পর্যন্ত বের করতে পারিনি আমি। সরি।'

'ঠিক আছে। চেষ্টা চালিয়ে যাও। একসময় জানতে পারবেই। আর কিছু?'

'বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বোতলটার অনেকগুলো ছবি তুলে আমার কাছে পাঠিয়েছেন মাসুদ ভাই। সময় নিয়ে সবগুলো ছবি দেখেছি আমি। আমার মনে হচ্ছে বোতলের কাঁচ খুব পুরু, সহজে ভাঙবে না। লেবেলটাও অন্যরকম। পাতলা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী চামড়ার। আঠা দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে বোতলের গায়ে। লেবেলের মার্কিংগুলো "এচিং" করে, মানে সুই আর অ্যাসিডের সাহায্যে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। এ-কাজে ব্যবহার করা হয়েছে একজাতের বিরল কালি।'

'মৌমাছির নীচের লেখাটার ব্যাপারে কিছু জানতে পারলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পেরেছি। ওটা একটা ফরাসি বাক্যাংশ। ইংরেজি করলে যার মানে হয় "কাস্টোমারি মেযারমেণ্ট"।'

'কাস্টোমারি মেযারমেণ্ট?' চেয়ারটা আরেকটু টেনে বসল সোহানা।

'হ্যাঁ,' বলছে অপি, 'এটা পরিমাপের একটা পদ্ধতি। কম করে হলেও একশ' পঞ্চাশ বছর আগে এই পদ্ধতি বিলুপ্ত হয়েছে। আরেকটা কথা। ওই বাক্যাংশের পাশে আরেকটা শব্দ পেয়েছি।'

'কী?'

'ডেমিস। মানে এক পাইণ্ট বা ষোলো আউন্স।'

'কিন্তু...' সোহানার কণ্ঠে অনিশ্চয়তা, 'ওই সাইজের একটা বোতলে কি অতখানি মদ ধরবে?'

'শিওর না,' বলল অপি। 'বেশিরভাগ জায়গায় ঝাপসা হয়ে গেছে কালি। ছবিটার ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে সময় লাগবে। আচ্ছা, লেবেলের উপরে ডানদিকে দুটো অক্ষর আছে, দেখেছেন?'

'দেখেছি,' বলল রানা। 'নীচে ডানদিকে একটা সংখ্যাও আছে। খুবই ছোট করে লেখা। সহজে চোখে পড়ে না।'

হাসল অপি। 'ঠিকই বলেছেন। সহজে চোখে পড়ে না।'

'কী?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'এক আর নয়।'

'মানে উনিশ? অর্থাৎ উনিশ শ' উনিশ সাল?'

'না,' মাথা নাড়ছে অপি, 'আঠারো শ' উনিশ। আর অক্ষর দুটো হচ্ছে এইচ এবং এ।'

'কারও ইনিশিয়াল?' বলল রানা।

সুইভেল চেয়ারে হেলান দিল অপি। চশমাটা খুলে নামিয়ে রাখল। 'জানি না...মানে আমি নিশ্চিত না। আরও সময় লাগবে আমার। আরও বই-টই ঘাঁটতে হবে। ইন্টারনেটে সার্চ করতে হবে। তবে...'

'তবে?'

সোজা হয়ে বসল অপি। 'ওই ইনিশিয়ালের ব্যাপারে একটা অনুমান আছে আমার।'

'যেমন?'

'আবারও বলছি এটা নিছক অনুমান। কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই আমার কাছে। যতদূর মনে হয়, এইচ মানে হেনরি এবং এ মানে আরখামবল্ট।'

'হেনরি আরখামবল্ট?' ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে

রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'কে লোকটা?'

স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অপি। কিছুক্ষণ পর বলল, 'ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের প্রধান ইনোলজিস্ট।'

'ইনোলজিস্ট? মানে...'

'মদ প্রস্তুতকারক,' সোহানার কথা কেড়ে নিয়েছে রানা। 'তারমানে...'

'হ্যাঁ, মাসুদ ভাই,' এবার রানার কথা কেড়ে নিল অপি, 'নেপোলিয়ন বোনাপার্টের হারিয়ে-যাওয়া মদভাণ্ডারের একটা বোতল পেয়ে গেছেন আপনারা।'

বারো

খারসোনেসাস কলোনি।

পাখিটা হঠাৎ উড়াল দিল ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে। দ্রুত গতিতে উড়ছে ওটা। পাগলের মতো ডানা ঝাপ্টাচ্ছে সকালের বাতাসে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ইভান সিদোরভ। চাচ্ছে আরও দূরে চলে যাক পাখিটা। একসময় ঝট্ করে শটগান তুলল সে কাঁধে। নিশানা করে টান দিল ট্রিগারে। শূন্যেই দু'বার গোত্তা খেল পাখিটা। ডানা ঝাপ্টাতে পারছে না আর। এক্ষুনি আছড়ে পড়বে মাটিতে।

'চমৎকার নিশানা,' নিয়াযভের কণ্ঠে অকৃত্রিম প্রশংসা। সিদোরভের থেকে কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

'যা!' চোস্ত ফার্সিতে চিৎকার করে উঠল সিদোরভ।

ওর পায়ের কাছে বসে ছিল দুটো শিকারি কুকুর, কথাটা শোনামাত্র লাফিয়ে উঠে ছুট লাগাল আছড়ে-পড়া পাখিটার উদ্দেশে। সিদোরভের সামনে পড়ে আছে কম করে হলেও বারোটা পাখির লাশ। সবগুলোকে কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে কুকুর দুটো।

লাথি মেরে একটা মরা পাখি কয়েক ফুট দূরে ফেলল সিদোরভ। 'এসব আর ভালো লাগে না আমার। কিন্তু না করেও উপায় নেই। এতে দুটো উপকার। এক, আমার নিশানা ঠিক থাকে। দুই, কুকুরগুলোর ব্যায়াম হয়। মেলিখান, এই শিকারের ব্যাপারটা কেমন লাগে তোমার?'

নিয়াযভের কয়েক ফুট পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মেলিখান। মাথা কাত করে রেখেছে, সিদোরভের প্রশ্নটার কী জবাব দেবে ভাবছে সম্ভবত। কিছুক্ষণ পর বলল, 'ব্যাপারটা নির্ভর করে কী শিকার করছি তার ওপর।'

'ভালো,' শুনে মনে হলো মেলিখানের উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েছে সিদোরভ।

একসময় রাশান ইন্টিলিজেন্সে একসঙ্গে চাকরি করেছে নিয়াযভ আর মেলিখান। নিয়াযভ ছিল কমাণ্ডার আর মেলিখান এক্সিকিউটিভ অফিসার। এখন ওদের দু'জনকেই এককথায় বলা যায় মার্সেনারি—যে বেশি পয়সা দেয় তার হয়ে কাজ করে। সিদোরভের হয়ে বারো বছর ধরে কাজ করছে নিয়াযভ, চার বছর ধরে করছে মেলিখান। অন্যেরা পারিশ্রমিক যা দিত, তার দ্বিগুণ দিয়েছে সিদোরভ সবসময়। তাই নিয়াযভ আর মেলিখান, মরা পাখিটাকে নিয়ে খাবলাখাবলি করতে করতে ছুটে-আসা কুকুর দুটোর মতোই সিদোরভের পোষা হয়ে গেছে। দু'জনের, বিশেষ করে নিয়াযভের ব্যাংক ব্যালেন্স ঈর্ষণীয়।

এই প্রথমবারের মতো কোনও অ্যাসাইনমেন্টে ব্যর্থ হয়েছে সে। নাগালে পেয়েও ধরতে পারেনি রানা-সোহানাকে। উল্টো নাজেহাল হতে হয়েছে। চারজনে মিলে কাবু করতে পারেনি "সামান্য" দুই "অ্যান্টিক হান্টারকে"।

খবরটা শোনার পর পরই ক্রাইমিয়ান পেনিনস্যুলায় নিজের ভ্যাকেশন হাউসে নিয়াযভ আর মেলিখানকে ডেকে পাঠিয়েছে সিদোরভ। গতকাল বিকেলে এসে পৌঁছেছে দু'জনই, কিন্তু এখন পর্যন্ত রানা-সোহানার ব্যাপারে একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি সিদোরভ। এবং ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলেছে বিশেষ করে নিয়াযভকে।

ব্যক্তিগতভাবে কাউকেই ভয় পায় না সে। শুধু সিদোরভেরই না, আরও অনেকের হয়ে ভাড়া খেটেছে সে এবং প্রতিটিবার নিজের বিচারবুদ্ধি আর দক্ষতায় পরাজিত করেছে প্রতিপক্ষকে। দিন যত গেছে, অভিজ্ঞতার পাল্লা ভারী হওয়ার পাশাপাশি নিজের উপর নিয়াযভের আস্থা বেড়েছে ততই। নিজেকে নিয়ে গর্বও করে সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সিদোরভের সামনে এলে কেন যেন ওর বিপুল অভিজ্ঞতা, গভীর আস্থাবোধ ও আত্মগর্বের সবই ম্লান হয়ে যায়। এই লোকটাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না সে। কখনোই উল্টোপাল্টা কিছু করেনি সিদোরভ, তারপরও মনে হয় এই বুঝি কী অঘটন ঘটিয়ে বসল।

লোকটা আসলে হাঙরের মতো, আজ সকালে আবারও ভেবেছে নিয়াযভ। মসৃণ গতিতে সাঁতার কাটে। মনে হয় কিছুই দেখে না অথচ সবকিছুই খেয়াল করে। এবং মুহূর্তের মধ্যে হামলা করে।

নিয়াযভের সামরিক-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুই চোখ তাই বার বার দেখছে সিদোরভের শটগানটা। দেখছে এবং নিশ্চিন্ত হচ্ছে আগুন উগলানোর আগে ওর দিকে তাক করা হয়নি অস্ত্রটা। এ যেন

সাগরে নেমে অনেকদূর চলে-আসা কোনও সাঁতারুর অবস্থা। যে-লোক আশপাশে একটা হাঙরের উপস্থিতি টের পাচ্ছে শুধু পৃষ্ঠপাখনা দেখে। তাই সাঁতার কাটা থামিয়ে ভাসছে। পাখনাটা যেদিকে দেখা যায় সেদিকেই ঘাড় ঘুরাচ্ছে বার বার। সৈকতে ফেরারও উপায় নেই বেচারার।

তুর্কমেনিস্তানের সেই যুবক সিদোরভের ব্যাপারে কমবেশি জানে নিয়াযভ। পাখিগুলোকে যেভাবে মারছে লোকটা, শত শত রাশান সৈন্যকে সেইভাবে খুন করেছে জানার পরও ওর নুন খেয়েছে এবং খাচ্ছে নিয়াযভ লোভের বশে—মানুষটা মুক্তহস্তে টাকা দেয়। তা ছাড়া যুদ্ধ যুদ্ধই। এটা একটা খেলা—মরণখেলা। এর নিয়ম হচ্ছে বাঁচতে চাইলে মারো। কাজেই যে সৈনিকের বাঁচার ইচ্ছা বেশি, যে সৈনিক কৌশল জানে বেশি, সাদা কথা, জিতবে সে-ই। সিদোরভের বেলায় নিয়মটার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

'হাতে ভালো একটা বন্দুক থাকলে...' নিয়াযভকে চমকে দিয়ে হঠাৎ বলে উঠল সিদোরভ, 'ভালো নিশানা করা মোটেই কঠিন কিছু না।' ব্রীচ খুলে খালি শেল বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। শটগানটাকে আদর করল কিছুক্ষণ। 'এর স্রষ্টা অস্ট্রিয়ার এক বিখ্যাত বন্দুকনির্মাতা। নাম হ্যাম ক্রুশ। নিয়াযভ, বলো তো এটার বয়স কত হতে পারে?'

'ধারণা নেই,' মাথা নাড়ল নিয়াযভ।

'একশ' আশি বছর। শুনেছি অটো ফন বিসমার্ক এককালে ব্যবহার করেছেন এই শটগান।'

'কথাটা...আগে বলেননি কখনও।'

'বলিনি?' হাসল সিদোরভ, শটগানের নলটা কাঁধে ফেলে ট্রিগার আর বাঁট আঁকড়ে ধরেছে। 'এসো আমার সঙ্গে। দু'জনই।' উঁচু ঘাসের জঙ্গল ভেদ করে হাঁটতে শুরু করল সে। ওদের সাড়া পেয়ে একটা-দুটো পাখি উড়াল দিলেই শটগান তাক করছে, গুলি

করছে। মাঝেমধ্যে থেমে দাঁড়াচ্ছে, কী যেন শুনছে কান পেতে, আপনমনে হাসছে। একসময় হঠাৎ করে বলল, 'ওদেরকে ধরতে পারোনি বলে তোমাকে দোষ দিই না আমি, নিয়াযভ।'

কথাটা আচমকা বলা হয়েছে, তাই বুঝতে সময় লাগল নিয়াযভের। 'কাদের কথা বলছেন? ওহ্—রানা-সোহানা?'

মাথা ঝাঁকাল সিদোরভ। 'ওদের ব্যাপারে অল্পবিস্তর খোঁজখবর নিয়েছি আমি।'

সচকিত হয়ে ওঠার মতো কথা। ঝট্ করে ঘাড় ঘুরিয়ে সিদোরভের দিকে তাকাল নিয়াযভ। 'কী জানতে পারলেন?'

'জানতে পারলাম রানা শখের ট্রেজার হান্টার না। সে একজন পেশাদার গোয়েন্দা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রানা এজেন্সি নামে শাখা আছে ওর প্রতিষ্ঠানের। যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে ব্যবসা চালাচ্ছে লোকটা। আর সোহানা নামের মেয়েটা ওর বউ না, বান্ধবী।'

চোখাচোখি হলো নিয়াযভ আর মেলিখানের মধ্যে।

'সে-জন্যই বলেছি,' বলে চলল সিদোরভ, 'ওদেরকে ধরতে না পারার জন্য তোমাকে দোষ দিই না আমি। কিন্তু তার মানে এই না, তোমার কোনও দোষ নেই। তুমি অবশ্যই দোষী। তোমার অপরাধ, প্রতিপক্ষকে খুব হালকাভাবে নিয়ে ফেলেছ। সব অ্যাসাইনমেন্টে জিততে জিততে অতি-আত্মবিশ্বাস চলে এসেছে তোমার ভিতরে, নিয়াযভ। যারা সারাক্ষণ বিপদ নিয়ে খেলা করে তাদেরকে মোকাবিলা করার আগে আরেকটু ভাবা উচিত ছিল তোমার।'

'প্রথম কথা,' নিজের সাফাই গাইতে শুরু করল নিয়াযভ, 'রানা-সোহানা যে গোয়েন্দা সেটা জানতাম না আমি। দ্বিতীয় কথা, আরেকটা সুযোগ দিন আমাকে, ওই দু'জনকে যদি হাত-পা বেঁধে আপনার সামনে হাজির না করেছি তো আমার নাম নিয়াযভ না।'

"বাদ দাও" ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সিদোরভ। প্রসঙ্গ বদল করে বলল, 'ওই বোতলগুলো আমার দরকার, জানো?'

'না।'

'আসলে ওই বোতলগুলোও আমার দরকার না, ওগুলো কোত্থেকে এসেছে তা-ও জানতে চাই না। তারপরও ওগুলো আমার চাই। কারণ ওগুলোতে একটা সূত্র আছে। সে-সূত্রের সমাধান করতে পারলে...' নিয়াযভের দিকে তাকিয়ে হাসল সিদোরভ। 'বুঝতেই পারছ কিছু একটা পাওয়া যাবে, যা অন্তত আমার জন্য খুবই দামি। আচ্ছা নিয়াযভ, নেপোলিয়নের সম্বন্ধে কী জানো?'

'বেশি কিছু না।'

'আমি অনেক কিছু জানি। লোকটাকে নিয়ে লেখা বেশ কিছু বই পড়েছি। আমার কী মনে হয় জানো? মনে হয়, নেপোলিয়ন আসলে ধূর্ত প্রকৃতির একটা মানুষ। যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু তাঁর মাথায় ছিল না। তাঁর মনে দয়া-মায়ারও অভাব ছিল। তবে বেশিরভাগ বইয়ের লেখক একটা বিষয়ে একমত—যুদ্ধ কীভাবে করতে হয় তা ভালোই জানতেন নেপোলিয়ন। কিন্তু আমার বিবেচনায় নেপোলিয়নের সবচেয়ে বড় গুণ কোন্‌টা জানো?'

চুপ করে আছে নিয়াযভ।

'দূরদৃষ্টি,' বলে চলল সিদোরভ। 'আজ থেকে পাঁচ বছর পরে কী হবে তা অনুমান করতে পারতেন নেপোলিয়ন। হেনরি আরখামবল্ট নামের একটা লোককে পদোন্নতি দিয়ে নিজের প্রধান মদনির্মাতা বানান তিনি। আদেশ দেন বিশেষ একজাতের মদ বানাতে এবং ওই মদ বিশেষ একজাতের বোতলে ভরতে। আমার মনে হয় তখন কিছু একটা খেলা করছিল তাঁর মাথায়। যুদ্ধ আর রাজনীতির বাইরে অন্য কিছু দেখতে পেয়েছিলেন তিনি যা হয়তো বাকিদের নজর এড়িয়ে গেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত দুর্ভাগ্যের কাছে

পরাজিত হতে হয় তাঁকে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে, মৃদু হাসল। 'একটা কথা আছেঃ কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ।'

আবারও সিদোরভের দিকে তাকাল নিয়াযভ। 'বুঝতে পারলাম না।'

'তুমি যে বুঝতে পারবে না তা আগেই জানা আছে আমার.' হেঁটে কিছুটা দূরে চলে গেল সিদোরভ, নাম ধরে নিজের কুকুরগুলোকে ডাকছে। হঠাৎ করেই ঘুরল সে। মুখোমুখি হলো নিয়াযভের। 'কত বছর যেন হলো আমার হয়ে কাজ করছ তুমি?'

'বারো।'

'ভালো কাজ করেছ এতদিন, স্বীকার করতেই হবে আমাকে।'

সামান্য মাথা ঝাঁকাল নিয়াযভ। বিনয় করে বলল, 'আমার কাজে আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন জেনে আমি খুশি।'

'ভালো,' হাসল সিদোরভ, সেই হাসিতে প্রাণ নেই। 'রানা-সোহানার জন্য ফাঁদ পেতেছিলে, উল্টো তোমাকেই ফাঁদে ফেলে পালিয়েছে ওরা। এই ব্যর্থতার জন্য তোমাকে দোষ দিই না আমি, বলেছি আগেও। কিন্তু তোমাকে কথা দিতে হবে, নিয়াযভ, আরেকবার যদি সুযোগ দিই তোমাকে তা হলে ব্যর্থ হবে না।'

'কথা দিলাম।'

'শুধু মুখে বললে চলবে না,' সিদোরভের দু'চোখে খেলা করছে কৌতুক। 'আনুষ্ঠানিকভাবে করতে হবে কাজটা।'

'আনুষ্ঠানিকভাবে মানে?'

'এটাও বোঝো না? সংসদসদস্যদেরকে কখনও দেখোনি কীভাবে হাত তুলে শপথ করে?'

ডান হাতটা কাঁধ পর্যন্ত তুলল নিয়াযভ। 'আমি শপথ করছি...'

মুহূর্তের মধ্যে নড়ে উঠল সিদোরভ। শটগানের নল নেমে গেছে ওর কাঁধ থেকে, ওই জায়গায় ঠাঁই নিয়েছে বাঁট। কী ঘটছে,

নিয়াযভ বুঝে ওঠার আগেই নল থেকে বের হলো কমলা স্ফুলিঙ্গ। একদিক দিয়ে গুলির আওয়াজ হলো আরেকদিক দিয়ে উধাও হলো নিয়াযভের ডান কব্জি।

বাঁ হাত দিয়ে রক্তাক্ত হাতটা চেপে ধরেছে নিয়াযভ, পিছিয়ে গেছে এককদম। চোখ তুলে তাকাল সিদোরভের দিকে। দৃষ্টিতে বেদনা নয়, নিখাদ বিস্ময়। গুঙিয়ে উঠল হঠাৎ। তারপর বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে।

ঘটনা দেখে কয়েক পা পিছিয়ে গেল মেলিখান। ভীষণ ভয় পেয়েছে।

'কেন?' ব্যথায় আবারও গুঙিয়ে উঠল নিয়াযভ। 'কেন...'

এবার দু'পা এগিয়ে এল সিদোরভ, শটগানের নল এখনও তাক করা রয়েছে নিয়াযভের দিকে। 'কারণ প্রতিপক্ষকে খুব হালকাভাবে নিয়েছ তুমি। তাদের ব্যাপারে কোনও খোঁজখবর না করেই মাঠে নেমেছ। এমনকী আমাকেও জিজ্ঞেস করার দরকার মনে করোনি। তোমার ভুলের জন্য পালাতে পেরেছে রানা-সোহানা। এখন ওদেরকে কোথায় খুঁজে পাবো জানি না। রে হোগান কোথায় আছে তা-ও জানি না। যে-কোনও মূল্যে বোতলগুলো চেয়েছিলাম আমি, আমার ডানহাত হয়েও সেই চাওয়া ভণ্ডুল করে দিয়েছ তুমি।' নিশানা করে আবারও শটগানের ট্রিগার টানল সিদোরভ। এবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল নিয়াযভের বাঁ পায়ের গোড়ালি।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল নিয়াযভ, চোখে পানি এসে গেছে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সিদোরভের পায়ের কাছে। গড়ান দিয়ে চিৎ হলো। বাঁ হাঁটু ভাঁজ করে ফেলেছে, বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরেছে হাঁটুর নীচের জায়গাটা। কিছু একটা বলতে গিয়েও বলতে পারছে না। কাঁপছে দু'ঠোঁট। প্রচণ্ড ব্যথা সহ্য করতে না পেরে চেহারাটা নীল হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

শটগানের ব্রীচ খুলল সিদোরভ। খালি শেল দুটো বের করে ফেলল মাটিতে। পকেট থেকে বের করল দুটো নতুন শেল। সময় নিয়ে ভরল শটগানে। তারপর, যেন হাতে অনন্ত সময় আছে এমনভাবে, গুলি চালিয়ে উধাও করল নিয়াযভের বাঁ হাতের কব্জি ও ডান গোড়ালি।

জবাই-করা মুরগির মতো তড়পাচ্ছে নিয়াযভ। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সিদোরভ আর মেলিখান। সিদোরভের কোনও ভাবান্তর নেই। কিন্তু মেলিখানের গলা শুকিয়ে কাঠ। বার বার ঢোক গেলার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। আবহাওয়া মোটেও গরম না, তারপরও ওর কপাল ঘেমে গেছে। জুলফি বেয়ে ঘাম নামছে। ভিজে গেছে হাতের তালু।

টানা দশটা মিনিট ছটফট করার পর স্থির হয়ে গেল নিয়াযভ।

মেলিখানের দিকে তাকাল সিদোরভ। 'নিয়াযভের চাকরিটা দিই তোমাকে?'

'জী?' বেশ কয়েকবারের চেষ্টার পর কোলাব্যাঙের আওয়াজ বের হলো মেলিখানের গলা দিয়ে।

'তুমিও তো দেখছি আরেকটা ছাগল। এক কথা দশবার বলে বোঝাতে হয়। বললাম, একটা প্রমোশনের সুযোগ এসেছে তোমার সামনে। বেতন বেশি, সুযোগসুবিধা বেশি। করবে কাজটা?'

'করবো,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল মেলিখান, কারণ কর্তার মুখের উপর না বলতে হয় না। 'কিন্তু...কিছু মনে না করলে একটা কথা বলি...আপনার ম্যানেজমেণ্ট স্টাইলটা...'

'আমার ম্যানেজমেণ্ট স্টাইল আমার মতো,' হাসল সিদোরভ, খালি শটগানে বুলেট ভরল আবার। 'কেউ যদি বলে রানা-সোহানাকে ধরতে না পারার জন্য মরতে হয়েছে নিয়াযভকে তা হলে সে বোকা। নিয়াযভ মরেছে কারণ মাসুদ রানা নামের ভয়ঙ্কর

লোকটাকে জড়িয়ে ফেলেছে সে আমাদের সঙ্গে। একটু আগেই বললাম রানার ব্যাপারে খবর নিয়েছি আমি। কোথাও হোঁচট খেলে তার শেষ না দেখে ছাড়ে না। নিয়াযভকে নাকানিচুবানি খাইয়েছে সে, আমি নিশ্চিত, দু'দিন পর হাত বাড়াবে আমার দিকেও। নিয়াযভের অপরাধ, রানার নাম জানার পরও লোকটা কোথায় আছে না আছে, কী করছে না করছে সেসবের কিছুই জানায়নি আমাকে। নিজের বুদ্ধিমতো কাজ করেছে। আমার ম্যানেজমেন্ট স্টাইল কারও ভুল ক্ষমা করে না, এ-রকম কিন্তু না। যে-ভুলগুলো শোধরানো যায় না সেগুলোর জন্য চরমতম শাস্তি দিই আমি। মনে থাকবে?'

'থাকবে,' মাথা ঝাঁকাল মেলিখান।

'আমার কী মনে হয় জানো? আমার মনে হয়, নিয়াযভ যদি প্রথমেই ওর সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে নিয়ে সোয়াম্পে না যেত তা হলে সহজেই ধরতে পারত রানাকে। ওর উচিত ছিল তিন গাধাকে নিয়ে হোটেলের কাছেই কোথাও ঘাপটি মেরে থাকা। রানা-সোহানা যেখানেই যাক, ওদেরকে ফিরতে হতোই। তখন লাফিয়ে পড়তে পারত ওদের ঘাড়ে। সোহানাকে কাবু করতে পারলে রানা সুড়সুড় করে ঢুকে পড়ত জালে। কিন্তু এই সহজ বুদ্ধিটা ওর মাথায় আসেনি। রাশান ইন্টেলিজেন্সে ছিল এতদিন, আমার চাকরি করল বারো বছর, তারপরও এত বড় একটা ভুল করল। সেটা কি ক্ষমা করা যায়, বলো?'

'না, স্যর, যায় না।'

'চমৎকার! এই তো বুঝতে পেরেছ সব। এবার চলো আমার সঙ্গে। খিদে লেগেছে, নাস্তা খাবো।'

হাঁটতে শুরু করল সিদোরভ। ওর পিছন পিছন হাঁটছে কুকুর দুটো। নিয়াযভের লাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাঁটতে শুরু করল মেলিখানও। মাথা নিচু হয়ে আছে ওর।

হঠাৎ থেমে দাঁড়াল সিদোরভ, পাঁই করে ঘুরল। মেলিখান তো বটেই, চমকে উঠল কুকুর দুটোও।

'টিভিতে সকালের খবর দেখেছ নাকি, মেলিখান?'

থতমত খেয়ে গেছে মেলিখান। 'কো...কোন্ খবর?'

হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল সিদোরভ। 'যে-কাজ করো মেলিখান, সে-কাজে সাফল্যের প্রথম শর্ত হচ্ছে খোঁজ-খবর রাখা। যা-হোক, আমেরিকার একটা চ্যানেলে দেখলাম খবরটা। ইন্টারনেটে আমেরিকার একটা নিউযসাইটও আলোচনা করছে ওটা নিয়ে। কয়েকজন পুলিশ অফিসার আর কোস্ট গার্ড মিলে নাকি মেরিল্যাণ্ড সোয়াম্পে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছে একটা জার্মান সাবমেরিন।'

মেরিল্যাণ্ড সোয়াম্পের সঙ্গে জার্মান সাবমেরিনের সম্পর্ক, অথবা এই খবরের গুরুত্ব, কোনোটাই বুঝতে পারল না মেলিখান। হাঁ করে তাকিয়ে আছে সে সিদোরভের দিকে।

'মজার ব্যাপার হচ্ছে, সাবমেরিনটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের।'

'তা-ই নাকি?' এতক্ষণে মেকি কৌতূহল ফুটে উঠেছে মেলিখানের চেহারায়। আড়চোখে বার বার তাকাচ্ছে সিদোরভের শটগানের দিকে।

পীনোন্নত বুকের জন্য যে-মেয়ে গর্ব বোধ করে, কামুক ছেলেরা লোভী দৃষ্টিতে তার দিকে বার বার তাকালে সে যেভাবে হাসে, শটগানের দিকে মেলিখানকে ঘন ঘন তাকাতে দেখে সেভাবে হাসল সিদোরভ। 'ইন্টারেস্টিং না?'

'জী, স্যর,' শব্দ দুটো বলতে গিয়ে দু'বার ঢোক গিলতে হলো মেলিখানকে, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং।'

তেরো

'নেপোলিয়নের হারানো মদভাণ্ডার?' গলা খাঁকারি দিল রানা।

'হ্যাঁ, মাসুদ ভাই। এতদিন গুজব মনে করা হতো ব্যাপারটা। কিন্তু আপনারা যা আবিষ্কার করেছেন তাতে মনে হচ্ছে গুজব নয়, ওটা সত্যি হতেও পারে।'

'আচ্ছা অপি, নেপোলিয়নের ব্যাপারে কিছু জানাতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে অনেক কথাই বলা যায়। কিন্তু সেগুলো আপনাদের কোনও কাজে লাগবে বলে মনে হয় না। বরং তাঁর ক্যারিয়ার নিয়ে দু'-চারটে কথা বলি। নেপোলিয়নের প্রথম সাফল্য বন্দরনগরী টুলন দখল। এ-সময় তিনি পদোন্নতি পেয়ে বিগ্রেডিয়ার জেনারেল হন। তারপর সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। পরের কয়েকটা বছরে একের পর এক যুদ্ধ করেন অস্ট্রিয়ায়। সবগুলোতেই জয়লাভ করে জাতীয় বীর হিসেবে ফেরেন প্যারিসে। এরপর অভিযান চালান মিশরে। কিন্তু খুব একটা সুবিধা হয় না। দেশে ফিরে ক্যু করে ক্ষমতা দখল করেন, হয়ে যান নতুন ফরাসি সরকারের প্রথম কনসল। বছর খানেক পর রওনা দেন দ্বিতীয় ইটালিয়ান অভিযানে, পেনাইন আল্পসের দিকে। দেশে ফিরে পাকাপোক্ত করেন নিজের ক্ষমতা, অঘোষিত একনায়কতন্ত্র শুরু হয় তখন। কিন্তু রাশা আক্রমণ করতে গিয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করেন। পরিকল্পনামতো কিছুই

করতে পারেননি তিনি। উল্টো মারা পড়ে তাঁর গ্র্যাণ্ড আর্মির অনেক সদস্য। কিন্তু তাতেও শিক্ষা হয়নি যুদ্ধবাজ লোকটার। প্রাশা, স্পেন এবং এমনকী দেশের মাটিতেও লড়াই করতে হয় তাঁকে। পতন ঘটে প্যারিসের। সিনেট ঘোষণা করে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য শেষ। অষ্টাদশ লুইয়ের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দেন তিনি। মাসখানেক পর তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হয় এলবা দ্বীপে। তাঁর স্ত্রী আর পুত্র তখন পালিয়ে যায় ভিয়েনায়।'

একটানা বলে হাঁপিয়ে গেছে অপি। ল্যাপটপের স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে নীচের দিকে তাকিয়ে আছে সে। পাতা উল্টানোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত কোনও নোটবুক বা বই ঘাঁটছে। কিছুক্ষণ পর আবার বলতে লাগল, 'পুত্রসন্তান জন্ম দিতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রথম স্ত্রী জোসেফিনকে তালাক দেন নেপোলিয়ন। পরে বিয়ে করেন অস্ট্রিয়ার সম্রাটের মেয়ে মেরি লুইসকে। এই মহিলার গর্ভে একটা ছেলে হয়। এদের কথাই বলেছি একটু আগে।'

'বুঝলাম,' মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'তারপর?'

'বছরখানেক নির্বাসনে থাকার পর পালাতে সক্ষম হন নেপোলিয়ন। ফ্রান্সে ফিরে এসে সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। খবর পেয়ে সিংহাসনের মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে যান অষ্টাদশ লুই। তখন আবার ক্ষমতায় বসেন নেপোলিয়ন। কয়লা ধুলে ময়লা যায় না, আবার যুদ্ধ—তিন মাসের মাথায় ওয়াটার লু'র যুদ্ধে ব্রিটিশ আর প্রাশানদের মুখোমুখি হতে হয় নেপোলিয়নকে। ফলাফল: আবারও ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন তিনি, আবারও তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এবার সেইন্ট হেলেনা দ্বীপে। জীবনের শেষ ছ'টা বছর ওখানেই কাটিয়ে আঠারো শ' একুশ সালে মারা যান তিনি।'

'পাকস্থলীর ক্যান্সারে,' বলল রানা।

'অনেকে তা-ই মনে করে। কিন্তু কোনও কোনও ইতিহাসবিদ বলেন, আসলে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল নেপোলিয়নকে। স্লো

পয়যন। আর্সেনিক।'

'বুঝলাম,' বলল সোহানা। 'কিন্তু এসবের সঙ্গে হারানো মদভাণ্ডারকে জোড়া দিলে কীভাবে, অপি?'

'আরেকটা কাহিনি বলি তা হলে,' বলে চলল অপি, '১৮৫২ সাল। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে লিওনেল অ্যারিয়েন নামের এক ফরাসি চোরাকারবারি। মরার আগে নিজের জীবনের একটা গল্প শোনাচ্ছে সঙ্গীসাথীদের। বলছে, ১৮২০ সালের জুন মাসে, মানে নেপোলিয়নের মৃত্যুর এগারো মাস আগে সম্রাটের এক এজেন্টের সঙ্গে নাকি দেখা হয় ওর। এই এজেন্টকে মেজর বলে ডাকত সবাই। যা-হোক, অ্যারিয়েন আর ওর জাহাজটা ভাড়া করে মেজর। শর্ত ছিল, সেইন্ট হেলেনা দ্বীপে যেতে হবে অ্যারিয়েনকে। ওখান থেকে কিছু মালসামান নিতে হবে। সব ঠিকমতো নিতে পারলে কোথায় ডেলিভারি দিতে হবে তা জানানো হবে।

'অ্যারিয়েনের বক্তব্য অনুযায়ী, ছ'সপ্তাহ পর সেইন্ট হেলেনা দ্বীপে গিয়ে হাজির হয় ওরা। ঢুকে পড়ে একটা খাঁড়িতে। দেখতে পায় একটা নৌকা, তাতে মাত্র একজন লোক। সঙ্গে দু'ফুট লম্বা আর এক ফুট চওড়া একটা কাঠের-বাক্স। নৌকায় গিয়ে ওঠে মেজর, অ্যারিয়েনের দিকে উল্টো ঘুরে ডালা খুলে ভিতরের জিনিসপত্র ঠিকঠাক আছে কি না দেখে। তারপর ভালোমতো আটকে দেয় ডালাটা। এরপর হঠাৎ করেই কোমরের খাপ থেকে বের করে তলোয়ার, নৌকার লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওকে শেষ করে দেয়। লোকটার পায়ের সঙ্গে নোঙর বেঁধে লাশটা ফেলে দেয় পানিতে। তলায় ফুটো করে ডুবিয়ে দেয় নৌকাটা।

'এ-পর্যন্ত বলে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে অ্যারিয়েন। কাজেই ওই বাক্সে কী ছিল, কিংবা সে আর মেজর মিলে বাক্সটা কোথায় নিয়ে গিয়েছিল তা আর জানা যায়নি ওর মুখ থেকে। এবং

ল্যাকানাউ না থাকলে কোনওদিন জানা যেতও না।'

'ল্যাকানাউ?' ভ্রূ কুঁচকাল রানা। 'মানে নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত আঙুরক্ষেত?'

'ঠিক,' বলল অপি। 'কিন্তু ওই অ্যারিয়েন আর মেজর যখন হেলেনায় যাচ্ছে তখন কে বা কারা যেন আগুন লাগিয়ে দেয় ল্যাকানাউয়ে। পুড়ে ছাই হয়ে যায় সব। এমনকী লবণ আর ক্ষার ছিটিয়ে নষ্ট করে ফেলা হয় ক্ষেতের মাটি।'

'সব বীজও নষ্ট হয়ে যায়?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'হ্যাঁ। আশ্চর্যের ব্যাপার কী, জানেন? নেপোলিয়নের আদেশে ক্রস-পলিনেশন করে ল্যাকানাউ বীজ উদ্ভাবন করেছিল আরখামবল্ট। অ্যামিয়েন্স, প্যারিস আর অরলিয়েন্সের কয়েকটা গোপন জায়গায় সেগুলো লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থাও করেছিলেন নেপোলিয়ন। কিন্তু একদিকে তাঁর ক্ষেতে আগুন লাগল আরেকদিকে বীজগুলোও উধাও হয়ে গেল রহস্যজনকভাবে। ধারণা করা হয় ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে সব বীজ।'

'তা হলে পুরো ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে?' জানতে চাইল সোহানা।

'এ-রকম,' বলল রানা, 'সেইন্ট হেলেনায় নির্বাসনে থাকার সময় কোনও বার্তাবাহক বা কোনও কবুতর বা অন্য কোনও উপায়ে হেনরি আরখামবল্টের কাছে খবর পাঠান নেপোলিয়ন। ল্যাকানাউ মদের শেষ-চালান বানিয়ে সেইন্ট হেলেনায় পাঠাতে বলেন এবং আঙুরক্ষেত, ক্ষেতের মাটি এমনকী সব বীজও বরবাদ করে দিতে বলেন। এর কিছুদিন পর, সম্ভবত নেপোলিয়নের ইচ্ছাতেই, রহস্যময় সেই মেজর মদের বোতলগুলো নিয়ে উধাও হয়ে যায় অজানা কোথাও।'

নীরবতা। মদের বোতলটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সোহানা। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল অপিকে, 'এটার দাম কত

হতে পারে?'

'যদি বারোটা বোতল অক্ষত অবস্থায় বাক্সের ভিতরে থাকত তা হলে কমপক্ষে নয় বা দশ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু তা তো নেই। কাজেই...আমার অনুমান...প্রতিটা বোতল ছয় কি সাত লক্ষ ডলার।'

চোখাচোখি হলো রানা আর সোহানার মধ্যে। সোহানার না করা প্রশ্নটা বুঝে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা, নিচু গলায় বলল, 'আমিও তা-ই ভেবেছি। কারও হয়ে কাজ করছে।'

'কী বললেন, মাসুদ ভাই?' বলল অপি। 'বুঝতে পারলাম না।'

'বললাম লেগে থাকো ব্যাপারটা নিয়ে। যতটা পারো খোঁজখবর করতে থাকো এই বোতল, হেনরি আরখামবল্ট অথবা ওই মেজরের ব্যাপারে। খুঁটিনাটি সব জানতে চাই আমি, কিছুই যেন বাদ না যায়।'

'চেষ্টা করবো,' হাসল অপি। 'আরেকটা কথা, মাসুদ ভাই। 'বোতলের লেবেলে মৌমাছির যে-ছবিটা আছে তা আঁকা হয়েছে কালি দিয়ে, আগেও বলেছি বোধহয়।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তো?'

'এই কালি এসেছে লিগুইরিয়ান সাগরের টাসকেন দ্বীপপুঞ্জ থেকে।'

'টাসকেন দ্বীপপুঞ্জ?' চোখ পিটপিট করল রানা। 'মানে যেখানে এলবা দ্বীপ অবস্থিত?'

'হ্যাঁ। এবং এই এলবা দ্বীপেই প্রথমবার নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল নেপোলিয়নকে।'

'তারমানে এলবায় থাকার সময় এ-রকম কোনওকিছুর প্ল্যান করছিলেন নেপোলিয়ন?' জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'নাকি সেইন্ট হেলেনায় যাওয়ার সময় সঙ্গে করে বিশেষ ওই কালি নিয়ে

গিয়েছিলেন তিনি?'

মাথা নাড়ল অপি। 'জানি না। সম্ভবত জানতে পারবো না কখনও। তারপরও চেষ্টা করে যাবো।'

'ঠিক আছে,' ল্যাপটপের স্ক্রিন নামিয়ে দিয়ে সোহানার দিকে তাকাল রানা।

'তুমি শিওর অন্য কারও হয়ে কাজ করছে কাটামুখ?'

'শিওর। ওর কাজকর্ম দেখে প্রথম থেকেই কথাটা মনে হয়েছে আমার।'

'পর্দার আড়ালে থাকা লোকটা কী চায় তা হলে? সামান্য মদের বোতল দিয়ে কী করবে সে?'

'তোমার প্রশ্নের জবাব, পর্দার আড়ালের লোকটার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে জানতে পারবো কি না জানি না,' মুচকি হাসল রানা। 'তবে চেষ্টা করে যাবো। এখনও কয়েকটা সূত্র আছে আমাদের হাতে। যেমন এগন বল্ডেউইন। আমাদের জানতে হবে কবে কোত্থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সে। তা হলে ওর সাবমেরিনে নেপোলিয়নের মদের বোতল কী করে গেল জানতে পারবো আশা করি।'

এগনের ডায়েরি আর ইউ.এম. থার্টি ফোরের লগবুক নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত খাটাখাটনি করল দু'জনে।

ডায়েরি পড়ছে আর নোট করছে সোহানা। ওর ধারণা এর ফলে এগন সম্পর্কে আরও ভালোমতো জানতে পারবে। আর রানার দুই চোখ যেন আঠার মতো সেঁটে গেছে লগবুকের পাতায় পাতায়।

'এই যে, শোনো,' পিঠ সোজা করে হাই তুলল সোহানা, হাতের কলম দিয়ে দু'বার বাড়ি মারল ডায়েরিতে, 'সম্ভবত এটাই খুঁজছিলাম আমরা। মাইকেল সেবাস্টিয়ান। এই লোকের ব্যাপারে

কী লিখেছে এগন, পড়ে শোনাচ্ছি: "৩ অগাস্ট, ১৯৪৪। ভাইয়ের মতো হাত ধরাধরি করে সাবমেরিনে উঠেছি আমি আর মিকি। আমাদের অভিযান শুরু হচ্ছে আগামীকাল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। যেন প্রমাণ করতে পারি, আমরাও আদেশ পালনে সক্ষম।"'

'ভাইয়ের মতো হাত ধরাধরি করে,' বলল রানা, 'এর মানে মাইকেল সেবাস্টিয়ানও ক্রিগ্‌সমেরিনে ছিল। যদি ধরে নিই এগন ছিল ইউ.এম. থার্টি ফোরের ক্যাপ্টেন তা হলে মাইকেল বা মিকি কীসের ক্যাপ্টেন ছিল? লুকাস, মানে মাদারশীপের?'

'হতে পারে। এক কাজ করি। অপিকে একটা মেইল পাঠিয়ে দিই। মাইকেল সেবাস্টিয়ানের পরিচয় জানিয়ে বলি ওর ব্যাপারে যা যা জানতে পারে সব আমাদেরকে জানাতে। ১৯৪৪ এর গ্রীষ্মে অথবা শরৎকালে জার্মানির কোনও এক যুদ্ধজাহাজের ক্যাপ্টেন ছিল লোকটা। কি, বলবো?'

কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা।

অপিকে ই-মেইল পাঠিয়ে আবার কাজে মন দিল সোহানা। ডেস্ক ছেড়ে উঠে বারান্দায় গিয়ে বসল রানা। সিগারেট টানতে লাগল একটানা। বেশ কিছুক্ষণ পর উঠে গিয়ে ফ্রিজ থেকে বের করল পাউরুটি, ডিম, মাংস আর মাখন। সময় নিয়ে স্যাণ্ডউইচ বানাল নিজের আর সোহানার জন্য। ওগুলো নিয়ে স্টাডিরুমে ঢুকছে, এমন সময় পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় না ঘুরিয়েই বলে উঠল সোহানা, 'ঠিক সময়েই এসেছ। নেটে এসেছে অপি। কথা বলতে চায়।'

ল্যাপটপের সামনে গিয়ে বসল রানা।

অপি বলল, 'অনেক কিছু জানতে পেরেছি সেবাস্টিয়ানের, মানে, ওর জাহাজের ব্যাপারে। বিস্তারিত বলবো, না সংক্ষেপে?'

'আপাতত সংক্ষেপেই বলো,' বলল রানা। 'পরে দরকার হলে

বিস্তারিত জেনে নেবো।'

'ঠিক আছে। সেবাস্টিয়ানের জন্ম ১৯১০ সালে, মিউনিখে। ১৯৩৪ সালে যোগ দেয় ক্রিগ্স্মেরিনে। সময়মতো প্রমোশন পেয়েছে প্রতিবার। ওর বিরুদ্ধে কোনও ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশনের রেকর্ড নেই। ১৯৪৪ সালে অক্সিলারি শিপ ম্যাক্সিমিলানের ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব দেয়া হয় ওকে। মূলত আটলাণ্টিক মহাসাগরে চক্কর দিয়ে বেড়াত জাহাজটা। জার্মানির নেভাল আর্কাইভের ডেটাবেইস ঘেঁটে জেনেছি, এই ম্যাক্সিমিলান আসলে ছিল একটা ফ্রেঞ্চ ফেরি। ১৯৪০ সালে এটা কব্জা করে মাইন লেয়ারের কাজে লাগায় জার্মানরা। ১৯৪৪ এর জুলাইয়ে এটাকে "স্পেশাল ডিউটিতে" পাঠানো হয়। কিন্তু স্পেশাল ডিউটিটা কী, সে-ব্যাপারে বিস্তারিত কিছুই জানতে পারিনি।'

'মাইন লেয়ার?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে সোহানার। 'ও-রকম একটা ফেরিকে...'

'কেন অক্সিলারি শিপ বানানো হলো, তা-ই তো?' সোহানার মুখের কথা কেড়ে নিল অপি। 'তখন সমানে যুদ্ধ চলছে। জার্মানির অবস্থা ভালো না। কী জলে কী স্থলে একের পর এক লড়াইয়ে হারতে হারতে মরিয়া হয়ে উঠেছে ওরা। ইউ.এম. থার্টি ফোর বহনের কাজে যেসব অক্সিলারি শিপ ব্যবহার করা হতো সেগুলোর বেশিরভাগ হয় ডুবে গেছে নয়তো সৈন্য পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল। সেজন্যই বাধ্য হয়ে কাজটা করতে হয়েছে ওদেরকে।'

নীরবতা। স্যাণ্ডউইচের প্লেটটা সোহানার দিকে ঠেলে দিল রানা।

'"সার্ভাইভার্স অভ দ্য ম্যাক্সিমিলান" নামে একটা ওয়েবসাইটের খোঁজ পেয়েছি আমি,' বলে চলল অপি। 'পড়ে মনে হচ্ছে, ১৯৪৪ এর সেপ্টেম্বরে ভার্জিনিয়া বীচের অদূরে কোথাও

ইউ.এস. নেভির একটা ডেস্ট্রয়ার হামলা চালায় ওটার উপর। পুরোপুরি ধ্বংস না হলেও অকেজো হয়ে যায় জাহাজটা।'

'ভার্জিনিয়া বীচ,' বিড়বিড় করছে সোহানা, 'মেরিল্যাণ্ড সোয়াম্প থেকে সত্তর মাইল দক্ষিণে...'

'ওই হামলায় মারা পড়ে ম্যাক্সিমিলানের অর্ধেকের বেশি ক্রু,' বলছে অপি। 'পরে জাহাজটাকে নিয়ে আসা হয় নরফোকে। যুদ্ধ শেষে বিক্রি করে দেয়া হয় গ্রীসের কাছে।'

'কিন্তু সেবাস্টিয়ানের কী হলো?' জানতে চাইল রানা।

'এখন পর্যন্ত জানতে পারিনি। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তবে একটা তথ্য আমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে।'

'কী?'

'ম্যাক্সিমিলানের সার্ভাইভারদের মধ্যে একটা লোকের নাম ছিল ফিলিক্স। ওর এক নাতনি বেশ কিছু ব্লগ লিখেছে জাহাজটার ব্যাপারে, ওই ওয়েবসাইটেই। মার্কিন ডেস্ট্রয়ার হামলা করার আগে কোথায় কী করছিল জাহাজটা, সে-ব্যাপারেও বর্ণনা আছে। মেয়েটার দাবি, দাদার ডায়েরি ঘেঁটে এসব তথ্য যোগাড় করেছে সে।'

'বুঝলাম,' মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'কিন্তু এখানে ইন্টারেস্টিং-এর কী আছে?'

'হামলার মাসখানেক আগে, অর্থাৎ ১৯৪৪ এর জুলাই-অগাস্টের দিকে রিফিটিং-এর জন্য গোপন কোনও জার্মান নৌঘাঁটিতে ছিল জাহাজটা। কাজ নেই, তাই স্থানীয় মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়াচ্ছিল ক্রুরা।'

'কোন্ জায়গায়?'

'বাহামা দ্বীপপুঞ্জে। নামঃ রাম কে (Rum Cay)।'

'আচ্ছা অপি, ম্যাক্সিমিলানে কি রিফিটিং-এর সব ব্যবস্থা ছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না।'

'একটা ফেরি...' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে রানার দিকে তাকাল সোহানা, 'কতই বা বড় হবে? একটা সাবমেরিন বহন করার মতো কি...'

'হয়তো বেশি কিছু করতে হতো না ম্যাক্সিমিলানকে,' রানার হয়ে জবাব দিল অপি। 'ডেকের নীচে কোনও কায়দায় বেঁধে রাখা হতো ইউ.এম. থার্টি ফোরকে। বেশি দরকার হলে তারপুলিন দিয়ে ঢেকে রাখত।'

'কিন্তু রিফিটিং-এর দরকার থাকলে রওনা দেয়ার আগে করল না কেন?'

'হয়তো বেশি তাড়াহুড়ো ছিল।'

ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাবছিল রানা। ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকাল একবার, তারপর যেন জরুরি কিছু মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে টেনে নিল ইউ.এম. থার্টি ফোরের লগবুকটা। একটার পর একটা পাতা উল্টাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর থামল নির্দিষ্ট জায়গায়, বলে উঠল, 'এই যে, পেয়ে গেছি! রাম কে নামটা শোনার পরই কী যেন টিকটিক করছিল মাথার ভিতরে। লগবুকের শুরুর দিকে ওটা লিখেছে এগন। তবে শুধু আদ্যাক্ষর ব্যবহার করেছে—আর. সি.।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা। ঠোঁটের কোনায় মুচকি হাসি।

'হুঁ,' লগবুকের পাতায় দু'বার টোকা দিল রানা, 'ঠিকই অনুমান করছ। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য রাম কে। যত জলদি পারি নাসাউ-এর ফ্লাইট ধরছি আমরা।'

চোদ্দ

নাসাউ, বাহামা দ্বীপপুঞ্জ।

রিসোর্টের নাম ব্লু ওশান। স্বামী-স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে একটা বিলাসবহুল রুমের চাবি বুঝে নিচ্ছে রানা, এমন সময় ওর সেলফোনটা ভাইব্রেট করে উঠল। মেসেজ দিয়েছে কেউ।

এখন যে-নম্বরটা ব্যবহার করছে রানা তা জানে হাতেগোনা কয়েকজন। যেমন মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান। সোহেল। এবং রানা ইন্টেলিজেন্সের দু'-চারজন।

সুতরাং মেসেজটা জরুরি।

চাবি আর স্যুটকেস সোহানার হাতে বুঝিয়ে দিল রানা। লিফটের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'তুমি যাও। আমি আসছি।' সোহানাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লবির দিকে হাঁটা ধরল।

লবির একদিকের দেয়াল ঘেঁষে সারি করে কতগুলো আরামদায়ক সোফা বসানো আছে। প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে একটাতে বসে পড়ল রানা। বাটন টিপতেই আলো জ্বলে উঠল, স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে: "মেসেজ ফ্রম সোহেল"।

মেসেজটা পড়ল রানা:

"কী রে শালা কোনও খবর নেই কেন? সোহানাকে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে চুটিয়ে ইয়ে করছিস, না? শালা তোর স্বভাব গেল না? ওসব ইয়ে-টিয়ে বন্ধ করে যত জলদি পারিস যোগাযোগ কর্।'

সেলফোনের স্পিড ডায়াল চেপে সোহেলকে ফোন করল

রানা। রিংটোন হিসেবে পুরনো দিনের একটা গান ব্যবহার করছে সোহেল। অনেকদিন পর গানটা শুনতে ভালোই লাগছে রানার। কিন্তু দুটো লাইন শেষ হতে-না-হতেই রিসিভ করল সোহেল, 'কী রে শালা, কী খবর তোর?'

'ভালো। যত জলদি পারি যোগাযোগ করতে বলেছিস কেন?' কাজের কথায় চলে গেল রানা।

'কারণ দু'দিন আগে তোর এস.এম.এস. পেয়ে কাটামুখের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে শুরু করি। খবর যা পেয়েছি তা তোর জন্য সুবিধার না।'

'যেমন?'

'ওই লোকের অনেকগুলো নাম। কোন্‌টা আসল জানতে পারিনি এখনও। প্রতিটা নামের বিপরীতেই একাধিক ক্রেডিট কার্ড আছে। এ-রকম একটা কার্ড দিয়েই ভিক্সবার্গ হিলে পাওয়ারবোট ভাড়া করে সে। আমার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, নিয়াযভ নামটাই বেশি ব্যবহার করে লোকটা। একসময় কাজ করত রাশান স্পেশাল ফোর্সে। কর্মজীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছে আফগানিস্তান আর চেচনিয়ায়। মেলিখান নামের এক লোকের সঙ্গে একসঙ্গে অ্যাকশনে দেখা গেছে অনেকবার। লোকে বলে, মেলিখান নাকি নিয়াযভের ডান হাত। আজ থেকে দশ-বারো বছর আগে দু'জনেই চাকরি ছেড়ে দেয়, অনেকটা ফ্রিল্যান্সারদের মতো কাজ করতে শুরু করে। সোজাকথায় মোটা টাকার বিনিময়ে ভাড়া খাটতে শুরু করে। কাটামুখ, মানে নিয়াযভের সঙ্গে তো পরিচয় আছেই তোর, মেলিখানের একটা ছবি ই-মেইল করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভালোমতো চিনে নিস। আমি নিশ্চিত আজ না হলে কাল দেখা পাবি ওই লোকের।'

'এখন কার হয়ে কাজ করছে এরা?'

'যার হয়ে কাজ করছে তার নামটা জানতে পেরেছি বলেই তো বলছি অবস্থা সুবিধার না।'

কিছু বলল না রানা। সোহেলের বাকি কথার জন্য অপেক্ষা করছে।

'ইভান সিদোরভ। কি, পরিচিত মনে হয়?'

না, সিদোরভ নামটা শুনে রানার গলা শুকিয়ে গেল না, বুকের ভিতরে কাঁপন ধরল না, তলপেটে সুড়সুড়িও জাগল না। কিন্তু অস্বস্তি বোধ করছে ও। চাপা গলায় বলল, 'সিদোরভ? হ্যাঁ, শুনেছি ওই লোকের নাম।'

'ভালো। তুই যদি বলতিস শুনিসনি, তা হলে আশ্চর্যই হতাম। লোকটা ইউক্রেনের মাফিয়া জগতের মুকুটহীন সম্রাট। খারসোনেসাস কলোনির হোমড়াচোমড়া লোকেরা ওর স্বাস্থ্য কামনা করে শ্যাম্পেন খায়। ওর চালচলন জমিদারের মতো। ঘন ঘন পার্টি দেয়। প্রায় প্রতি সপ্তাহান্তে নিজের এলাকায় শিকার করে। বাঘা বাঘা রাজনীতিবিদ, ফিল্মপাড়ার নামীদামি সেলিব্রেটি, ইউরোপের বিখ্যাত ধনকুবেরদের সঙ্গে ওর ওঠাবসা...অথবা উল্টোটাও হতে পারে...ওর সঙ্গে রাজনীতিবিদ, সেলিব্রেটি আর ধনকুবেরদের দহরম মহরম। ওই লোকের বিরুদ্ধে অপরাধের কোনও প্রমাণ নেই কারও কাছে। কিন্তু ডজন ডজন খুনের আসামি হিসেবে ওকে সন্দেহ করে অনেকেই। করলে কী হবে, দুনিয়ার নিয়মই হচ্ছে গডফাদাররা সবসময় আড়ালে থাকে, যা শাস্তি হওয়ার চুনোপুঁটিদের হয়।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহেল। 'শুনলে আশ্চর্য হবি, সিদোরভের অতীত কিন্তু বর্তমানের ঠিক উল্টো।'

'যেমন?'

'এখন সে মানুষ মেরে খায়, অথচ এককালে ছিল সংগ্রামী মানুষদের নেতা।'

'তা-ই?'

'হ্যাঁ, তা-ই। অনেক আগের কথা। রাশা আর ইরানের বর্ডারে তখন যুদ্ধ চলছে। রাশানদের সন্দেহের তালিকায় স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে তুর্কমেনিস্তানের কিছু গ্রামবাসী। দোষ করুক বা না করুক, ওদের ওপর যার-পর-নাই অত্যাচার চালায় রাশানরা। পরিস্থিতির শিকার হয় সিদোরভ আর ওর পরিবার। সে তখন কিশোর, জান বাঁচাতে পালিয়ে যায়। আর ওর পরিবারের বাকিরা মারা পড়ে। সেদিনের সেই কিশোরই পরে হয়ে যায় "কোপেটড্যাগ ফাইটার্স" বা "আঁধারের আততায়ী" নামে পরিচিত দুর্ধর্ষ এক গেরিলাবাহিনীর নেতা। এদের অ্যামবুশে পাখির মতো মরতে থাকে রাশানরা। শেষে সব ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আচ্ছা রানা, ছুটি নিয়ে তুই গেলি আমেরিকায়, সঙ্গে সোহানাকে কেন নিলি তা বুঝতে আমাদের কারও বাকি নেই। কিন্তু একটা কথা বুঝলাম না। এই সিদোরভের ভাড়াটে খুনি নিয়াযভ বা মেলিখানের সঙ্গে তোর কাটাকাটিটা হচ্ছে কেন?'

উত্তরটা সংক্ষেপে দিল রানা। তারপর বলল, 'আমার মনে হয় আমি যে-জিনিসের পিছনে লেগেছি, সিদোরভও সে-জিনিসের পিছনেই লেগেছে। এবং যে-কোনও মূল্যে হাসিল করতে চায়।'

'নেপোলিয়নের হারানো মদ্যভাণ্ডার?' সোহেলের কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের একটা সাবমেরিন? কেমন বেখাপ্পা মনে হচ্ছে না?'

'হ্যাঁ, হচ্ছে,' স্বীকার করে নিল রানা। 'কিন্তু আমার বিশ্বাস এগুলোর মধ্যে কোনও-না-কোনও যোগসূত্র আছেই। সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটা খুঁজে বের করবো।'

'কর্। তোকে বাধা দেয়া আমার কাজ না। কিন্তু সাবধানে থাকবি। সিদোরভ ভয়ঙ্কর লোক। এ-পর্যন্ত ভাগ্য প্রতিটি কাজে সাহায্য করেছে তোকে, পরে না-ও করতে পারে।'

'জানি। এবং তুইও নিশ্চয়ই জানিস, সবসময় ভাগ্যের সাহায্য নিতে পছন্দ করি না আমি, বন্ধুদেরও সাহায্য নিই।'

'ঠিক আছে। যদি আমি সাহায্য করতে চাই, তা হলে নিবি?'

'কী সাহায্য?'

'তুই যেখানে আছিস তার কাছেপিঠে আমার পরিচিত এক লোক আছে। আমার নাম করে ওর কাছে যে-কোনও কিছু চাইলে পাবি।'

'কী নাম ওই লোকের? এখানে কোথায় থাকে সে?'

'তোর হাতের কাছে কাগজ-কলম আছে? থাকলে লিখে নে ঝটপট।'

এদিক-ওদিক তাকাল রানা। কাছেই ছোট একটা সাইড-টেবিলের উপর দেখা যাচ্ছে একটা কলম আর কিছু রাইটিং পেপার। উঠে গিয়ে টেবিলটার পাশে বসল রানা, একটা প্যাড টেনে নিয়ে কলমটা তুলে নিল হাতে। 'বলুন, স্যর, আপনার ডিকটেশন নেয়ার জন্য আমি খাতা-কলম নিয়ে তৈরি।'

'শালা,' বলে একটা গাল দিল সোহেল। তারপর একটা নাম আর ঠিকানা বলল। 'এই লোককে বিশ্বাস করি আমি। প্রয়োজন হলে গিয়ে দেখা করতে পারিস এর সঙ্গে।'

'ঠিক আছে, স্যর, প্রয়োজন হলে যাবো।'

'সবকিছু এত হালকাভাবে নিতে পারিস কীভাবে তুই, রানা?'

'কারণ আমি সবসময় আমার প্রতিপক্ষের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকার চেষ্টা করি। এবারও সে-চেষ্টা করবো ঠিক করেছি।'

সোহেল যে-লোকের ঠিকানা দিয়েছে তার নাম লুইজি। নাসাউয়ের ডাউনটাউনে একটা জুতা-মেরামতের দোকান আছে লোকটার। জায়গামতো গিয়ে দেখা গেল সে অপেক্ষা করছে

রানা-সোহানার জন্য। তারমানে সোহেল নিশ্চয়ই যোগাযোগ করেছে ওর সঙ্গে।

হ্যাণ্ডশেক করার সময় রানাকে বলল লুইজি, 'সোহেল আমার পুরনো বন্ধু। আপনার কথা বলেছে আমাকে। তবে আপনি যে এখানে আসবেন সে-ব্যাপারে সন্দেহ ছিল ওর। আপনি নাকি বেশিরভাগ সময় অন্যের সাহায্য নিতে চান না।'

মুচকি হাসল রানা। 'কথাটা ঠিক না। নিজের কাজ নিজেই করতে পছন্দ করি আমি। যদি দেখি অন্যের সাহায্য নিলে কাজটা সহজ হবে অথবা সময় বাঁচবে, সেক্ষেত্রে...। আমি কেন এসেছি, জানেন নিশ্চয়ই?'

মাথা ঝাঁকিয়ে লুইজি বলল, 'আসুন।'

সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। দরজার গ্লাসে ঝুলছে "আউট ফর লাঞ্চ" সাইন, ওটা উল্টে দিল। ফিরে এসে হাঁটা ধরল দোকানের ভিতরের দিকে, পিছু নিল রানা-সোহানা।

ভিতরে ছোট একটা কামরা। আসবাবপত্র দেখে বোঝা যাচ্ছে এখানে কেউ থাকে। এককোনায় মেঝেতে বিছানো আছে তোষক-জাজিম। কভার ছাড়া তেল চিটচিটে একটা বালিশ আছে। পায়ের কাছে খাটো একটা টেবিল, তাতে পুরনো আমলের বড় একটা টেলিভিশন। ওটার ঠিক উপরেই দেয়ালে ঝুলছে একটা স্টাফ-করা হরিণের-মাথা। বেচারা প্রাণীটার একটা চোখ উধাও।

তোষক-জাজিমের ঠিক উল্টোদিকে, ঘরের আরেককোনায় একটা গ্যাসস্টোভ আর কিছু রান্নার সরঞ্জাম। হাতলভাঙা একটা প্যান বসানো আছে স্টোভে। কিছু শাকসজী কেটে রাখা হয়েছে একটা পাত্রে। আরেকটাতে কয়েক টুকরো মুরগির-মাংস। যে-দরজা দিয়ে ঢুকেছে ওরা তার পাশেই জং-ধরা একটা ফ্রিজ চলছে অনেক আওয়াজ করে।

তোষক-জাজিমের দিকে এগিয়ে গেল লুইজি। পায়ের কাছটা গুটিয়ে তুলে দিল বালিশের কাছে। এবার বর্গাকৃতির একটা পাটাতন দেখা যাচ্ছে। ওটা সরাল লুইজি। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল। নীচে বেইযমেণ্টে জ্বলছে আলো, আলোকিত হয়ে আছে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ। ঘাড় কাত করে সেদিকে ইশারা করল লুইজি।

ওর পিছু নিয়ে বেইসমেণ্টে নেমে এল রানা-সোহানা।

জ্বলন্ত বাল্বটার ঠিক নীচেই একটা বেঞ্চ। সেটার উপরে এবং চারপাশে ছড়িয়েছিটিয়ে আছে অনেকগুলো বাতিল জুতো। বেঞ্চের উপরে, কতগুলো সোলের সঙ্গে নিতান্ত অবহেলায় পড়ে আছে একটা .৩৮ রিভলভার।

'সোহেল বলেছে আপনাদের আগ্নেয়াস্ত্রের দরকার হতে পারে।'

কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা। কাটামুখের কাছ থেকে যে-রিভলভারটা কেড়ে নিয়েছিল ওরা এবং যে-ল্যুগারটা পেয়েছিল ইউ.এম. থার্টি ফোর সাবমেরিনে, দুটোই রেখে এসেছে নিউইয়র্কে, রানার অ্যাপার্টমেণ্টে।

'চালাতে পারেন নিশ্চয়ই?' রানাকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল লুইজি।

'পারি,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা।

'ভালো,' মুচকি হাসল লুইজি। 'রিভলভারটার গায়ে কোনও সিরিয়াল নম্বর নেই। কাজেই ট্রেস করার উপায়ও নেই। আপনাদের কাজ শেষ হলে এটা ফেলে দিলে কোনও সমস্যা হবে বলে মনে হয় না।' একটা তোয়ালে দিয়ে পেঁচিয়ে রিভলভারটা বাড়িয়ে ধরল সে রানার দিকে।

অস্ত্রটা নিল রানা।

সোলগুলো সরিয়ে এবার এক বাক্স বুলেট বের করল লুইজি।

ওটাও দিল রানাকে। বলল, 'পঞ্চাশটা থাকার কথা। যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলি?'

'বলুন,' বাক্স খুলে ভিতরের বুলেটগুলো দেখছে রানা।

'এই রিভলভার দিয়ে যত খুশি গুলি করতে চান, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু কাউকে খুন করবেন না। প্লিয।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে লুইজির দিকে তাকাল রানা। 'কেন?'

'পুরনো বন্ধুর খাতিরে আপনাদেরকে একটা রিভলভার দিচ্ছি। পরে যদি জানতে পারি আমার দেয়া অস্ত্র কারও জান নিয়েছে, অনুতাপের সীমা থাকবে না। একসময় এসব কাজ আমিও করতাম। কিন্তু ছেড়ে দিয়েছি অনেক বছর হলো। তাই বলছিলাম...'

লুইজির কাঁধে হাত রাখল রানা। 'আমি খুনি নই। তবে মানুষ মেরেছি। অবশ্য সেটা করেছি হয় আত্মরক্ষার তাগিয়ে, নয়তো অন্য কাউকে বাঁচাতে। চিন্তা করবেন না, লুইজি, এই রিভলভার হয়তো কাজে না-ও লাগতে পারে আমাদের।'

নিষ্পাপ হাসি হাসল লুইজি।

আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করল রানা, লোকটার চোখ চিকচিক করছে। কোমল গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কত দাম দিতে হবে এটার জন্য?'

'এক পয়সাও না,' এবার রানার কাঁধে হাত রাখল লুইজি। 'সোহেলের বন্ধু আমার পর হলো নাকি?'

ঘণ্টা তিনেক পর।

কোস্টরোড থেকে সরিয়ে এনে ছোট্ট পার্কিংলটে ভাড়া করা গাড়িটা থামাল রানা। পাশে একটা কোয়ানসেট, মানে অনেক বড় কুঁড়েঘর। ছাদ টিনের। বেশ পুরনো হয়ে গেছে টিন, মরচে ধরে গেছে জায়গায় জায়গায়। বাতাস কোন্ দিক থেকে বইছে বোঝার

জন্য ছাদের উপর বসানো আছে একটা উইণ্ডসক। একপাশে ঝুলছে ছোট একটা কাঠের সাইনবোর্ড। তাতে লেখা: এয়ার বেঞ্জামিন। হরেক রঙ দিয়ে লেখা হয়েছে কথাগুলো। কালের ছোবলে হালকা হয়ে গেছে এখন।

ডান দিকে, পঞ্চাশ গজ দূরে আরেকটা কোয়ানসেট। এটা আগেরটার চেয়েও বড়। এটাতে স্লাইডিং ডাবল ডোর আছে। খোলা দরজাটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা এয়ারপ্লেনের নাক। হ্যাঙারের আরেকদিকে সামুদ্রিক প্রাণীর খোলস দিয়ে বানানো ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপ।

'ঠিক জায়গায় এসেছি তো, রানা?' জিজ্ঞেস করল সোহানা, সরু হয়ে গেছে চোখ।

হাতে-ধরা ম্যাপের উপর নজর বুলিয়ে নিল রানা। 'হুঁ, ঠিকই আছে। অপির কথা যদি ভুল না হয়, চার্টার প্লেনের জন্য এই জায়গা এই দ্বীপের সেরা।'

কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। পিছনদিকে ঘুরে হাত বাড়িয়ে ব্যাকপ্যাকটা তুলে নিল। তারপর দরজা খুলে নামল। নিজের ব্যাকপ্যাক নিয়ে রানাও নামল।

বড় কোয়ানসেটে গিয়ে ঢুকল দু'জনে।

পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়সী এক আফ্রিকান-আমেরিকান বসে আছেন কাউন্টারের পিছনে, লন চেয়ারে। ঠোঁটে ঝুলছে সাগরকলার মত মোটা এক সিগার।

'হ্যালো,' রানা-সোহানাকে দেখে বলে উঠল লোকটা। 'আমার নাম বেঞ্জামিন। এই কোয়ানসেটের মালিক। ভাড়া আদায়, লাভের টাকা গোনা থেকে শুরু করে সাফসুতরো করার কাজও আমার।'

খাঁটি অক্সফোর্ড উচ্চারণে ইংরেজি বলছেন বেঞ্জামিন।

নিজেদের পরিচয় দিয়ে রানা বলল, 'আপনার জন্য বোধহয়

এই এলাকায় না?'

'না,' হাসলেন বেঞ্জামিন। 'জন্মেছি লণ্ডনে। দশ বছর আগে এসেছি এই জায়গায়। লণ্ডনের যান্ত্রিক জীবনে দম আটকে আসছিল। সিদ্ধান্ত নিই আর যে-ক'দিন বাঁচি একটু শান্তিতে থাকবো। সিভিল এভিয়েশনের উপর ডিগ্রি আছে আমার। ওসব নিয়ে কাজও করেছি অনেক। তাই যা টাকা জমিয়েছিলাম সব খরচ করে গড়ে তুলেছি এয়ার বেঞ্জামিন। একা থাকি। বউ মরে গেছে। চার ছেলেমেয়ে মানুষ হয়ে গেছে, কেউই আমার খোঁজ নেয় না আর ভুলেও।' রানা-সোহানাকে দেখল আপাদমস্তক। 'রাম কে যাচ্ছেন আপনারা?'

'হ্যাঁ,' বলল সোহানা।

মুচকি হাসলেন বেঞ্জামিন। 'কোনও কাজ আছে? না প্রমোদভ্রমণ?'

'দুটোই,' হাসল সোহানাও। 'পাখি দেখবো। আমরা সৌখিন বার্ডওয়াচার। অনেক ছবি তুলবো। জানেন বোধহয়, ভালো ছবির জন্য ভালো পয়সা দেয় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক কিংবা নেচার ম্যাগাজিনের মতো পত্রিকা।'

মাথা ঝাঁকালেন বেঞ্জামিন, গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লেন নাক দিয়ে। দু'পাতার একটা ফর্ম আর একটা কলম বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। 'লাইসেন্স, প্লিয।'

পকেট থেকে বের করে পাইলট লাইসেন্সটা বেঞ্জামিনকে দিল রানা। ফর্মটা পূরণ করল।

ওটাতে নজর বুলাল বেঞ্জামিন। 'একদিনের জন্য?'

'আপাতত। বেশি সময় লাগলে সেই অনুযায়ী খরচ দেবো।'

'কোনও হোটেল বুকিং দিয়েছেন সেখানে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'দিইনি। দেয়ার ইচ্ছাও নেই। বনেজঙ্গলে তাঁবু খাটিয়ে থাকবো ঠিক করেছি। গতকাল আপনার কাছে

আমার নামে একটা চালান এসে পৌঁছানোর কথা। তাঁবু, পানি, ক্যাম্পিংগিয়ার...পেয়েছেন?'

'পেয়েছি। এখানে আসার আগে আপনিই বোধহয় ওগুলো পাঠিয়েছেন, না?'

'হ্যাঁ। কী কী লাগতে পারে আগেই হিসাব করে রেখেছি।'

'কোন্ প্লেনটা নেবেন ঠিক করুন। ওটাতে আপনাদের মালসামান লোড করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

স্যাম্পসনের মাথার উপরে ঝুলছে একটা বোর্ড। তাতে কোন্ প্লেন খালি আছে, কোন্টা ভাড়া হয়েছে, যেগুলো ভাড়া হয়েছে সেগুলো কোনদিকে গেছে ইত্যাদি লেখা আছে। বোর্ডটাতে নজর বুলিয়ে নিয়ে রানা বলল, 'ওই যে ওটা। বোনানযা জি থার্টি সিক্স। ফুয়েল ট্যাঙ্ক পুরো করে দেবেন। রওনা হবার আগে সব ঠিক আছে কি না চেক করে নেব।'

'ভালো। হ্যাঙারের দিকে যান। জোন্স, মানে আমার এখানে যে ছেলেটা কাজ করে, ওকে বলে দিচ্ছি। প্লেনটা দেখাবে আপনাদেরকে।'

ঘুরে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল রানা-সোহানা, পিছন থেকে ওদেরকে ডাকলেন বেঞ্জামিন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

ঘুরল রানা-সোহানা।

'কিছু মনে করবেন না,' কেন যেন গম্ভীর হয়ে গেছে বেঞ্জামিনের চেহারা, 'কী ধরনের পাখির ছবি তুলতে যাচ্ছেন আপনারা রাম কে-তে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কোনও ধরন নেই। যা দেখবো সেটারই ছবি তুলবো। অ্যামেচার ফটোগ্রাফারদের সাধারণত সাবজেক্ট থাকে না।'

পনেরো

রাম কে, বাহামা।

দ্বীপটা টেনেটুনে ত্রিশ বর্গমাইল হবে। গাছগাছালিতে ভরা। আকাশ থেকে এ-রকম একটা জায়গায় এয়ারবেস খুঁজে বের করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু এখানে আগেও এসেছে রানা। কোথায় নামতে হবে জানা আছে। কাজেই কোস্টলাইনটা খুঁজে বের করতে সময় লাগল না। তবে নামার সময় খুব সাবধান থাকতে হলো। আলগা পাথরের ছড়াছড়ি এ জায়গায়।

আদিবাসী লুসায়ান ইণ্ডিয়ানরা এই দ্বীপকে ডাকে মামানা নামে। এটা আবিষ্কার করার পর ক্রিস্টোফার কলম্বাস এর নাম পাল্টে রাখেন সাণ্টা মারিয়া ডে লা কন্সেপসিয়ন। পরে আরও অনেক স্প্যানিশ অভিযাত্রী আসে এখানে। দ্বীপের সাদা বালির অনেকগুলো সৈকতের একটাতে একবার খুঁজে পাওয়া যায় রামের খালি একটা পিপা, কে বা কারা ধুয়েমুছে ঝকঝকে পরিষ্কার করে রেখেছে। সেই থেকে নাম হয়ে গেছে রাম কে।

এই দ্বীপে একটাই গ্রাম—পোর্ট নেলসন। উত্তর-পশ্চিম উপকূল বরাবর। শত শত নারকেল গাছ দেয়ালের মতো ঘিরে আছে গ্রামটাকে। উনিশ শ' নব্বই সালের আদমশুমারি বলছে, পোর্ট নেলসনের জনসংখ্যা সর্বসাকুল্যে সত্তরজন। এই ক'বছরে হয়তো দ্বিগুণ হয়েছে, ভাবল রানা। আসার সময় প্লেন অটোপাইলটে দিয়ে ল্যাপটপের বদৌলতে ওয়ার্ল্ড গাইড ডট কম

থেকে যে-তথ্যগুলো জানতে পেরেছে সেগুলো স্মরণ করার চেষ্টা করল।

রাম কে'র বেশিরভাগ লোক থাকে পোর্ট নেলসনে। এদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ ট্যুরিযমের সঙ্গে জড়িত। কেউ আবার আনারস বা লবণের ব্যবসা করে। সাইসাল গাছের ছাল থেকে দড়ি বানিয়ে বেচে কেউ কেউ।

ভয়ানক কিছু শৈলশ্রেণী আর প্রবালপ্রাচীর ঘিরে রেখেছে এই দ্বীপকে। আগে থেকে জানা না থাকলে জাহাজ পরের কথা, লংবোট নিয়েও দ্বীপের কাছে ঘেঁষা সম্ভব না—খোঁচা লেগে তলা ফুটো হয়ে যাবে। তবে একটাই সুবিধা, বছরের বেশিরভাগ সময় সৈকতসংলগ্ন পানি স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ থাকে। পাঁচ-ছ'শ' বছর আগের জলদস্যুরা জানত, হাজার মাইল বিস্তৃত আটলান্টিক মহাসাগরের কোন্ জায়গায় লুকিয়ে থাকলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম। আর তাই এই রাম কে একসময় হয়ে উঠেছিল ওদের নিরাপদ ঘাঁটি।

'এখানে একবার বিখ্যাত এক জাহাজডুবি হয়েছে,' গতি কমিয়ে জয়স্টিক ঘুরিয়ে বোনানযাটাকে উপকূল বরাবর ডান দিকে পাক খাওয়াচ্ছে রানা, এমন সময় বলে উঠল সোহানা।

'ব্ল্যাকবার্ড?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ক্যাপ্টেন কিড?'

'কোনওটাই না।'

'তা হলে?'

'এইচ.এম.এস. কংকারার। ব্রিটেনের প্রথম প্রপেলার-চালিত ওয়ারশিপ। আঠারো শ' একষট্টি সালে সামার পয়েন্ট রীফের কাছে মাত্র ত্রিশ ফুট গভীর পানিতে ডুবে যায়।'

কথাটা শুনে শুধু মাথা ঝাঁকাল রানা, কিছু বলল না।

'ওই যে এয়ারস্ট্রিপটা,' আবারও বলল সোহানা, ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। আঙুলের ইশারায় রানাকে

দেখানোর চেষ্টা করছে জায়গাটা।

রানা দেখতে পেয়েছে আগেই। রানওয়েটা চার হাজার পাঁচ শ' ফুট লম্বা। পোর্ট নেলসন থেকে তিন-চার মাইল দূরে। এত উঁচু থেকে শত শত গাছগাছালির মধ্যে সাদা জায়গাটাকে দেখাচ্ছে ইংরেজি "টি"-র মতো। টারম্যাকের এককিনারায় কাজ করছে কয়েকজন শ্রমিক। ওদেরকে দেখাচ্ছে পিঁপড়ের মতো। আগাছা সাফ করছে হয়তো, ভাবল রানা।

রানওয়ে ছাড়িয়ে পুবদিকে তাকালে চোখে পড়ে সল্ট লেক। এটার কয়েক মাইল উত্তরে লেক জর্জ।

ইচ্ছা করেই গাড়ির বদলে প্লেন নিয়েছে রানা। গাড়িতে করে পুরো দ্বীপ চক্কর দিতে গেলে এক সপ্তাহের বেশি লেগে যেত। অত সময় নেই ওর হাতে।

আরও দু'হাজার ফুট নামল ও। যোগাযোগ করল পোর্ট নেলসনের কন্ট্রোলের সঙ্গে। রানাদের ফ্লাইটপ্ল্যান যাচাই করে দেখার পর অনুমতি দিল ওরা। বোনানযার নাক ঘুরিয়ে নিল রানা। উত্তরপুব দিকে এগোচ্ছে। খানিকটা এগিয়ে দ্বীপের তটরেখা বরাবর মোড় নিল দক্ষিণদিকে। এদিকে জনবসতি সবচেয়ে কম, নেই বললেই চলে।

উঁকি দিয়ে নীচের দিকে তাকাল সোহানা। তারপর তাকাল রানার দিকে। 'এখান দিয়ে যাচ্ছি যে?'

'আমার মনে হয় এখান থেকেই খোঁজ শুরু করাটা সবচেয়ে ভালো।'

'কেন?'

'কারণ দ্বীপের পশ্চিমপ্রান্তে মানুষজন বেশি। ওখানে হয়তো এর আগেও খোঁজাখুঁজি হয়েছে। কিন্তু কেউ ওখানে লুকানো কোনও এয়ারস্ট্রিপ পেয়েছে বলে শুনিনি। কাজেই যে-অংশে খোঁজ চলেনি সেখানে যেতে চাই আগে। তা ছাড়া আমরা কী

খুঁজছি তা যদি কোনওভাবে ফাঁস হয় তা হলে হুমড়ি খেয়ে পড়বে লোকে। আমি চাই না লোক জানাজানি হোক।'

আবারও নীচের দিকে তাকাল সোহানা। তিন-চতুর্থাংশ চাঁদের মতো বিছিয়ে আছে সৈকত। ঝকঝক করছে চিনির মতো সাদা বালি। তীর থেকে ছ'মাইল ভিতরে দেখা যাচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে পরিত্যক্ত একটা বাড়ি। সবকিছু কেমন সুনসান। টানা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে হু হু করে ওঠে বুকের ভিতর।

গতি কমাতে শুরু করেছে রানা। একইসঙ্গে নামাচ্ছে বোনানযার নাক। তীর থেকে চারশ' ফুট বাকি থাকতে ঢেউয়ের মাথা স্পর্শ করল প্লেনের পণ্টুন দুটো। বার বার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে রানা, নিশ্চিত হতে চায় ওপর থেকে কোনও ডুবোপাথর নজর এড়ায়নি ওর। অখণ্ড মনোযোগে কাজটা বেশ কিছুক্ষণ করার পর আশ্বস্ত হলো। থ্রটল ব্যাক করে আইড্ল্ মোডে দিয়ে দিল প্লেনটা। রানার হিসেব ভুল না হলে এবার নিজ গতিতেই সৈকতের দিকে এগিয়ে যাবে বোনানযা, কাছাকাছি গিয়ে থেমে যাবে আপনাথেকেই।

সৈকতের বালি স্পর্শ করল পণ্টুন দুটো, মৃদু একটা হিসহিস আওয়াজ হলো, তীর থেকে ছ'ফুট ভিতরে গিয়ে থেমে গেল বোনানযা।

চেপে রাখা দম শব্দ করে ছাড়ল সোহানা। 'চমৎকার ল্যাণ্ডিং,' নিখাদ প্রশংসা ঝরল গলায়।

'আমার ল্যাণ্ডিং সবসময় চমৎকারই হয়,' সোহানার দিকে তাকিয়ে হাসল রানা, চোখ টিপল, 'সবাই... বিশেষ করে মেয়েরা, প্রশংসা না করে পারে না।'

ঘুসি তুলল সোহানা। পরমুহূর্তে হেসে ফেলে হাত নামিয়ে নিল। বোনানযার দরজা খুলে বেরিয়ে এল সৈকতে।

আরেকদিকের দরজা খুলে নামল রানা। ব্যাকপ্যাক আর

ডাফ্‌ল্‌ ব্যাগগুলো নামাল একে একে। ডাফ্‌ল্‌ ব্যাগে ওদের ক্যাম্পিং গিয়ার আছে। ওগুলো ঠিক করে সাজিয়ে রাখছে রানা, এমন সময় বেজে উঠল স্যাটেলাইট ফোনটা। খানিকটা আশ্চর্য হয়ে সোহানার দিকে তাকাল ও, তারপর পকেট থেকে বের করে হাতে নিল ওটা। তাকাল স্ক্রিনের দিকে।

অপি।

'গুড টাইমিং, অপি,' রিসিভ বাটন চেপে বলল রানা। 'আমরা এই মাত্র নামলাম রাম কে-তে। একটু লাইনে থাকো তো,' স্যাটেলাইট ফোনের স্পিকার বাটন চাপল, ইশারায় কাছে ডাকল সোহানাকে। 'এবার বলো তোমার কী খবর।'

'খবর মোটামুটি ভালো। প্রথম কথা, মদের বোতলের ওই মৌমাছির ছবিটা আসলে কী, তা জানতে পেরেছি। ওটা নেপোলিয়নের বংশমর্যাদাসূচক একটা চিহ্ন। অবশ্য এ-বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ আছে। বেশিরভাগের ধারণা ওটা আসলে কোনও মৌমাছিই না, একজাতের সোনালি ঘুগরে পোকা। কারও ধারণা প্রথমদিকে ঘুগরে পোকাই ছিল, পরের আঁকিয়েরা বুঝতে না পেরে মৌমাছি বানিয়ে ফেলেছে।'

'কী বলতে চাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'বংশমর্যাদাসূচক চিহ্ন হিসেবে একটা মাছির ছবি ব্যবহার করতেন নেপোলিয়ন?'

'না, ঠিক মাছি বলা যাবে না,' বলল অপি। 'ফ্যামিলি ট্রি'র হিসেব অনুযায়ী, ফড়িং-এর চেয়ে লিফ-হপার বা স্পিট্‌লবাগের সঙ্গে বেশি মিল আছে ঘুগরে পোকার।'

'আচ্ছা যা-ই হোক,' প্রাণিবিজ্ঞানের কূট-বিতর্কে যেতে রাজি না সোহানা, 'বোতলটা তো নেপোলিয়নের হারানো মদভাণ্ডারের, নাকি?'

'হ্যাঁ। এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

'ভালো,' মন্তব্য করল রানা। 'আর কী জানতে পারলে?'

'স্ক্যান করে এগন বল্ডেউইন-এর ডায়েরি আর লগবুক পাঠিয়েছেন আমার কাছে, ডায়েরিটা পড়া শেষ করেছি। বলা যায় প্রায় পুরোটাই বুঝতে পেরেছি। "গোট'স হেড" বা ছাগলের মাথা জাতীয় একটা শব্দ লিখেছে সে এক জায়গায়...'

'হুঁ, মনে পড়ছে,' বলল সোহানা। 'পড়েছি আমি ওটা। রানাকেও দেখিয়েছি। আমাদের ধারণা ওটা রাম কে'র কোনও সরাইখানার নাম। এগন আর ওর শিপমেট যখন এসেছিল হয়তো উঠেছিল ওখানে।'

'কিন্তু আমার মনে হয় ওটা কোনও সরাইখানা না,' সময় নিয়ে কথাটা বলল অপি।

'বলো কী?' আশ্চর্য হয়ে গেছে সোহানা। 'তা হলে কী?'

'আমার মনে হয় ওটা কোনও ল্যাণ্ডমার্ক। হয়তো নেভিগেশনের কাজে লাগবে ভেবে জায়গাটার ও-রকম নাম দিয়েছিল লোকটা।'

'কিন্তু...' রানার কণ্ঠে দ্বিধা, 'ওই নামে এখানে সে-রকম কিছু আছে বলে তো শুনিনি কখনও?'

'মুশকিলটা এখানেই। এ-পর্যন্ত কম ঘাঁটাঘাঁটি করিনি আমি। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছু পাইনি। কাছাকাছি কোনও দ্বীপে ওই নামের কোনও ল্যাণ্ডমার্ক আছে কি না তা-ও নিশ্চিত করে বলতে পারবো না।'

'ঠিক আছে, চোখ-কান খোলা রাখবো আমরা,' বলল রানা। 'এগন যদি কোনও ল্যাণ্ডমার্কের সঙ্গে ছাগলের মাথার সাদৃশ্য খুঁজে পায় তা হলে আশা করি আমাদেরও চোখ এড়াবে না। তোমার কথা যদি ঠিক হয়, মানে ছাগলের মাথা যদি আসলেই কোনও ল্যাণ্ডমার্ক হয় তা হলে আমার ধারণা বিশেষ কোনও পাহাড় বা বড় কোনও পাথরের কথা বুঝিয়েছে লোকটা।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অপি বলল, 'এবার একটা

ভুলের জন্য আমার ক্ষমা চাওয়ার পালা।'

'কী ভুল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জার্মান নেভাল আর্কাইভ থেকে ট্রান্সলেট করার সময় ভুল হয়েছে আমার। ম্যাক্সিমিলানের ক্যাপ্টেন ছিল না মাইকেল সেবাস্টিয়ান।'

'তা-ই নাকি?' আবার আশ্চর্য হয়েছে সোহানা, যতদূর জানে এ-রকম ভুল করে না অপি। 'তা হলে কী ছিল সে?'

'এগনের মতোই একজন, আরেকটা সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন। মিজিট সাব ইউ.এম. সেভেনটি সেভেন চালানোর দায়িত্ব ছিল ওর উপর।'

'তার মানে এগন, সেবাস্টিয়ান আর তাদের সাবমেরিন দুটো ম্যাক্সিমিলানে ছিল, তা-ই তো?' জানতে চাইল সোহানা। 'আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এই রাম কে'র দিকে আসছিল জাহাজটা রিফুয়েলিং আর রিফিটিং-এর জন্য?'

'লগবুক পড়ে তা-ই মনে হয়,' জবাব দিল অপি।

'এবং রাম কে-তে পৌঁছানোর সপ্তাহখানেক পর যে-কোনও কারণেই হোক ডুবে যায় ম্যাক্সিমিলান। তখন এগনের ইউ.এম. থার্টি ফোর গিয়ে ঠাঁই নেয় মেরিল্যাণ্ড সোয়াম্পের কাছাকাছি কোথাও,' আপনমনে বলল রানা। তারপর স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করল, 'সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে, সেবাস্টিয়ানের ইউ.এম. সেভেনটি সেভেনের কী হলো?'

'জার্মান আর্কাইভ বলে ওটা হারিয়ে গেছে,' বলল অপি। 'ইউ.এস. নেভির আর্কাইভ বলছে, ম্যাক্সিমিলান কব্জা করার পর শুধু জাহাজটা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি।'

রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'তারমানে ইউ.এম. সেভেনটি সেভেনের ভাগ্যে যা ঘটেছে, ম্যাক্সিমিলানের ক্ষেত্রেও সে-রকম রহস্যময় কিছু একটা হয়েছে। এবং কী হয়েছে তা কোনওদিনই

নিশ্চিতভাবে জানা যাবে না হয়তো।'

কী যেন ভাবছিল রানা। চিন্তার জগৎ থেকে ফিরে এসে বলল, 'আচ্ছা অপি, ম্যাক্সিমিলান কত বড় হবে? মানে লম্বায় কতখানি? একশ' পঞ্চাশ ফুট?'

'হবে হয়তো। ...কেন?'

'একশ' পঞ্চাশ ফুট লম্বা একটা জাহাজ,' আপনমনে বলছে রানা। 'দুটো সাবমেরিনকে রিফুয়েলিং করার জন্য একগাদা যন্ত্রপাতি। আমার ধারণা রাম কে'র কোনও একটা গুহা বেছে নিয়েছিল জার্মানরা কাজটা করার জন্য। এবং শুধু রিফুয়েলিংই নয়, খুবই গোপন আরও কিছু করছিল ওরা।'

'তারমানে...'

'হ্যাঁ,' সোহানার কথা কেড়ে নিল রানা, 'তারমানে সহজে চোখে পড়ে না এ-রকম কিছু গুহাও খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে।'

বোনানযাটা আনলোডিং করার কাজ শেষ। পন্টুন দুটো শক্ত আর মোটা দড়ি দিয়ে কায়দা করে বেঁধেছে রানা সৈকতের বিশাল এক পাথরের সঙ্গে। এবার ক্যাম্প করার জন্য উপযুক্ত জায়গা দরকার। কয়েক ঘণ্টা পরই রাত নামবে। ওরা ঠিক করেছে আজ আর কোনও কাজ করবে না। শুধু বিশ্রাম আর গল্প। আগামীকাল সকাল থেকে নতুনভাবে শুরু করা যাবে।

'দেখা যাচ্ছে জায়গাটা পুরোপুরি নির্জন না,' গোছগাছের কাজ সারতে সারতে অনেকটা হঠাৎ করেই মন্তব্য করল সোহানা।

কফির সরঞ্জাম নিয়ে বসেছিল রানা একটু দূরে। কথাটা শুনতে পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সোহানার দিকে।

ইঙ্গিতে দূরে দেখাল সোহানা। ও যেদিকে দেখাচ্ছে সেদিকে তাকাল রানা।

জায়গাটা সিকি মাইল দূরে। খাঁড়ির উত্তরপ্রান্তে, একসারিতে জন্মানো কিছু ঘন গাছপালার সঙ্গে। ওখানে একটা কুঁড়েঘরের মতো দেখা যাচ্ছে। মোচাকার ছাদটা খড়ে-ছাওয়া, দেয়াল বানানো হয়েছে তক্তা দিয়ে। ঘরের বাইরে, দুটো পোস্টের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে একটা দোলনা-বিছানা। বিছানাটা দুলছে। কেউ একজন শুয়ে আছে ওখানে আরাম করে, খেয়াল করে দেখলে বোঝা যায়, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লোকটা রানা-সোহানার দিকে।

রানা-সোহানাও ওকে দেখছে বুঝতে পেরে শোয়া অবস্থাতেই হাত উঁচু করল লোকটা, নাবিকদের মতো চিৎকার করে বলল, 'হেই ভায়া, খবর কী?'

সোহানার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ নাচাল রানা। জবাবে ছোট করে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। হালকা পদক্ষেপে হেঁটে দূরত্বটুকু অতিক্রম করল দু'জনে, হাজির হলো লোকটার সামনে।

'স্বাগতম,' ভারী কণ্ঠে বলল লোকটা।

রোদে পুড়ে গাঢ় হয়ে গেছে চামড়ার রঙ। চুল সব সাদা। থুঁতনিতে ছুঁচালো দাড়ি। নীল চোখের তারায় অদ্ভুত দ্যুতি। গাছের গুঁড়ি দিয়ে দুটো চেয়ার বানিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে দোলনা-বিছানা থেকে কিছুটা দূরে, ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল লোকটা।

রানা খেয়াল করল, জোয়ারের পানিতে ভিজে আছে চেয়ার দুটো, শুকায়নি এখনও। লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'শুনুন, আমরা যদি অনধিকার প্রবেশ করে থাকি তা হলে দুঃখিত। আসলে...'

মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল লোকটা। 'খামোকা বিনয় কোরো না। এখানে প্রায়ই লোক আসে। তোমরা নতুন না। বেশিরভাগই কপোতকপোতী, তোমাদের মতো। ওরা আসে, দু'-চারদিন থাকে, প্রেম করে, তারপর চলে যায়। আমি এখানে শুয়ে

শুয়ে দেখি।'

চেয়ারে বসে পড়ল রানা-সোহানা। নিজেদের পরিচয় দিল রানা। ছোটখাটো একটা "গবেষণার" কাজে এসেছে, জানাল।

দোলনা-বিছানায় উঠে বসল লোকটা। বালির দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল। বলল, 'ভালো হয়েছে তোমরা এসেছ।'

আশ্চর্য হয়ে লোকটার দিকে তাকাল সোহানা। 'মানে?'

'মানে সবসময় কপোতকপোতীরা আসে তো, এবার একটু অন্যরকম কিছু হবে। যা-হোক, তোমাদের কাজে বাধা দেয়ার জন্য আমি থাকছি না। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে যেতে হতো আমাকে। যাওয়ার আগে দেখা হয়ে গেল তোমাদের সঙ্গে।'

'কোথায় যাবেন?' আবারও জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'পোর্ট হেনরিতে কিছু কাজ আছে আমার। দু'দিনের আগে ফিরতে পারবো না। মনে হয় এই দু'দিনে তোমরাও তোমাদের কাজ সেরে ফেলতে পারবে,' বলে আর দাঁড়াল না লোকটা, হাঁটা ধরল গাছের সারির দিকে। কিছুক্ষণ পর উদয় হলো আবার। ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসছে একটা ভেসপা স্কুটার। কাছে এসে বলল, 'আমার ঘরের ভিতরে ফিশিংপোল, পট, প্যান এবং আর যা যা লাগে তার প্রায় সবকিছুই আছে। দরকার লাগলে নিজেদের মনে করে ব্যবহার কোরো। ট্র্যাপডোর ওয়াইন সেলারও আছে। চেখে দেখতে পারো দু'-এক বোতল।'

হঠাৎ করেই কেন যেন মনে হলো রানার এই অচেনা লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়। বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

চোখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন নিয়ে রানার দিকে তাকাল লোকটা।

'কাছাকাছি কোথাও গোপন কোনও নৌঘাঁটির কথা শুনেছেন কখনও?'

'ঠিক নৌঘাঁটি না...নাৎসিদের সাবমেরিন ঘাঁটি ছিল বলে

শুনেছি।'

'তা হলে মনে হয় ওটাই,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

স্কুটারটাকে কিকস্ট্যাণ্ডের উপর দাঁড় করাল লোকটা। ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে ঢুকল ঘরে। চা পরিবেশন করার ট্রে'র সমান আকৃতির বর্গাকার একটা টিনের-টুকরো নিয়ে ফিরে এল কিছুক্ষণ পর। টুকরোটা তুলে দিল রানার হাতে।

চোখ পিটপিট করল রানা। 'কী করবো এটা দিয়ে? সাগর থেকে মাছ ধরে ফ্রাই করে পরিবেশন করবো?'

মুচকি হাসল লোকটা। 'এটা একটা হাইড্রোপ্লেন, বাছা।'

'হাইড্রোপ্লেন?' সোহানার দৃষ্টিতে সন্দেহ।

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'সাধারণ সাবমেরিনের চেয়ে অনেক ছোট একটা সাবমেরিনের অংশ।'

'অনেক ছোট সাবমেরিন?' বলে রানার দিকে তাকাল সোহানা।

আবারও মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'যারা দেখেছে তারা অন্তত তা-ই বলেছে।'

'কোথায় পেলেন এই জিনিস?' হাইড্রোপ্লেনটা উল্টেপাল্টে দেখছে রানা।

'ফ্রিডম রকে। পোর্ট বয়েডের উত্তরে।'

'তারমানে সেখান থেকেই খোঁজ...মানে গবেষণা শুরু করতে হবে আমাদেরকে,' বিড়বিড় করে বলল সোহানা।

'ওই জায়গায় একটা লেগুন আছে। ওখানেই পেয়েছি আমি জিনিসটা। একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড নদী আছে ওই লেগুনের ধারেকাছে। আমার ধারণা ওই নদীতে ভেসেই কাছেপিঠের কোনও জায়গা থেকে হাজির হয়েছে এই হাইড্রোপ্লেন। দ্বীপের এই জায়গায়, মানে পুবদিকে ওই নদীটা দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু আমার কাছে যে-বিষয়ে খটকা লেগেছে তা

হলো, স্রোত এত জোরালো না যে, এই হাইড্রোপ্লেনের চেয়ে ভারী কিছু ভাসিয়ে দ্বীপের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে নিয়ে যাবে।'

'কিন্তু...' চোখ সরু করে অচেনা লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা, 'আপনি যদি জানতেনই এটা একটা জার্মান সাবমেরিন থেকে পাওয়া গেছে, খুঁজে বের করলেন না কেন সেটা?'

'প্রথম কথা: আমি কিন্তু একবারও বলিনি কোনও জার্মান সাবমেরিন থেকে পাওয়া গেছে ওটা। দ্বিতীয়ত: আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব ছিল করেছি। জানতাম একদিন-না-একদিন কেউ-না-কেউ আসবেই। এসব ব্যাপারে প্রশ্ন করবে আমাকে। দেখো, আমার অনুমান ঠিক হয়েছে। তোমরা হাজির হয়ে গেছ,' পিছু ঘুরে স্কুটারের দিকে দু'কদম এগোল লোকটা। তারপর হঠাৎ করেই থেমে দাঁড়িয়ে ঘুরল। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমি যদি একজন জার্মান নাবিক হতাম তা হলে এখানে আসার চেয়ে সাগরতীরের কোনও গুহায় লুকিয়ে থেকে জীবন কাটিয়ে দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম বেশি।'

'আমিও,' চোখ টিপে বলল রানা।

হাসল লোকটা। 'কপাল দেখো, রাম কে'র চারদিকে গুহার অভাব নেই। দ্বীপের এই প্রান্তেই আছে কম করে হলেও বারোটা। যতদূর শুনেছি, ওগুলোর বেশিরভাগেই মানুষের পা পড়েনি কখনও। ওই আণ্ডারগ্রাউণ্ড নদীর মাধ্যমে সবগুলো গুহাই নাকি একটার সঙ্গে আরেকটা যুক্ত।'

'থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল রানা, 'আর মাত্র একটা কথা। গোট'স হেড বা ছাগলের মাথার ব্যাপারে কখনও শুনেছেন কিছু?'

চোখ সরু করে কিছুক্ষণ থুঁতনি চুলকাল লোকটা। তারপর বলল, 'উঁহুঁ, সে-রকম কিছু শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না। যাই

হোক, চলি এখন। গুড লাক।'

স্কুটার চালিয়ে উধাও হয়ে গেল সে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা-সোহানা। তারপর হঠাৎ করেই বলে উঠল সোহানা, 'কাণ্ড দেখো!'

ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকাল রানা। 'কী?'

'এতক্ষণ কথা বললাম অথচ ভদ্রলোকের নামটাই জিজ্ঞেস করলাম না।'

'নাম জিজ্ঞেস করার দরকার ছিল বলে তো মনে হয় না।'

'কেন?'

কিছু না বলে ইঙ্গিতে কুঁড়েঘরটার দিকে দেখাল রানা।

দরজার পাশে পেরেকে গাঁথা একটা ছোট তক্তা। তাতে লাল কালিতে লেখা আছে:

ক্যাসা দে পিলাতোস।

ষোলো

জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা এসব না থাকলে জীবনটা কত সুন্দর হতে পারত, না?'

সোহানা শুধু বলল, 'হুঁ।'

ক্যাসা দে পিলাতোসের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে ওরা। আজ রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে লোকটার "আশ্রয়ে"। সূর্য যখন ডুবি ডুবি করছিল তখন এদিকে-সেদিকে ঘুরে কিছু কাঠ যোগাড় করে এনেছে রানা। তখন সোহানা গিয়ে ঢুকেছিল পিলাতোসের

কুঁড়েঘরে, খুঁজে বের করেছে বেশ বড় একটা ছিপ। ঘণ্টা দেড়েক সময় খরচ করে কিছু মাছ ধরেছে সাগর থেকে। ওগুলো আঁশ ছাড়িয়ে আগুনে ঝলসে নিয়ে ডিনার সেরেছে দু'জনে।

কুঁড়েঘরের বাইরের একটা বেঞ্চে পাশাপাশি বসে আছে ওরা এখন। হীরার টুকরোর মতো তারা ঝিকমিক করছে পরিষ্কার আকাশে। কাছেই আগুন জ্বলছে বলে দূরে তাকালে আরও অন্ধকার মনে হয় রাতটা। সাগরের ঢেউয়ের অবিরাম কুলকুল আর গাছের পাতার ফিসফিসানি বাদ দিয়ে বললে চারপাশ নীরব।

ওয়াইন সেলারের ব্যাপারে বাড়িয়ে বলেনি পিলাতোস। তবে ভাণ্ডারটা বেশি বড় না, সাধারণ একটা ক্লযিটের সমান হবে। ভিতরে দু'ডজনের মতো বোতল। সেখান থেকে বেছে বেছে ওয়াইনের একটা বোতল নিয়ে এসেছে সোহানা। ওটা এখন মাটিতে। রানা-সোহানার হাতে একটা করে গ্লাস। আয়েশ করে চুমুক দিচ্ছে ওরা যে-যার গ্লাসে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সোহানা বলল, 'কী মনে হয় তোমার, রানা? ওরা খুঁজে বের করতে পারবে আমাদেরকে?'

'ওরা মানে নিয়াযভ আর মেলিখান? মনে হয় না। ওরা প্রফেশনাল, সন্দেহ নেই। কিন্তু ওদের পরিচয় বের করার জন্য আমরা যেভাবে চেষ্টা করেছি, আমাদের পরিচয় বের করার জন্য ওরা সেভাবে চেষ্টা করেনি সম্ভবত। করলে আমাদের প্রতি ওদের আচরণ আরেকটু অন্যরকম হতো।'

'অন্যরকম মানে?'

'মানে...আমাদের প্রতি আরেকটু সমীহ করে কাজ করত। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে আমাদেরকে পাত্তাই দিচ্ছে না সিদোরভের সাঙ্গপাঙ্গরা।'

'এটা ওদের একটা চালও হতে পারে?'

'পারে, অস্বীকার করবো না। কিন্তু আমার তা মনে হয় না।'

'আমরা আসলে কী খুঁজছি, রানা?'

'আমারও স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে জিনিসটা দামি কিছু। অন্তত ওটার অ্যান্টিক ভ্যালু অনেক। তা না হলে সিদোরভের মতো লোক উঠে-পড়ে লাগত না।'

'প্রতিযোগিতায় এখন পর্যন্ত কে এগিয়ে আছে? আমরা, না সিদোরভ?'

হাসল রানা। ছোট করে আবার চুমুক দিল গ্লাসে। 'জানি না। মনে হয় আমরাই।'

'ভালো,' হাসল সোহানাও। 'রানা, কেন যেন তোমার বন্ধু রে হোগানের কথা মনে হচ্ছে আমার। ওকে সেদিন মেরেই ফেলত নিয়াযভ, তা-ই না?'

'হ্যাঁ, সন্দেহ নেই।'

বেঞ্চের উপর পা তুলে বসল সোহানা। 'এই বিষয়টাই আমাকে ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। নেপোলিয়ন—এত বছর আগের এক সম্রাট, তাঁর হারানো মদভাণ্ডার খুঁজে বের করার জন্য খুনখারাপিতেও আপত্তি নেই সিদোরভের। অথচ সে সাধারণ অ্যান্টিকশিকারীদের মতো না।'

'ওই যে বললাম, এখন পর্যন্ত স্পষ্ট ধারণা নেই আমার। তবে একটা কথা বলি। সিদোরভ আসলে হারানো মদের ভাণ্ডার খুঁজছে না। সে খুঁজছে অন্য কিছু।'

'কী?'

'তা জানি না। আর খুনখারাপির কথা যদি বলো, সিদোরভের সম্বন্ধে যে-সব রিপোর্ট পেয়েছি তাতে বলা হয়েছে খুন করতে করতে ব্যাপারটা ওর কাছে ডালভাত হয়ে গেছে। তাই যখন-তখন যাকে-তাকে মেরে ফেলার নির্দেশ দেয় সে।'

'হুঁ,' মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল সোহানা। আনমনে দোলাচ্ছে হাতের গ্লাসটা। সোনালি মদ নড়ে উঠছে

থেকে থেকে, আগুনের আলোয় দেখছে সেটা। 'এখানে...মানে এই দ্বীপের কোত্থেকে কাজ শুরু করবো আমরা?'

'প্রথমে কিছু অনুমান করতে হবে আমাদেরকে।'

'যেমন?'

'যেমন অপি বলছে ছাগলের মাথা নাকি একটা ল্যাণ্ডমার্ক, কথাটা সত্যি বলে মেনে নিতে হবে। দুই, আমি জার্মান হলে গোপন ঘাঁটি বানানোর জন্য এই দ্বীপে এমন একটা জায়গা বেছে নিতাম যেখানে মানুষের আনাগোনা সবচেয়ে কম। যতটুকু জানি, যতখানি খোঁজখবর করেছি, রাম কে'র এ-জায়গাটাই সে-রকম। কাল ভোরে আমাদের মালসামান নিয়ে উঠে পড়বো নৌকায়...'

'বোনানযায় না?'

'না, বোনানযায় না।'

'কেন?'

'কারণ আমার ধারণা ছাগলের মাথা বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা আকাশের চেয়ে সাগর সমতল থেকে ভালো চেনা যাবে।'

'কীভাবে?'

'এগন ছিল নৌসেনা। যুদ্ধ বলো, গোপন ঘাঁটি খুঁজে বের করা বলো কিংবা রিফিটিং বলো, সব সে করেছে পানিতে ভেসে, আকাশে উড়ে বেড়িয়ে না। কাজেই আমার ধারণা ছাগলের মাথাও সে খুঁজে পেয়েছে সাগরের পানিতে ভাসতে ভাসতে। তা ছাড়া আকাশ থেকে ছাগলের মাথা দেখতে হাঁসের পা অথবা গাধার কানের মতো মনে হতে পারে। আবার কিছু মনে না-ও হতে পারে।'

'ভালো বলেছ। ওভাবে ভেবে দেখিনি আমি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এতগুলো বছর পার হয়েছে, এতদিনে হয়তো অনেক পাল্টে গেছে ল্যাণ্ডমার্কটা?'

'পাল্টে গিয়ে থাকলে করার কিছু নেই। চেষ্টা করে দেখতে হবে আমাদেরকে।'

ভোরে ঘুম থেকে উঠল ওরা। বুনো আঙুর, ডুমুর, আলুবোখারা আর ঝলসানো মাছ দিয়ে নাস্তা সেরে নিল। কুঁড়েঘরের একশ' গজের মধ্যেই জন্মে আছে বিভিন্ন জাতের বুনো ফলের গাছ, সেগুলো থেকে যা যা ভালো লেগেছিল নিয়ে এসেছিল সোহানা। রানা সাগর থেকে মাছ ধরেছে।

খাওয়া শেষ করে মোটরবোটে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তুলল দু'জনে মিলে। তারপর রওয়ানা হয়ে গেল। মোটরটা বেশ পুরনো, হঠাৎ করে ছুট লাগানোর দরকার পড়লে তেমন স্পিড তুলতে পারবে বলে মনে হয় না। তবে তেল খায় কম। আর হালকা। বিক্ষিপ্ত প্রবালপ্রাচীরের মাঝখান দিয়ে নৌকাটাকে এগিয়ে নিতে পারবে। বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কাও সামলাতে পারবে।

রোদের তেজ তেমন জোরালো হয়ে ওঠার আগেই অনেকদূর চলে আসতে পারল ওরা। প্রবালপ্রাচীরের সঙ্গে সমান্তরালে নৌকা চালাচ্ছে রানা, এগোচ্ছে উত্তরদিকে। এখানকার পানি খুবই স্বচ্ছ, কিছুটা ফিরোজা রঙের। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পানির বিশ ফুট নীচের বালি। বাহারি রঙের কিছু মাছ ছোটাছুটি করছে ইচ্ছামতো, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সেগুলোও।

প্রবালপ্রাচীরের কারণে বার বার নৌকার নাক এদিক-সেদিক করতে হচ্ছে রানাকে, কিন্তু খেয়াল রাখছে যাতে তীর থেকে বেশি দূরে সরে না যায়। দূরত্বটা পঞ্চাশ থেকে একশ' গজের মধ্যে রাখার চেষ্টা করছে।

নৌকার অন্যপ্রান্তে বসে আছে সোহানা। চোখে বিনকিউলার। সাগরতীরের পাহাড়গুলো দেখছে। কখনও কখনও বিনকিউলার নামিয়ে রেখে তুলে নিচ্ছে ডিজিটাল এস.এল.আর. ক্যামেরা,

টেলিফটো লেন্স দিয়ে ছবি তুলছে। কখনও আবার নৌকার গতি কমাতে বলছে রানাকে। কোনও পাহাড়ের কোনও গুহাকে বিশেষ কোনওকিছুর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হলে সময় নিয়ে দেখছে। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তোলার চেষ্টা করছে।

দুপুরের কিছু আগে ওরা হাজির হলো দ্বীপের হেডল্যাণ্ডের সামনে। এখানে তীরের কাছেই বেশ বড় একটা পাহাড়। স্থানীয়রা ডাকে নাসাউকানু নামে। ওটা ছাড়িয়ে উত্তরের উপকূলরেখা বরাবর পোর্ট বয়েড। রাম কে'র এ-জায়গাটাও ঘনবসতিপূর্ণ। তাই নৌকার মুখ ঘুরিয়ে নিল রানা। দক্ষিণদিকে এগোচ্ছে এবার।

'আমরা ইতোমধ্যে কম করে হলেও ডজনখানেক গুহা পার হয়ে এসেছি,' বলল সোহানা।

রানা জানে কথাটা ঠিক। ওই গুহাগুলোর উপর নজর বুলিয়েছে সে-ও। বেশিরভাগ গুহামুখ ঢেকে আছে ঝুলন্ত আঙুরলতায়। কোনওটাতে আবার আগাছা আর কাঁটাঝোপের ছড়াছড়ি। দেখে বোঝা যায় ওগুলো গুহামুখ। কিন্তু কোনওটাকেই ছাগলের মাথার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয়নি। ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে ভিতরে ঢুকে সবগুলো গুহা তন্ন তন্ন করে দেখতে হলে বছরখানেক সময় লেগে যাবে।

'আমাদের জন্য আরেকটা খারাপ খবর হচ্ছে,' সম্ভবত রানার মনের কথাটা পড়তে পেরে বলল সোহানা, 'এতক্ষণ ভাটা চলছিল। তাই তীরের এত কাছে থাকতে পেরেছি আমরা। জোয়ার শুরু হলে দূরে সরে যেতে হবে আমাদেরকে। এত কাছে থেকেও যখন কিছু চোখে পড়েনি, দূরে গেলে পড়বে কীভাবে?'

প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে নৌকার গতি আরও কমাল রানা। বলল, 'আমার কী মনে হয় জানো?'

বিনকিউলারটা হাত থেকে রেখে দিয়ে সানগ্লাস পরল

সোহানা। সূর্যের দিকে পিঠ দিয়ে বসেছে রানা, তাই ওর দিকে সরাসরি তাকালে চোখে রোদ লাগে।

'আমার মনে হয় কোথাও কোনও ভুল হয়েছে আমাদের,' সিগারেট ধরাল রানা। 'আমরা ধরে নিয়েছি মিশনে যাওয়ার আগে নিজের সাবমেরিনটাকে টেস্ট-ড্রাইভিং করার জন্য এখানে এসেছিল এগন এবং দেখতে ছাগলের মাথার সঙ্গে মিল আছে এ-রকম কোনও গুহাকে গোপন চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করেছে।'

'তো?'

'মেরামতের কাজ সন্তোষজনক হয়েছে কি না জানার আগে বেশি গভীরে ডুব দিতে চাইবে না এগন, ঠিক না?'

'চাওয়ার তো কথা না। আমি থাকলে চাইতাম না। যদি নিশ্চিতভাবে জানতে না পারি সাবমেরিন নিয়ে ডুব দিলে আবার ভেসে উঠতে পারবো, নাকি সলিলসমাধি হবে।'

'তারমানে ধরে নেয়া যায় এগনও ওই কাজ করেনি। তীরের কাছাকাছিই কোথাও ছিল সে। এবং বেশিরভাগ সময় পানির উপরেই রেখেছিল সাবমেরিনটাকে।'

চুপ করে কথাটা কিছুক্ষণ ভাবল সোহানা। তারপর বলল, 'সম্ভবত।'

'মনে করো মেরামতের কাজ শেষ। এবার টেস্ট-ড্রাইভের পালা। গভীর সাগরে চার-পাঁচ মাইল এদিকে-সেদিকে ঘোরাঘুরি করে আবার ফিরতে হয়েছে এগনকে। খোলা সাগরে ভেসে ওঠার পর বিশেষ সেই চিহ্ন দেখে বুঝতে পেরেছে সে কোন্‌দিকে এগোতে হবে।'

'তারমানে,' বুঝে ফেলেছে সোহানা, 'মাত্র একশ' গজ দূর থেকে না, কয়েক মাইল দূর থেকে চিনে রেখেছিল সে জায়গাটা। এবং সেটা খুঁজে বের করতে হলে আমাদেরকেও যেতে হবে খোলা সাগরে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নৌকার মুখ আবারও ঘুরিয়ে নিল রানা।

বিকেলের কিছু আগে রাম কে'র উত্তর হেডল্যাণ্ড থেকে মাইল দুয়েক দূরে থামল ওদের নৌকা। ওরা তখন ক্লান্ত, পিপাসার্ত। মাথায় হ্যাট আর গায়ে সানক্রিম থাকার পরও রোদে প্রায়-ঝলসে গেছে দু'জনই।

হাত তুলে থামার ইঙ্গিত দিয়েছে সোহানা। চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে তাকিয়ে আছে ও দূরের একটা পাহাড়ের দিকে। অনেকক্ষণ দেখার পর বিনকিউলারটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। রানা ততক্ষণে গতি কমিয়ে আইড্ল্ পজিশনে নিয়ে এসেছে মোটরবোটটাকে।

'ওই পাহাড়টা দেখো,' বলল সোহানা। 'তোমার বাঁ দিকে, দু'শ' আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে।'

বিনকিউলারটা নিল রানা। বাঁ দিকে ঘুরে বসল। যেদিকে ইঙ্গিত করছে সোহানা তাকাল সেদিকে।

'পাশাপাশি দুটো বটগাছ জন্মে আছে, দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'হুঁ, পাচ্ছি।'

'কল্পনা করো আজ থেকে অনেক বছর আগের কথা। বটগাছ দুটো তখন এত বড় হয়নি। ধরো...এখনকার তুলনায় বেশি হলে তিনভাগের একভাগ হবে। ডালপালাও অনেক কম। পাহাড়টাকে তা হলে আরেকটু লম্বা মনে হবে তোমার।'

টানা দশ সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর মাথা নাড়ল। 'না, সোহানা, আমার মনে হয়...'

'সরাসরি তাকিয়ো না,' রানাকে কথা শেষ করতে দিল না সোহানা। 'প্রথমবার ওভাবে তাকিয়ে আমিও বুঝতে পারিনি। ঘাড় খানিকটা ঘুরাও, চোখ টেরা করো।'

তাকাল রানা। হঠাৎ করেই দেখতে পেল ও। যেন সুইচ টিপে পর্দা সরিয়ে দিয়েছে কেউ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এতগুলো বছর—যথেষ্ট ক্ষয়ে গেছে পাহাড়ের মাথার দিকটা। তারপরও ওই জায়গা দেখতে অনেকটা ছাগলের মাথার মতোই। বটগাছ দুটোকে আরও খাটো কল্পনা করলে মনে হয় ছাগলের শিং।

বিনকিউলারটা চোখের উপর থেকে সরিয়ে সোহানার দিকে তাকাল রানা।

সানগ্লাসটা খুলল সোহানা। রানার চোখে চোখ রাখল। 'এখন প্রশ্ন হচ্ছে ওটাই কি সেই ছাগলের মাথা যা এতক্ষণ ধরে দেখতে চাচ্ছিলাম আমরা? নাকি একটা ভুলকে জোর করে ঠিক বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি?'

'কাছে না গেলে শিওর হওয়া যাবে না,' ইঞ্জিনের থ্রটলে হাত দিল রানা।

সামনের প্রবালপ্রাচীরের ফাটল আট ফুটের বেশি হবে না। জোয়ার চলছে, সাগরে এখন বড় বড় ঢেউ। এখানকার বেশিরভাগ প্রবালপ্রাচীরের মাথাগুলো ধারালো, অন্তত মোটরবোটের তলা চিরে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। খুব ধীরে আর অত্যন্ত সাবধানে মোটরবোট চালাতে হচ্ছে রানাকে। প্রান্ত বদল করে বোটের নাকের কাছে গিয়ে বসেছে সোহানা, থেকে থেকে উঁচু গলায় নির্দেশনা দিয়ে সাহায্য করছে রানাকে।

'বাঁয়ে...বাঁয়ে...বাঁয়ে,' হঠাৎ বলল সোহানা, 'হ্যাঁ, হয়েছে। এবার নাক সোজা করো নৌকার। গতি আরেকটু কমাও। সোজা এগোতে থাকো।'

নীচের স্ফটিকস্বচ্ছ পানির দিকে বার বার তাকাচ্ছে রানা। পাগলপারা স্রোত এসে অবিরাম বাড়ি খাচ্ছে প্রবালপ্রাচীরে। ফেনা ছড়িয়ে গিয়ে কিছু সময়ের জন্য অস্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে পানি। খানিক

বাদেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আবার। চোখা মাথার প্রবালদেয়াল দেখা যাচ্ছে তখন। রানার এক হাত থ্রটলে, আরেক হাত দিয়ে হাল ধরে আছে। সোহানার নির্দেশনা মানছে অক্ষরে অক্ষরে। কোনও দুর্ঘটনা ছাড়াই একটু একটু করে এগোচ্ছে মোটরবোট।

'গুড!' নিখাদ প্রশংসা সোহানার কণ্ঠে, 'এগিয়ে চলো, রানা।'

হালটা আরেকটু ঘুরাল রানা। নৌকা এখন এগিয়ে যাচ্ছে আট ফুটের সেই ফাটলের দিকে। এমন সময় বিশাল এক ঢেউ এসে বাড়ি মারল নৌকার গায়ে। নাক ঘুরে গেল ওটার। থ্রটল ছেড়ে দিয়ে দু'হাত দিয়ে হাল চেপে ধরল রানা। একটুও ডানে-বাঁয়ে যাওয়া চলবে না। কোনও প্রবালপ্রাচীরে নৌকার তলা ঘষা খেলেই সর্বনাশ।

'সাবধান, সোহানা,' চেঁচিয়ে সতর্ক করল রানা, 'আরেকটা ঢেউ আসছে।'

আগেই দেখেছে সোহানা। মোটরবোটের দু'দিকের দু'প্রান্ত আঁকড়ে ধরে রেখেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানার দিকে। 'স্রোতটা আসার আগেই গতি বাড়িয়ে ফাটলের ভিতরে ঢুকে পড়তে পারবে না?'

'হয়তো পারবো, কিন্তু ঝুঁকি নিতে চাই না। স্রোতটা নৌকার নাক ঘুরিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু জোরে ছুটতে গেলে নৌকার তলা ফুটো হতে পারে।'

স্রোতটা এল যথাসময়ে। বড় রকমের ঝাঁকুনি খেল রানা-সোহানা। ওটা চলে যাওয়ার পর আরেকদফা খাটুনি করে নৌকার মুখ সোজা করতে হলো রানাকে।

'বেশি ডানে এসে পড়েছ,' চেঁচিয়ে বলল সোহানা। 'একটু বাঁয়ে নাও। আরেকটু। হয়েছে...হয়েছে। এবার সোজা যাও।'

'আর কত দূর?'

'দশ ফুটের মতো।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ করেই হিস্‌হিস্‌ জাতীয় একটা শব্দ শুনতে পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। তরঙ্গবিক্ষোভ জেগেছে ফুট বিশেক পিছনের পানিতে। সাপের মতো ফণা তুলতে শুরু করেছে বিশাল এক ঢেউ। ঘটনাটা দেখেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে না রানার, কারণ এ-রকম কিছু ঘটতে পারে কল্পনাও করেনি।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছে সোহানাও। হতবুদ্ধি হয়ে গেছে সে-ও। স্পষ্ট বুঝতে পারছে অবশিষ্ট দশ ফুট পার হওয়ার আগেই ছোবল হানবে দানবীয় স্রোত। প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে দু'জনের কে কোথায় পড়বে কে জানে।

হঠাৎ এমন এক কাজ করল রানা যে, সোহানার মনে হলো ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে রানার। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে ও। কয়েক কদম এগিয়ে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে সোহানাকে। ওকে জাপ্টে ধরে শুয়ে পড়ল নৌকার ভিতরে।

'কী...কী করছ?' চোখ বড় বড় করে রানাকে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'প্রেম,' বলেই সোহানার ঠোঁটে চুমু খেল রানা।

'কিন্তু...'

কথা শেষ করতে পারল না সোহানা। ওর মনে হলো কয়েক টন পানি যেন আছড়ে পড়েছে নৌকার পিছনে। প্রচণ্ড ধাক্কার প্রতিক্রিয়ায় সমুদ্র-সমতল থেকে কয়েক ফুট উপরে উঠে গেছে মোটরবোট। সোহানার মনে হচ্ছে ওর তলপেটের ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে হঠাৎ করেই।

ওরা দু'জনে দেখতে না পেলেও টের পেল, দশ ফুটের দূরত্ব আর আট ফুট প্রস্থবিশিষ্ট ফাটলটা পার হলো ওরা শূন্যে ভেসে। দু'-তিন সেকেণ্ড পরই প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল আবার। সোহানাকে

ছেড়ে দিয়ে মাথা তুলল রানা। সোহানাও উঠল।

প্রবালপ্রাচীরের দেয়াল পার হয়ে শান্ত একটা লেগুনে হাজির হয়েছে ওরা।

উঠে দাঁড়াল সোহানা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হঠাৎ হেসে ফেলল। 'এ-রকম পাগলামি করলে কেন?'

'পাগলামি না। দেখলাম আমি কষ্ট করে যা করতে যাচ্ছি তা আমার হয়ে ওই দানবীয় স্রোতই করে দেবে। কাজেই শুধু শুধু কষ্ট করার দরকার কী? খানিকটা সময় হাতে পেলাম, সে-সুযোগে একটু আদর করে নিলাম তোমাকে।' চারদিকে তাকাল রানা। 'সোহানা, মাই ডার্লিং, ওয়েলকাম টু গোট'স হেড লেগুন।'

সতেরো

'সকালে নৌকায় চড়ে গত আট ঘণ্টা টানা রোদে পোড়ার সঙ্গে তুলনা করলে এই জায়গা এককথায় বেহেশত,' বলল রানা।

লেগুনটার ব্যাস টেনেটুনে এক শ' ফুট হবে। উত্তর-দক্ষিণে সীমানা নির্দেশ করছে মানুষের হাতের বুড়ো আঙুলের মতো দেখতে দু'খণ্ড জমি। দু'জায়গাতেই জড়াজড়ি করে আছে পাইন আর তালগাছ। গোট'স হেড পাহাড়টার উচ্চতা আনুমানিক ষাট ফুট। ঢাল ভরে গেছে বিভিন্ন জাতের গাছপালায়। এগুলোর মধ্যে আঙুর আর বটগাছ চোখে পড়ে বেশি। অন্যদিকের ঢালটারও একই অবস্থা সম্ভবত। পাহাড় ছাড়িয়ে একটুখানি বাঁ দিকে তাকালে চোখে পড়ে সাদা বালির অর্ধচন্দ্রাকৃতির জমি, দেখতে

অনেকটা হাউস ডেকের মতো। রোদের তেজ কমে এসেছে, পশ্চিমাকাশে কিছুটা হেলে পড়েছে সূর্য, পুরো লেগুন ডুবে আছে গাঢ় ছায়ায়। পানি সম্পূর্ণ শান্ত এখানে। চিৎকার করতে করতে আকাশে চক্কর দিচ্ছে নাম-না-জানা একঝাঁক পাখি।

মুচকি হাসল সোহানা। 'ঠিকই বলেছ। খোলা সাগরের ঝলসানো রোদের সঙ্গে তুলনা করলে এই জায়গা বেহেশত। এবং রাত কাটানোর জন্য মন্দ না। আমার দৃষ্টিতে এই জায়গা ব্লু ওশান হোটেলের চেয়েও আকর্ষণীয়। কিন্তু আগেও জিজ্ঞেস করেছিলাম, আবারও জানতে চাচ্ছি, আমরা কি ঠিক জায়গায় এসেছি?'

'জানি না,' থ্রটলে হাত রেখে এতক্ষণ চারপাশ দেখছিল রানা, এবার তাকাল সোহানার দিকে। 'তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'কী?'

'একটা গুহার সন্ধান পেয়েছি আমরা,' হাত তুলে নির্দিষ্ট একটা জায়গা দেখাল রানা। তারপর ইঞ্জিন চালু করে হাল ঘুরিয়ে রওয়ানা হলো। কাছাকাছি পৌঁছে গতি কমিয়ে দিল অনেকখানি।

এই জায়গার পানি ঘড়ির কাঁটার দিকে পাক খেয়ে ঘুরছে। তবে ব্যাপারটা সহজে চোখে পড়ে না, অনেকক্ষণ খেয়াল করে দেখলে বোঝা যায়। অভিজ্ঞ কোনও ব্যক্তি এটা দেখামাত্র বলে দিতে পারবে, সাগরের লোনা পানি থেকে আলাদা হতে শুরু করেছে এই জায়গার পানি। আরেকটু এগোলে পানের উপযোগী পানির সন্ধান পাওয়া যাবে।

পায়ের কাছে পড়ে-থাকা ডাফল্ ব্যাগের ভিতর থেকে নিজের ডাইভিং গগল্সটা বের করল রানা। ওটা পরে নিয়ে উপুড় হয়ে মুখ ডুবাল পানিতে।

সারাদিন সূর্যের তাপে হয়তো গরম হয়ে ছিল পানি, কিন্তু এখন আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা, স্নিগ্ধ। হরেক প্রজাতির ছোট ছোট মাছ

দ্রুতগতিতে ছোটাছুটি করছে। প্ল্যাঙ্কটন জাতীয় খাবার ভেসে আসছে স্বাদুপানির স্রোতে, ওগুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিয়েছে মাছগুলো নিজেদের মধ্যে।

পানি থেকে মাথা বের করল রানা। তর্জনীটা পানিতে ডুবিয়ে নিয়ে তুলল মুখের কাছে, জিভে আলতো করে ছোঁয়াল।

'লোনা, নাকি মিষ্টি?' জানতে চাইল সোহানা।

'লোনা। কিন্তু সাগরের পানির চেয়ে অনেক কম। ধর' তিন ভাগের এক ভাগ।'

'তারমানে ধারেকাছে কোনও আণ্ডারগ্রাউণ্ড নদী আছে?'

'থাকার কথা,' গগলস খুলে ফেলল রানা। চুলে আঙুল চালিয়ে পানি ঝেড়ে ফেলছে। 'ঘটনাটা বিরল কিন্তু অসম্ভব না। এসব জায়গায় সাগরতীরে অনেক গুহা থাকে। কোনওটা হয়তো বেশি উঁচুতে, কোনওটা আবার সমুদ্র-সমতলে। উঁচু গুহাগুলো থেকে বৃষ্টির পানি নেমে আসে নীচের গুহাগুলোর দিকে। তৈরি হয় আণ্ডারগ্রাউণ্ড ইনল্যাণ্ড স্ট্রিম বা নদী। আমার মনে হয় রাম কে'র ম্যাপটা দেখা উচিত। আমার ধারণা লেক জর্জ থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে আছি আমরা। এমনও হতে পারে, স্বাদুপানির এই স্রোত গিয়ে পড়ছে লেক জর্জে।'

'হতে পারে। আবার না ও হতে পারে। আসলে...এই স্রোত কোথায় গিয়ে পড়ছে তা জানতে পারলে আমাদের বিশেষ কোনও উপকার হবে বলে মনে হয় না। তাই তোমার ওই ম্যাপ দেখার কর্মসূচী আপাতত স্থগিত থাকুক।'

'ঠিক আছে,' ঘড়ি দেখল রানা। 'জোয়ার আসতে আর আধ ঘণ্টা বাকি আছে।'

'তো?'

'ওই গুহায় কী আছে দেখতে চাইলে হাতে বড়জোর এক ঘণ্টা সময় পাচ্ছি আমরা। এর বেশি দেরি হলে আট ফুটের

ফাটলটা দিয়ে ভাটার আগে বের হতে পারবো কি না সন্দেহ।'

'কেন?'

'এই গুহা আর দশটা সাধারণ সাগর-গুহার মতো না। আণ্ডারগ্রাউণ্ড নদীটার উৎস থেকে উদ্বায়ী স্রোত তৈরি হতে পারে। তখন যদি আমরা ভিতরে থাকি, মরণফাঁদে আটকা পড়তে পারি। আবার স্রোতের টানে ভেসে যেতে পারি অন্য কোনও শাখা টানেলে, সেখান থেকে দ্বীপের কেন্দ্রবিন্দুতে। আমি চাই না দুটো ঘটনার কোনওটাই ঘটুক।'

'তারচেয়ে বরং অপেক্ষা করলে হয় না?'

'না। জোয়ারের পানি পাঁচ-ছ'ঘণ্টার আগে নামবে না। ততক্ষণ এখানে পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না।'

কথাটা কিছুক্ষণ ভাবল সোহানা। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। এখন বলো কীভাবে কী করতে চাও।'

'পঁচাত্তর ফুট লম্বা দড়ি আছে আমাদের সঙ্গে। বটগাছের শিকড়ের সঙ্গে একটা প্রান্ত বাঁধবো। আরেক প্রান্ত আমার ওয়েটবেল্টের সঙ্গে। যদি কোনও বিপদে পড়ি, মানে উল্টোপাল্টা স্রোতের কবলে পড়ে যাই, দড়ি ধরে টেনে বের করে নিয়ে আসতে পারবো নিজেকে।'

'কোনও বিপদে পড়োনি জানবো কীভাবে?'

'প্রতি ষাট সেকেণ্ড পর পর তিনবার টান দেবো দড়িতে। যদি না দিই, বুঝে নিয়ো বিপদে পড়েছি। তখন টেনে তোলার চেষ্টা কোরো।'

'কতক্ষণ থাকবে নীচে?'

জবাব দেয়ার আগে একটু ভাবল রানা। 'পনেরো মিনিট। এক সেকেণ্ডও বেশি না। উঠে আসার আগে সিগনাল দেবো।'

'যেমন?'

'তিনবারের বদলে ছ'বার টান দেবো।'

চোখ সরু করে রানার দিকে তাকাল সোহানা। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নিচু গলায় বলল, 'সাবধান থেকো, রানা।'

দশ মিনিট পর।

নৌকার গলুইয়ে বসে আছে রানা। পরনে ডাইভিংস্যুট। খুব সাবধানে নৌকাটা চালিয়ে এনে পাহাড়ি দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখেছে সোহানা। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সাবধানে উঠে দাঁড়াল রানা। পাহাড়ি দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে আছে বটগাছের শক্ত শিকড়, ওটার সঙ্গে কায়দা করে বাঁধল দড়ির একটা প্রান্ত। এরপর সময় নিয়ে বসে পড়ল। নিজের ওয়েটবেল্টের ডি-রিঙে বাঁধল আরেকটা প্রান্ত। থ্রটলে হাত রাখল সোহানা, দেয়াল থেকে দশ ফুট দূরে এসে নিউট্রাল করে দিল ইঞ্জিন।

মাস্কের কাচে, ভিতরের দিকে থুতু দিয়ে ধুয়ে নিল পানিতে, পরে নিল জায়গামতো। ফিনদুটো পরল পায়ে। রেগুলেটর ঘুরিয়ে দেখে নিল অক্সিজেন-বোতলের এয়ারফ্লো ঠিক আছে কি না। সোহনার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

'গুড লাক,' মাথা ঝাঁকাল সোহানাও।

আর দেরি করল না রানা। মাস্কটা চেহারায় ঠিকমতো বসিয়ে নিয়ে ঝুঁকে পড়ল পিছনদিকে। ঝপাস করে আওয়াজ হলো। সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল ও।

টানা কয়েকটা মুহূর্ত ধরে কিছুই করছে না রানা। টের পাচ্ছে গভীর থেকে আরও গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এই হঠাৎ নিমজ্জন উপভোগ করছে। শান্ত পানির স্ফটিক-স্বচ্ছতাও ভালো লাগছে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও। বুদবুদ আর ফেনা পরিষ্কার হয়ে গেল একসময়। ততক্ষণে যথেষ্ট নীচে নেমে এসেছে

রানা। পানিতে বিশেষ কায়দায় লাথি মেরে সোজা হলো। বানমাছের মতো ডাইভ দিয়ে নামতে শুরু করল আরও নীচে। স্রোত জোরালো হচ্ছে, টান লাগছে শরীরে। ঘাড় তুলে উপরের দিকে তাকাল ও। রোদ চোখে পড়ে। মনে হয় সূর্যটা যেন আকাশ ছেড়ে নেমে এসেছে, ভাসছে পানিতে।

মাথা সোজা করল রানা। ফুট দশেক দূরে পাহাড়ি দেয়াল। হাত উঠিয়ে ডাইভিংলাইটটা জ্বালল ও। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ডুবসাঁতার দিয়ে এগোতে শুরু করল দেয়ালটার দিকে। অন্ধকার একটা গুহা যেন হাঁ করে ওকে গিলে খাওয়ার জন্য ওঁত পেতে অপেক্ষা করছে।

গুহার প্রবেশপথটা মোটামুটি অর্ধবৃত্তাকৃতির। চওড়ায় দশ কি বারো ফুট আর লম্বায় বিশ ফুট, অনুমান করল রানা। ওটার মুখের শীর্ষপ্রান্ত ভাটার সময় লেগুনের পানি থেকে অল্প কিছু উপরে উঠে থাকে হয়তো। যে-দিকটা পানির উপরে থাকে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে জন্মে আছে কিছু ঝোপঝাড়, তাই গুহাটা সহজে চোখে পড়ে না।

'ছাগলের মাথার ব্যাপারটা জানা না থাকলে,' ভাবল রানা, 'এই গুহা কোনওদিন খুঁজে বের করতে পারতাম কি না সন্দেহ।'

আরেকবার ডাইভ দিল ও, আরও নীচের দিকে নামছে। হাজির হলো লেগুনের তলদেশে। নীচের বালি স্পর্শ করল হাত দিয়ে। ডুবসাঁতার দিয়ে এগোতে শুরু করল সামনে দিকে। বিশ ফুটের মতো যাওয়ার পর হঠাৎ করেই অন্ধকার গিলে নিল ওকে।

ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল রানা। সারফেস রিফ্লেকশনের কারণে গুহার মুখটা দেখা যাচ্ছে না আর। হাতঘড়ি দেখল ও। কোমরের সঙ্গে বাঁধা দড়িতে টান দিল পর পর তিনবার।

এখানকার পানি বেশ ঠাণ্ডা। বিপরীতমুখী একটা স্রোত বইছে

কোত্থেকে যেন, উৎসটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু স্রোত যে বইছে সে-ব্যাপারে রানা নিশ্চিত, যদিও ওটা তেমন জোরালো না। সাঁতার থামালে গায়ে ঠেলা মারে, ডানদিকে নিয়ে যেতে চায়। আরও সামনে আরও জোরালো হতে পারে স্রোতটা, ভাবল রানা।

অনুমানটা ঠিক প্রমাণিত হতে বেশি সময় লাগল না। আরও দশ গজের মতো এগিয়ে দেখল, যথেষ্ট জোরালো হয়েছে স্রোতটা ইতোমধ্যে। দু'বার ডিগবাজি খেতে বাধ্য হয়েছে ও। মনে হয় অদৃশ্য কোনও হাত যেন খেলছে ওকে নিয়ে। ঘূর্ণিস্রোত, কথাটা মনে মনে আউড়াল রানা। আসলে সাহস দিতে চাচ্ছে নিজেকে। স্রোতের দিকে গা ভাসিয়ে পিছিয়ে এল খানিকটা। হাতঘড়ি দেখল আবারও।

লেগুনের উপরিভাগ প্রায় স্রোতহীন হলেও নীচে জলপ্রবাহ আছে। এই প্রবাহের সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছে আণ্ডারগ্রাউণ্ড নদীটার স্রোতের। উষ্ণ স্রোতের নীচ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে শীতল স্রোত। ফলে তৈরি হচ্ছে হাইড্রোলিক টর্নেডো, সোজা বাংলায় ঘূর্ণিস্রোত।

এদিক-ওদিক তাকাল রানা। যে-জায়গায় ঘূর্ণি জেগেছে সেখান থেকে দূরে আছে ও। তবে ঘূর্ণির ধাক্কা থেকে বাইরে না, জোরালো স্রোত থেকে থেকে বাড়ি মারছে গায়ে। অনতিদূরে পাহাড়ি দেয়াল। হাইড্রোলিক টর্নেডো থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে আবার এগোতে শুরু করল রানা। কাছে পৌঁছে সিযর্স-কিক দিল কয়েকবার। উঠে গেল অনেকখানি উপরে, পানির উপরিতলের কাছাকাছি। দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে চোখা একটা প্রান্ত আঁকড়ে ধরল সাবধানে। একটা খাঁজে ঢুকিয়ে দিল এক পায়ের গোড়ালি। অন্য পায়ে বাড়ি মারছে জোরালো স্রোত।

'পা-টা কোমর থেকে আলগা করতে পারলে খুশি হও, না?' মনে মনে বলল রানা, হাত তুলে সময় দেখল। দু'মিনিট গেছে।

আরও আট মিনিট বাকি আছে। দড়ি ধরে টান মারল তিনবার। একভাবে ঝুলে থেকে দম নিল কিছুক্ষণ। আবারও এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কান খাড়া।

দিশেহারা স্রোত একটু পর পর এসে বাড়ি খাচ্ছে দেয়ালে। বুদবুদ ওঠার মতো শব্দ হচ্ছে থেকে থেকে। অদ্ভুত একটা শব্দ আসছে গুহার আরও ভিতরের কোনও জায়গা থেকে। এগুলো বাদ দিয়ে বললে চারপাশে অখণ্ড নীরবতা। ব্যাপারটা কেমন আতঙ্কিত করে তোলে মনকে।

যে-হাতটা খালি আছে, দাঁত দিয়ে কামড়ে সেটা থেকে গ্লাভ খুলে ফেলল রানা। হাত তুলল পানির উপরে। সঙ্গে সঙ্গে ভেজা চামড়ায় চুমু দিল বাতাস। লক্ষণ ভালো। সন্তুষ্ট হলো রানা। ভেবেছিল গুহার বেশি ভিতরে যাওয়া যাবে না। ভেবেছিল, আণ্ডারগ্রাউণ্ড নদীটাতে হয়তো দূষণ ঘটেছে এত বছরে; বেশি ভিতরে ঢুকলে কমে যাবে মাছের সংখ্যা, বিবর্ণ হয়ে যাবে পাথর, মরা স্পঞ্জ ভেসে বেড়াবে স্রোতের ধাক্কায়, দূষিত গ্যাসের বুদ্‌বুদ্‌ উঠবে একটু পর পর। কিন্তু তাজা বাতাস সব শঙ্কা দূর করে দিয়েছে।

মুখ থেকে রেগুলেটর বের করল রানা। নাক পানির উপর উঠিয়ে বুক ভরে দম নিল কয়েকবার। দড়ি ধরে আবারও টান দিয়ে সোহানাকে বুঝিয়ে দিল সব ঠিক আছে। তারপর গ্লাভটা পরে নিয়ে রেগুলেটর ঢুকাল মুখে। ডুব দিল। খানিকটা নামার পর ডাইভ দিল দু'বার। এদিকে-ওদিকে ঘাড় ঘুরাচ্ছে বার বার।

ঠিক পথেই এগোচ্ছে জানতে বেশি সময় লাগল না। মাথার আট-দশ ফুট উপরে ঝুলছে জং-ধরা স্টিলের কয়েকসারি কেবল। সেগুলোতে কায়দা করে এবং যথেষ্ট মজবুতভাবে বসানো হয়েছে তক্তা, তৈরি হয়েছে পায়েচলা সঙ্কীর্ণ পথ—ক্যাটওয়াক। ওটা অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে বিপরীত দিকের দেয়ালে।

কাঠের একটা মেকশিফট পিয়ার দেখা যাচ্ছে ওখানে। পিয়ারটা দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো গুঁড়ির উপর ভর দিয়ে।

নীচের দিকে তাকাল রানা। গুঁড়িগুলোকে সাগরের মেঝেতে, বালির অনেক গভীর পর্যন্ত পোঁতা হয়েছে। উপরের দিকে তাকাল ও। প্রথম ক্যাটওয়াকের সঙ্গে বসানো হয়েছে আরেকটা ক্যাটওয়াক। দূরের দেয়ালটার সঙ্গে উল্লম্বভাবে যুক্ত সেটা।

এই সেট-আপকে কোনও বিচারেই অত্যাধুনিক বলা চলে না। কিন্তু কেউ একজন অথবা একাধিক লোক সময় ও শ্রম দিয়েছে এটার পিছনে। স্টিল কেবলের মরচে আর তক্তার গায়ে লেগে-থাকা আঠালো কাদা বলে দেয় যে বা যারাই বানিয়ে থাকুক এটা, অনেক বছর আগে বানিয়েছে।

গুহার আরও গভীরে ঢুকল রানা, নামল আরও কয়েক ফুট। এখন ওর মাথার ফুট বিশেক উপরে ছাদ, স্ট্যালাকটাইটে ভরা। দেয়াল মনে করে একদিকে আলো ফেলল ও। কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ে না ওই জায়গায়।

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। ভেবেছিল আণ্ডারগ্রাউণ্ড নদীটার জোরালো স্রোত হাজার বছর ধরে পাহাড়ি দেয়ালে বাড়ি মেরে মেরে বানিয়েছে এই গুহা। আবার এমনও হতে পারে, সমুদ্রের নীচে ভূমিকম্প হয়েছিল কখনও, দেয়াল ধসে পড়ে তৈরি হয়েছে বড় একটা গহ্বর। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে এই গুহা আসলে একটা অ্যান্টিচেম্বার। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না বাঁক নিয়ে কতদূর এগিয়েছে গুহাটা, কোন্‌দিকে গেছে।

ক্যাটওয়াক আর পিয়ারটা কি একটা-দুটো সাবমেরিনের সার্ভিসিং-এর জন্য যথেষ্ট? মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল রানা। কিছুক্ষণ ভেবে উত্তরটা বুঝে নিল নিজেই। ব্যাপারটা আসলে নির্ভর করছে কীরকম আর কতখানি সার্ভিসিং দরকার তার উপর। যদি তা-ই হয় তা হলে আরেকটা প্রশ্ন দেখা দেয়। সার্ভিসিং বা

রিফিটিং-এর কাজ যদি কম হয় তা হলে খোলা সাগরে ম্যাক্সিমিলানের সঙ্গে যুক্ত থাকা অবস্থাতেই তো সেরে নেয়া যেত। এত কষ্ট করে এতদূর...

না, নির্দিষ্ট কোনও সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না। অপিকে জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে নতুন কোনও তথ্য পাওয়া গেছে কিনা।

ক্যাটওয়াকের দিকে এগোতে যাবে, এমন সময় টান পড়ল রানার কোমরে। ভ্রূ কুঁচকে গেল আপনা থেকে। একটু আগে না আণ্ডারগ্রাউণ্ড নদীর স্রোত পাশ কাটিয়ে এসেছে ও? বিনা নোটিশে আবার কোনও স্রোত এসে পড়ল নাকি?

অন্যমনস্ক থাকায় ব্যাপারটা বুঝতে একটু দেরি হলো রানার। স্রোত না, টান পড়ছে কোমরের দড়িতে। এবং খুব ঘন ঘন, জোরালোভাবে।

তারমানে কিছু একটা হয়েছে সোহানার। সম্ভবত বিপদে পড়েছে।

চট্ করে শরীর মুচড়ে ফেলল রানা। ডিগবাজি খেল মুহূর্তের মধ্যে। ডাইভ দিল নীচের দিকে। সিযর্স-কিক দিয়ে এগিয়ে চলল গুহামুখ বরাবর, যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে।

লেগুনের শান্ত পানিতে আলোর প্রতিফলন। রানা ঠিক করল চট করে মাথা তুলবে না। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে উঠবে। এদিক-ওদিক তাকাল কয়েকবার। উপযুক্ত জায়গাটা চোখে পড়তে সময় লাগল না। পাহাড়ি দেয়াল ঘেঁষে ভাসছে ঘন নলখাগড়া। ওখান থেকে মাথা তুললে কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম।

আরও কিছুটা উঠল রানা। ভাসন্ত নলখাগড়ার শিকড়ের কাছে যেন ঝুলে থাকল কিছুক্ষণ। খেয়াল রেখেছে যে-বুদবুদগুলো ছাড়ছে তা যেন পাহাড়ি দেয়াল ঘেঁষে ওঠে, অন্যপাশে না যায়। তারপর একসময়, অনেকটা হঠাৎ করেই মাথা তুলল ও।

জলপর্দাটা আচমকা সরে গেল চোখের সামনে থেকে।

সোহানার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু ইচ্ছাটাকে জোর করে চেপে রাখল রানা। এদিক-ওদিক তাকাল।

খাঁ খাঁ করছে পুরো লেগুন। ডিঙি নৌকাটা উধাও।

সোহানার কোনও চিহ্ন নেই।

আঠারো

ধক্ করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। প্রচণ্ড একটা আতঙ্কে অবশ হয়ে আসতে চাচ্ছে হাত-পা। লম্বা করে দম নিল ও। ছাড়ল আস্তে আস্তে। মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করছে, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। লেগুনের একদিকের তীরে, ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বের হয়ে-থাকা সোহানার হাতটা দেখতে সময় লাগল না। সিগনাল দিচ্ছে ও: অপেক্ষা করো।

কয়েক মুহূর্ত পর.ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিল সোহানা। কানের লতিতে আঙুল দিয়ে টোকা দিল দু'বার, তারপর হাত তুলে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করল। ডান তর্জনীটা চক্রাকারে পাক খাওয়াল কয়েকবার।

দশ সেকেণ্ড কাটল। তারপর বিশ। কাটল পুরো এক মিনিট। তারপর শোনা গেল আওয়াজটা—হেলিকপ্টারের ব্লেডের গর্জন। প্রথমে মৃদু। আস্তে আস্তে জোরালো হচ্ছে। কাছিয়ে আসছে ওটা।

বিপদ টের পেল রানা। নলখাগড়ার আড়ালে ঢুকে গেল আবার। ফাঁক দিয়ে তাকাল আকাশের দিকে।

মাথার ঠিক উপরে পাহাড়ের চূড়া। ওটার আড়াল থেকে প্রথমে দেখা গেল ঘূর্ণায়মান রোটর ব্লেডগুলো। এক মুহূর্ত পরই দেখা মিলল বাঁকানো প্লেক্সিগ্লাস-উইণ্ডস্ক্রিনের, গায়ে রোদের প্রতিফলন। বাতাসের ধাক্কায় কৃত্রিম স্রোত জেগেছে লেগুনের পানিতে। অদ্ভুত এক কুয়াশায় ভরে যাচ্ছে চারপাশের বাতাস।

শুধু নাক থেকে মাথার উপরের অংশ পানির উপর ভাসিয়ে রেখেছে রানা। সোহানা যেদিকে আছে সেদিকে তাকাল। উধাও হয়ে গেছে মেয়েটা।

মনে হলো কয়েক মিনিট, কিন্তু আসলে বড়জোর ত্রিশ সেকেণ্ড ধরে লেগুনের উপর চক্কর দিয়ে বেড়াল হেলিকপ্টারটা। তারপর পাক খেয়ে সরে গেল, রওয়ানা হলো দক্ষিণ দিকে, উপকূলরেখা বরাবর। রোটর ব্লেডের আওয়াজ ক্ষীণ থেকে আরও ক্ষীণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। তারপর ডুবসাঁতার দিয়ে দ্রুত এগোতে শুরু করল সোহানা যেদিকে আছে সেদিকে। কাছাকাছি পৌঁছানোমাত্র হাত বাড়িয়ে ওকে নিজের দিকে টেনে নিল সোহানা। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে ঝোপঝাড়ের আরও ভিতরের দিকে ঢুকে গেল দু'জনে।

'ওরা এসে গেছে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'মনে হয়,' বলল রানা।

'আশ্চর্য! এত তাড়াতাড়ি জানল কীভাবে?'

'কীভাবে জেনেছে জানি না। কিন্তু জেনেছে।'

'কপ্টারটা দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'দামি। বেল চার শ' ত্রিশ। চল্লিশ লক্ষ ডলারের কম না।'

'তা না হলে আবার কীসের মাফিয়াসর্দার?' সোহানার কণ্ঠে ব্যঙ্গ।

'কপ্টারটা শুধু দামের না, কাজেরও। ভিতরে চালক ছাড়া

আরও ন'জন বসতে পারে। একজন ধরে নিচ্ছি নিয়াযভ বা মেলিখান। বাকিরা তাদের হুকুমবরদার। ওরা দেখতে পেয়েছে তোমাকে?'

'শিওর না। প্রথমবার যখন এল, অনেক দ্রুত উড়ছিল। আমি কিছু টের পাওয়ার আগেই লেকের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে চলে গেল সাঁ করে। ফিরে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। দু'বার চক্কর খেল। ততক্ষণে আমি সরে এসেছি এই জায়গায়। আমার কী মনে হয় জানো?'

'কী?'

'যেভাবেই হোক ছাগলের মাথার ব্যাপারটা জেনে গেছে ওরাও। অথবা জানতে পেরেছে এখানে আছি আমরা।'

'দু'নম্বরটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আমাদের মোটরবোট কোথায়?'

আঙুলের ইশারায় বাঁ দিকে দেখাল সোহানা। ঘাড় ঘুরিয়ে রানা দেখল ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বের হয়ে আছে একটুখানি ধূসর রাবার। সোহানার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল ও।

'তাড়াহুড়ো করতে হয়েছে,' হাসল সোহানাও। 'ডিঙিটাকে বেশি ভিতরে ঢোকাতে পারিনি।'

'ভালো,' কী যেন ভাবল রানা। 'চলো গিয়ে গুহায় ঢুকি দু'জনে। ওরা যদি সিদ্ধান্ত নেয় নীচে নেমে তল্লাশি করবে, এখানে থাকলে ধরা পড়ে যাবো। কাজেই লুকাতে হলে এখন ওই গুহাই সবচেয়ে নিরাপদ আমাদের জন্য।' কপ্টারটা ফিরে আসছে কি না শোনার জন্য কান পাতল। তারপর গিয়ার খুলে দিল সোহানাকে।

দেরি না করে ওগুলো পরতে শুরু করল সোহানা। জানতে চাইল, 'কী করতে যাচ্ছি আমরা?'

'সাঁতরে গিয়ে গুহায় ঢুকে পড়বে তুমি। অপেক্ষা করবে

আমার জন্য। খেয়াল রেখো, ভিতরে শক্তিশালী ঘূর্ণিস্রোত আছে, ঘড়ির কাঁটার দিকে। মনে হয় এতক্ষণে আরও শক্তিশালী হয়েছে, কারণ জোয়ার আসছে। দড়ির একটা প্রান্ত কোমরে জড়িয়ে নাও। বেশি ভেতরে ঢোকার দরকার নেই। গুহামুখের কাছাকাছিই থেকো।'

'আমি যদি দড়ি ধরে তিনবার টান দিই তা হলে বুঝে নিয়ো বিপদে পড়েছি। আর দু'বার টান দিলে সব ঠিক আছে।'

'বুঝেছি। চেষ্টা করবো ডিঙিটাকে আরও ভিতরে নিয়ে যেতে যাতে ওরা দেখতে না পায়। মনে হচ্ছে অন্ধকার নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে। তারপর দেখা যাবে কী করা যায়।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা, কোমরে দড়ি পেঁচানো শেষ করেছে। শেষবারের মতো চারদিকে তাকাল। তারপর ডাইভ দিয়ে ডুবে গেল পানিতে। ডুবসাঁতার দিয়ে এগোতে শুরু করল গুহামুখের দিকে।

সোহানা যে-বুদবুদগুলো ছাড়ছে সেদিকে তাকিয়ে থাকল রানা কিছুক্ষণ। তারপর এগোল বাঁ দিকে, ডিঙির কাছে পৌঁছাল। স্থির হয়ে দাঁড়াল বেলেমাটিতে। খেয়াল রেখেছে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে শরীর যেন বের না হয়। কান পাতল আবার। না, কপ্টারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না।

বোটের ভিতরে দুটো সী-লাইন ব্যাগ আছে, আলগা দড়িদড়া গুটিয়ে নিয়ে ও-দুটোতে ভরল রানা। কী মনে হতে পানির নীচে একটা কীলক গুঁজে তাতে আটকে দিল ব্যাগটা। ডিঙির আট-ফুট লম্বা পেইন্টার লাইনটা জড়িয়ে নিল কোমরের বেল্টের সঙ্গে। তারপর ডুব দিল পানিতে। ব্রেস্টস্ট্রোক দিয়ে এগোতে শুরু করল গুহামুখের দিকে। অর্ধেকটা এগিয়েছে, এমন সময় সৈকতের দিক থেকে শোনা গেল রোটরের আওয়াজ।

সাঁতার কাটতে কাটতেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা। তালগাছগুলোর সারি ছাড়িয়ে উঠে এসেছে হেলিকপ্টারটা। চোখের পলকে একেবারে কাছে এসে পড়ল। বলতে গেলে রানার ঠিক উপরে এখন। স্থির হয়ে ঝুলে আছে শূন্যে। তলপেটে অদ্ভুত এক সুড়সুড়ি টের পেল রানা।

কপ্টারের দরজাটা খোলা। কালচে ওভারকোট পরা একটা লোক উঁকি দিল আচমকা। রানা ভেবেছিল রে হোগানের কিডন্যাপার নিয়াযভ হবে, কিন্তু মেলিখানের চেহারাটা চিনতে পেরে আশ্চর্যই হলো। ওকে এই লোকের ছবি ই-মেইল করেছিল সোহেল। আরও একটা জিনিস চিনতে পেরে রানার তলপেটের সুড়সুড়ানি বেড়ে গেল। মেলিখানের হাতে চকচকে সাবমেশিনগান।

হাঁ করে লম্বা দম নিল রানা। এমন ভঙ্গিতে পানির উপর মাথা তুলল যেন ভয় পেয়ে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ডুব দিল, বানমাছের মতো ডাইভ দিয়ে নেমে গেল কয়েক ফুট। একইসঙ্গে জোরে পা চালাচ্ছে পানিতে, দিক বদলে সরে যাচ্ছে বেশ কিছুটা।

সাবমেশিনগানের আওয়াজ শুনতে পেল রানা। একটানা গুলি করছে মেলিখান। চোখের কোণ দিয়ে দেখছে রানা, বুলেটগুলো ঢুকছে পানিতে, সাদা ফেনা তৈরি করে উধাও হয়ে যাচ্ছে নিমিষে। কোমরের সঙ্গে পেঁচানো থাকার কারণে রাবারের বোটটা বেরিয়ে এসেছিল খোলা পানিতে, গুলি লেগে ফুটো হয়ে গেছে ওটার বাতাসভর্তি টিউব, প্রচণ্ড শব্দ করে চুপসে যাচ্ছে এখন।

যেন রানার চেয়ে বোটটার উপরই বেশি রাগ মেলিখানের, তাই ওটাকে ঝাঁঝরা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হলো না সে। বুলেটের ধাক্কায় বার বার কেঁপে উঠছে বোটটা। টিউব এখানে-সেখানে ফুটো হয়ে গিয়ে হিসহিস আওয়াজ তুলছে। ওটার পক্ষে মোটরের

ভার সহ্য করা সম্ভব না এখন আর। চুপসে গিয়ে মোটরসহ ডুবতে শুরু করল ওটা।

পানির নীচে একটা মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল রানা। কোমর থেকে ডিঙির দড়ি আলগা করে দিচ্ছে যাতে মোটরের ভারে সাঁতরাতে অসুবিধা না হয়। বাঁধনমুক্ত হওয়ামাত্র আবার পা ছুঁড়তে শুরু করল। বুলেটবৃষ্টি বন্ধ হয়েছে আপাতত। সম্ভবত রিলোড করছে মেলিখান। সুযোগটা নিল রানা। আরেকটু দূরে সরে গেল।

গুহামুখের প্রায় কাছে পৌঁছে গেছে, এমন সময় আবার শুরু হলো গুলিবর্ষণ। পিছু ফিরে তাকিয়ে সময় নষ্ট করতে চাইল না রানা। শুনতে পাচ্ছে গুলির আওয়াজ, পানি ভেদ করে বুলেট ঢোকার শব্দ, এমনকী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে লেগুনের তলদেশে গিয়ে সেগুলোর বিদ্ধ হওয়ার মৃদু আওয়াজ।

গুহামুখে ঢোকামাত্র চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। এমনকী সাবমেশিনগানের আওয়াজ অথবা ঘুরন্ত রোটরের শব্দও চাপা পড়ে গেছে অনেকখানি।

খানিকটা নিশ্চিন্ত মনে এগোতে যাচ্ছিল রানা, পায়ে কীসের যেন টান খেয়ে থমকে যেতে হলো। অন্ধকারে ঠিকমতো দেখাও যাচ্ছে না। একটু থামল রানা। সমস্যাটা কী বোঝার চেষ্টা করছে। ডান পায়ের গোড়ালির কাছটা জড়িয়ে ধরেছে কী যেন। ওকে টানছে নীচের দিকে। বুকের ভিতরে হাতুড়ির বাড়ি পড়ল। জায়ান্ট অক্টোপাস?

কিন্তু এই লেগুনে অক্টোপাস আসবে কোত্থেকে? ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালিয়ে নীচের দিকে তাকাল রানা। ডিঙির দড়ি কোমর থেকে খসিয়ে ভেবেছিল বাঁধনমুক্ত হতে পেরেছে। কিন্তু আসলে তা না। কোমর থেকে খসলেও পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে দড়ি। উত্তেজনায় খেয়াল করেনি রানা। স্রোতের চাপে জড়িয়ে আছে পায়ের সঙ্গেই। চুপসে যাওয়া ডিঙিটাও আসছে সঙ্গে সঙ্গে।

এতক্ষণ কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু এখন গুহার শক্তিশালী ঘূর্ণির কবলে পড়ে গেছে ওটা। তলিয়ে যেতে পারছে না, রানার পা থেকে খসতেও পারছে না। ঘূর্ণি টানছে ওটাকে নীচের দিকে। তাই রানাও এগোতে পারছে না। টের পেল, কিছুক্ষণের মধ্যে ঘূর্ণির কবলে পড়ে যাবে ও।

ফুসফুস আকুলিবিকুলি করছে বাতাসের জন্য। দপদপ করছে বুকের ভিতরে। ডান পা-টা দু'-তিনবার টানল রানা, কিন্তু আলগা হওয়ার বদলে আরও যেন এঁটে বসছে দড়ির বাঁধন। কোমরের বেল্ট থেকে ছুরি বের করল ও। পা-টা বুকের কাছে তুলে এনে পোঁচ দিতে যাবে, এমন সময় বাড়ি মারল স্রোত। হাত থেকে আলগা হয়ে গেল ছুরির বাঁট, ছুটে এসে বাড়ি খেল বুকের সঙ্গে। ধক করে উঠল বুকের ভিতরে। বাঁটটা খামচে ধরল রানা।

আবার পা তুলল ও। কিন্তু স্রোতের কথা মাথায় রেখে পোঁচ দিল না সঙ্গে সঙ্গে। প্রথমে খেয়াল করল দড়িটা টান টান হয়েছে কি না। তারপর হাত নামিয়ে ছুরির ফলা স্পর্শ করাল দড়ির সঙ্গে। এরপর জবাই করার মতো করে ছুরি চালিয়ে কেটে ফেলল দড়ি।

দ্রুত পা চালাল রানা। আর পারছে না। এবার শুধু বুকেই না, দপদপানি শুরু হয়েছে মাথার ভিতরেও। মনে হচ্ছে যে-কোনও মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে যাবে। ক্যাটওয়াকের কাছে পৌঁছে মাথা তুলল পানির উপরে। এখানে বাতাস আছে। হাঁ করে দম নিল কিছুক্ষণ। সোহানার নাম ধরে ডাকতে যাবে, এমন সময় টের পেল ঘূর্ণির কবলে পড়ে গেছে। স্রোত নীচের দিকে টানছে ওকে।

ছুরিটা কোমরের বেল্টে ঢুকিয়ে রেখে এদিক-ওদিক তাকাল রানা, খুঁজছে সোহানাকে। ক্যাটওয়াকের উপর থেকে উঁকি দিল উদ্বিগ্ন চেহারাটা। 'রানা, কী...'

'কিছু বোলো না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা। 'প্রচণ্ড ঘূর্ণি

জেগেছে গুহার পানিতে। আর দু'-এক মিনিট দেরি হলে স্রোতের টানে তলিয়ে যাবো। আমার একটা হাত ধরো তোমার দু'হাত দিয়ে। শক্ত করে ধরে রাখবে যাতে পিছলে না যায়। আরেক হাতে তক্তা আঁকড়ে ধরছি আমি। দু'পা আটকে নিয়েছি দেয়ালের খাঁজে। উপরে উঠে আসার চেষ্টা করবো।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। দু'হাতে ধরল রানার একটা হাত। ক্যাটওয়াকের একটা তক্তা শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে রানা। সোহানা যে-হাতটা ধরেছে সেটা কনুইসহ তুলে ফেলেছে তক্তার উপর। দু'পা দেয়ালের খাঁজে খাঁজে আটকে হাঁটছে বাঁকা হয়ে, শরীরটা একটু একটু করে উঠে আসছে পানির উপর।

সুবিধামতো দূরত্ব অতিক্রম করার পর হাত দুটো পালাক্রমে সরিয়ে দেয়ালের আরেকটু কাছে সরে গেল রানা। এখন দু'হাতে আরও ভালোমতো জড়িয়ে ধরতে পারছে তক্তা। প্রচণ্ড স্রোতের ভিতর থেকে একটু একটু করে উপরে তুলল শরীর। তারপর দু'হাতে ভর দিয়ে পা দুটোও তুলে ফেলল তক্তার উপরে।

হাঁপাচ্ছে ও। ওর পাশে এসে বসল সোহানা, আলতো করে হাত রাখল কাঁধে। নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক আছো?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তুমি?'

'আমিও ঠিকঠাক।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সোহানা। চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'রানা, আমাদের এখানে বেশিক্ষণ থাকাটা ঠিক না। আমাদেরকে শেষ করে দিতে এসেছে ওরা। আমাদের লাশ না দেখা পর্যন্ত ক্ষান্ত দেবে না।'

রানা জানে ঠিক বলেছে সোহানা। আরও জানে, মাত্র দুটো অপশন আছে ওর হাতে। এক, যে-পথে ঢুকেছে এখানে সেখান দিয়ে বাইরে বের হওয়া। সেক্ষেত্রে সাবমেশিনগানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে খালিহাতে এবং মরতে হবে নির্ঘাত। দুই,

আপাতত লুকিয়ে থাকতে হবে এবং সুবিধামতো সময়ে পালাতে হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, কোথায় লুকানো যায়? এদিক-ওদিক তাকাল রানা। এই গুহার কোথায় কী আছে জানে না ও। জানে না এখান থেকে আদৌ বের হওয়া যায় কি না। কিন্তু এখন বাঁচতে চাইলে জানতে হবে। এবং জানতে হলে খুঁজতে হবে।

আরেকটা প্রশ্ন উঁকি দিল ওর মনে। হামলাকারীরা নিঃসন্দেহে অপেক্ষা করছে বাইরে, কিন্তু কতক্ষণ করবে? পানি বাড়ছে, স্রোতের তীব্রতাও বাড়ছে। গুহামুখ দিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করা আর আকাশে ওড়ার চেষ্টা করা এখন সমান কথা। কিন্তু ভাটার সময় স্রোত এত জোরালো থাকবে না। তখন?

সোহানার হাত থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা নিল রানা। আলো ফেলছে এদিকে-ওদিকে। মাথার উপরে, কিছুটা দূরে চকচক করছে কী যেন। স্থিরদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা। পেটানো টিন দিয়ে বানানো হয়েছে জিনিসটা। রঙ করা হয়েছিল এককালে, তার ছিটেফোঁটা বাকি আছে শুধু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপারে কিছু-না-কিছু জানে, এ-রকম যে-কেউ চিনতে পারবে চার ফুট বাই তিন ফুট আয়তাকৃতির জিনিসটাকে।

‘ক্রিগস্‌মেরিন নাৎসি পতাকা,’ নিচু গলায় বলল সোহানা। ‘জার্মানদের গর্ব।’

মন্তব্য করল না রানা। খেয়াল করল শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ওর। সাবধানে উঠে দাঁড়াল। ফ্ল্যাশলাইটটা বাড়িয়ে ধরল সোহানার দিকে। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল কী করতে চায়। তারপর পায়ে পায়ে এগোতে লাগল পতাকাটার দিকে।

ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করছে কয়েক যুগের পুরনো তক্তা, পরোয়া করছে না রানা। স্টীলের দড়িগুলোরও শব্দ করে জানান দিচ্ছে, সত্যিই মরচে ধরেছে ওদের গায়ে। পুরো ক্যাটওয়াক পার

হয়ে শেষমাথায় গেল ও। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরেসুস্থে ফিরে এল সোহানার কাছে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল সোহানা। 'কী?'

'ভিতরে আরেকটা গুহা দেখলাম। তীব্র স্রোত হাজার বছর ধরে পাহাড়ের দেয়ালে বাড়ি মেরে মেরে গুহাটা তৈরি করেছে সম্ভবত। কোনাকুনিভাবে আরও কয়েকটা দেয়ালও আছে ভিতরে। দুটো টানেল দেখলাম, দূর থেকে একটাকে আরেকটার সঙ্গে ইংরেজি ভি-এর মতো দেখায়। একটা গেছে বাঁ দিকে, কিছুটা উপরে উঠেছে। আরেকটা ডানদিকে গিয়ে নীচে নেমে গেছে। বাঁ দিকের টানেল থেকে পানি বের হয়ে এসে অর্ধেক ঢুকছে এখানে, বাকি অর্ধেক চলে যাচ্ছে ডানদিকের টানেলে।'

'তার মানে এখান থেকে কোনও নদীর শুরু হয়েছে বলতে চাও?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'হতে পারে।'

'নদীটা কতদূর পর্যন্ত গেছে?'

'জানি না, সোহানা। নদী আসলেই আছে কি না তা-ও কিন্তু জানি না। ...এসো আমার সঙ্গে। ক্যাটওয়াকের শেষমাথা পর্যন্ত গিয়ে টানেলের ভিতরে আলো ফেলে দেখি কী আছে।'

দূরের টানেলের ভিতরে আরেকটা পিয়ার দেখা গেল। কতগুলো ক্যাটওয়াকও আছে।

সোহানার দিকে তাকাল রানা। 'কী বুঝলে?'

দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করল সোহানা। 'বুঝলাম, সম্ভবত কোনও গোলকধাঁধার ভিতরে আটকা পড়েছি আমরা।'

উনিশ

পঁচাত্তর ফুট দড়ির ষাট ফুট আছে ওদের কাছে, বাকি পনেরো ফুট ছিঁড়ে চলে গেছে মোটরবোটটার সঙ্গে। দড়িটা কাজে লাগিয়ে ডানদিকের টানেলটাতে ঢুকে পড়ল ওরা। প্রথমে গেল রানা। নীচে ফুঁসছে পানি; প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে, পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে, দেয়ালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে, ধসে-পড়া ক্যাটওয়াকের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে হাজির হলো ও। কোমরে বেঁধে নিয়েছিল দড়িটা, তাই আরেকটা পিয়ারে হাজির হওয়ার পর ওটা শক্ত করে বেঁধে দিল এটার সঙ্গে। দড়ির অন্য প্রান্তটা এদিকের পিয়ারের সঙ্গে মজবুত করে বাঁধল সোহানা। তারপর কমাণ্ডো স্টাইলে ঝুলে ঝুলে পার হলো দূরত্বটুকু। ও পৌঁছানোর পর একই কায়দায় আগের জায়গায় ফেরত গেল রানা। দড়ির যে-প্রান্ত এখানকার পিয়ারের সঙ্গে বেঁধেছিল সোহানা, তা খুলে নিয়ে নিজের কোমরে শক্ত করে বাঁধল। সোহানাকে বলে এসেছে, পাহাড়ি দেয়ালের খাঁজ বেয়ে এগোতে গিয়ে যদি ও পিছলে পানিতে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তিনবার টান দেবে দড়িতে। সোহানাও দ্রুত হাতে পিয়ারের সঙ্গে দড়ির আলগা অংশটুকু পেঁচিয়ে ফেলবে, তা হলে তীব্র স্রোত ভাসিয়ে নিতে পারবে না রানাকে।

সে-রকম কিছু ঘটল না। দেয়ালের খাঁজ ধরে ধরে সোহানার কাছে ঠিকমতোই ফিরতে পারল রানা। তারপর কান পাতল।

টানেল বেয়ে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে পানি। স্রোতের ফোঁসফোঁসানি ছাপিয়ে বুদবুদ ওঠার মতো আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। আরও একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে, মনে হয় রেগুলেটর ঘুরছে কাছেই কোথাও, দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি তুলছে আওয়াজটা। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা, একদিকের গাল চেপে ধরেছে পিয়ারের তক্তার সঙ্গে, ইঙ্গিতে একই কাজ করতে বলছে সোহানাকে। দেরি না করে রানার মতো শুয়ে পড়ল সোহানাও।

দু'-চার সেকেণ্ড পরই উজ্জ্বল একটা ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠল অনতিদূরে। আলো ফেলে ফেলে টানেলের দেয়াল আর ছাদ দেখছে কেউ। খানিক বাদে দেখা গেল লোকটাকে। ব্যাটারিচালিত একটা সী-স্কুটারে চড়ে এসেছে। দূর থেকে বুলেটের মতো দেখাচ্ছে বাহনটাকে। বেঢপ হ্যাণ্ডেলের কারণে ওই লোকের শরীরটা দেখা যাচ্ছে না। গোল ছায়ামূর্তি তৈরি করেছে মাথাটা।

দড়িতে বাঁধা একটা হুক ছুঁড়ে মারল লোকটা ক্যাটওয়াকের উপর। ওটা জায়গামতো আটকেছে কি না নিশ্চিত হওয়ার জন্য জোরে টেনে দেখল কয়েকবার। তারপর রাশান টানে ইংরেজিতে বলল, 'ঠিক আছে। চলে এসো।' স্কুটারের মুখ ঘুরিয়ে নিল সে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

চোখে চোখে কথা হয়ে গেল রানা-সোহানার। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সোহানা, 'কতক্ষণ সময় পাচ্ছি আমরা?'

'জানি না,' চারদিকে তাকাচ্ছে রানা। 'কিন্তু এটা জানি, যতটুকু সময় আছে তার মধ্যে লুকাতে হবে আমাদেরকে।'

এখন যে-ক্যাটওয়াকের উপর আছে ওরা, সেটা আগের টানেলটা থেকে বের হয়ে এসে অনেকটা ইংরেজি "ই" অক্ষরের রূপ ধারণ করেছে, এগিয়ে গেছে বিপরীতদিকের দেয়ালের কাছে,

ওখানে আরেকটা পিয়ারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। দুই পিয়ারেই দেখা যাচ্ছে ক্রিগসমেরিনের চিহ্ন।

এই টানেলটা আগের টানেলের চেয়ে বড়, প্রায় দ্বিগুণ হবে। সী-স্কুটারে করে আসা লোকটা যেদিক দিয়ে ঢুকেছিল, আর রানারা যেদিক দিয়ে এসেছে, এই দুটো পথ ছাড়া এখান থেকে বের হওয়ার আরও কোনও রাস্তা আছে কি না কে জানে! টানেলের ভিতরে অন্ধকার। বিশ-পঁচিশ হাতের দূরের জিনিসও দেখা যায় না।

সী-স্কুটারের লোকটা যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে আবারও তাকাল রানা। কেউ নেই। আলোও দেখা যাচ্ছে না। তার মানে ওখান দিয়ে শত্রুপক্ষের কেউ ঢোকেনি এখন পর্যন্ত। ঝুঁকি নেবে নাকি? জ্বালবে ফ্ল্যাশলাইটটা?

ঝুঁকিটা শেষপর্যন্ত নিল রানা। জ্বালল ফ্ল্যাশলাইট। সী-স্কুটারের লোকটা আলো ফেলে ফেলে টানেলের দেয়াল যখন দেখছিল, তখন রানার মনে হয়েছে একদিকের ছাদ থেকে স্ট্যালাকটাইটের মতো কী যেন ঝুলতে দেখেছে। এবার নিজের ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখল, ওগুলো আসলে বড় বড় কয়েকটা পাথরের ফাঁকে জমা-করে-রাখা গাছের গুঁড়ি, কোনও কোনওটা পচন ধরে নষ্ট হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। টানেলের দেয়ালে যেন ভর দিয়ে আছে পাথরগুলো, জোরালো স্রোত ওগুলোর গায়ে বাড়ি খেয়ে শক্তি হারিয়ে ফেলছে অনেকখানি, খানিকটা দূরে আবছামতো চোখে পড়ছে কালচে-সাদা বালি।

'বের হওয়ার কোনও রাস্তা?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'হতে পারে। একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ? এখানে পানির স্রোত ওদিকের চেয়ে কম।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

আগের টানেলটা থেকে দু'জনের গলার আওয়াজ পাওয়া

যাচ্ছে। একজন আরেকজনের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। একটু পর শোনা গেল তৃতীয় আরেকটা কণ্ঠ। গুলির শব্দ পাওয়া গেল হঠাৎ। একটু পর আবারও। তারপর একনাগাড়ে দশ সেকেণ্ড ধরে ঠা ঠা করে বুলেট উগরাল একটা সাবমেশিনগান। তারপর, শুধু টানেলের দেয়ালে আছড়ে-পড়া স্রোতের বয়ে চলার শব্দ বাদে আর কোনও আওয়াজ নেই।

'পানিতে গুলি করছে ওরা,' ফিসফিস করে জানান দিল রানা। 'ভয় দেখাতে চাচ্ছে আমাদেরকে। ভাবছে, যদি পানির নীচে লুকিয়ে থাকি আমরা তা হলে গুলি খেয়ে মরার ভয়ে মাথা তুলবো ওপরে।'

'রানা, ওটা কী?' আঙুল তুলে একদিকে ইঙ্গিত করছে সোহানা।

ফ্ল্যাশলাইটটা নিভিয়ে ফেলেছিল রানা, সোহানা যেদিকে ইঙ্গিত করছে সেদিকে তাক করে জ্বালল আবার। শিকড় আর গুল্ম জড়াজড়ি করে আছে পচা গুঁড়িগুলোর সঙ্গে, ওগুলোর আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে বড় কিছু একটা, কাঠামো দেখে অন্তত তা-ই মনে হয়। সিগারের মতো দেখতে, ধাতব।

ফ্ল্যাশলাইটটা নিভিয়ে দিয়ে সোহানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল রানা।

'ইউ.এম. সেভেনটি সেভেন?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'হতে পারে,' নিচু গলায় জবাব দিল রানা, মাথা ঝাঁকাচ্ছে। 'শোনো, আবার ডাইভ দেবো আমি। সাবমেরিনটার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো। তবে তার আগে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর গিঁট দিয়ে নিচ্ছি কোমরে-বাঁধা দড়িতে। এটার আরেক প্রান্ত একটা পিয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেলো। জায়গামতো পৌঁছাতে পারলে কোমর থেকে খুলে শক্ত কোনও কিছুর সঙ্গে বেঁধে দেবো

আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে জবাবটা বলে দিল সোহানা।

কোমরে প্যাঁচানো দড়িতে গিঁট দিতে শুরু করল রানা। কাজ শেষ হলে নড করল সোহানার উদ্দেশ্যে। কোনদিকের পিয়ারে বাঁধলে দড়ির আলগা প্রান্তটা সাবমেরিনের সবচেয়ে কাছে থাকবে আন্দাজ করে নিয়ে ক্যাটওয়াকের উপর দিয়ে ছুটতে শুরু করল সোহানা। রানা দৌড়াচ্ছে ওর পিছন পিছন। কাজ শেষ হওয়ামাত্র ওর উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাশলাইটটা দাঁতে কামড়ে ধরে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা।

আগের টানেলের চেয়ে এই টানেলে স্রোতের তীব্রতা কম, তারপরও জোরালো। যেদিকে এগোতে চাইছে সেদিকে যাওয়ার জন্য শক্তিশালী স্রোতের বিরুদ্ধে বেশ কিছুক্ষণ লড়াই করতে হলো রানাকে। শেষপর্যন্ত অবশ্য পৌঁছাতে পারল সাবমেরিনটার কাছে। ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে সরাল শিকড় আর আলগা গুল্ম। সাবমেরিনটাকে কিছুক্ষণ দেখে নিভিয়ে দিল লাইটটা।

আর দশটা মল্‌শ্ মিনি-সাবের মতো না এটা। বরং আরও ছোট, ছ'ফুট কম তো হবেই। ব্যাসও অনেক কম—ইউ.এম. থার্টি ফোরের অর্ধেক। এটার চেয়ে ছোট সাবমেরিন আর কখনও বানানো হয়েছিল কি না জানে না রানা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে দুটো জি-সেভেন-ই টর্পেডোর একটাকে আরেকটার উপর বসিয়ে ঝালাই করা হয়েছে। উপরেরটা টর্পেডো নেই আর, বরং অ্যাক্রিলিক গ্লাস জুড়ে দিয়ে বানানো হয়েছে ভিউয়িং ডোম। নীচেরটা টর্পেডোই আছে, জ্যান্ত না মৃত কে জানে; কাজের সময় যাতে আলগা করে ফেলা যায় সেজন্য ডিটাচেবল মেকানিযমও

আছে হয়তো, অনুমান করল ও।

লম্বা করে দম নিল ও, সাবমেরিনটার কাঠামো হাতড়ে হাতড়ে ডুব দিল পানির নীচে। তলায় এসে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল। কিছুক্ষণ দেখে বুঝল, একটু আগে ভুল ভেবেছিল। নীচের অংশটা টর্পোডো নয়, বরং এটাকে রূপান্তরিত করা হয়েছে ককপিট টিউবে। টানেলের কালচে-সাদা বালির বিছানায় পেট ঠেকিয়ে কত কাল ধরে এ-জায়গায় এভাবে আছে সাবমেরিনটা কে জানে! তবে যারাই রেখে থাকুক, উপযুক্ত জায়গা বেছে নিয়েছে বা বানিয়েছে। মোটা গুঁড়ি আর বিশাল পাথরের বাধা ঠেলে সাবমেরিনটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না স্রোত কখনোই।

ফ্ল্যাশলাইটটাকে জ্বলন্ত অবস্থায় সাবমেরিনের পেটের কাছে বালিতে রাখল রানা, তারপর উঠে এল পানির উপরে। এণ্ট্রি হ্যাচ দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে আনল্যাচিং বোল্টগুলোও। এগিয়ে গিয়ে একটা বোল্ট ধরে জোরে মোচড় দিল রানা। খুলল না। অনেক শক্ত হয়ে আটকে আছে। জোর আরও বাড়াল রানা। না, এবারও চেষ্টা নিষ্ফল। শেষে সাবমেরিনটার উপর চড়ে বসল ও, দু'পায়ে পেঁচিয়ে ধরল কাঠামোর যতখানি সম্ভব। তারপর দু'হাতে মোচড় দিল বোল্টটাতে। কিন্তু ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল না এবারও।

হাঁপাচ্ছে রানা। হঠাৎ করে প্রচণ্ড চাপ দিতে গিয়ে টনটন করছে আঙুলগুলো। তারপরও আবার চেষ্টা করল। কিন্তু এবারও কোনও ফল হলো না।

কাজ থামাল রানা। কান পাতল। স্রোতের আওয়াজ ছাপিয়ে আরেকটা কীসের শব্দ শুনতে পেয়েছে। তিন-চার সেকেণ্ড পরই পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল আবার। ডুবে গিয়ে তুলে নিল ফ্ল্যাশলাইটটা, নিভিয়ে দিল। ওটা নিয়ে পানির উপরে মাথা তুলেছে, সোহানা যেদিকে ছিল সেদিক থেকে পানিতে কিছু পড়ার আওয়াজ শোনা গেল এমন সময়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টান লাগল

রানার কোমরে-বাঁধা দড়িতে। বুঝল, পিয়ার থেকে দড়ির অন্যপ্রান্তটা খুলে নিয়ে নিজের কোমরে পেঁচিয়ে পানিতে লাফিয়ে পড়েছে সোহানা। কেন, তা-ও বোঝা গেল।

টানেলের শেষমাথার বাঁকে লাফালাফি করছে স্রোত, দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ে ফেনা বানাচ্ছে, ওখানকার ক্যাটওয়াকের এক পিয়ারের কাছে পৌঁছে গেছে মেলিখান আর তার লোকেরা। তিনটা সী-স্কুটারের উজ্জ্বল আলো নাচানাচি করছে টানেলের দেয়ালে। একেকটা স্কুটারে চড়েছে দু'জন করে। মাতাল স্রোতের কারণে ওদের এগিয়ে আসার গতি অনেক কম, কিন্তু এগিয়ে যে আসছে সে-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। বিশ, বেশি হলে তিরিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে রানা যেখানে আছে সেখানে।

রানার কোমরে প্রচণ্ড টান লাগছে, কারণ স্রোত ঠেলে এগোতে পারছে না সোহানা। দড়ির কিছুটা অংশ ডান হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে কনুইয়ের সঙ্গে পেঁচাল রানা। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে কোমরে টান লেগে কষ্ট হচ্ছে সোহানার, তারপরও করল কাজটা। এরপর সাবধানে উঠে দাঁড়িয়ে টপকাল এণ্ট্রি হ্যাচটা, উল্টো ঘুরল। ডান হাতে পেঁচিয়ে-ধরা দড়ির কিছুটা সামনে থেকে ধরল বাঁ হাতে, এরপর ডান হাতের দড়ির প্যাঁচ ছুটিয়ে পেঁচিয়ে দিল এণ্ট্রি হ্যাচের সঙ্গে। কোমর থেকে খুলে দড়ির প্রান্তটা শক্ত করে গিঁট দিল হ্যাচের সঙ্গে। তারপর দড়িটা দু'হাতে ধরে টানতে শুরু করল। অন্ধকারে দেখতে না পেলেও টের পেল, এবার এগোচ্ছে সোহানা। মিনিট তিনেকের মধ্যেই পৌঁছে গেল রানার কাছাকাছি।

হাঁচড়েপাঁচড়ে একটা পাথরের উপর উঠে বসেছে সোহানা। শত্রুদের অবস্থান আবারও একবার দেখে নিল রানা। উন্মত্ত স্রোতের বিরুদ্ধে সুবিধা করতে পারছে না সী-স্কুটারগুলো, তেমন একটা এগোতে পারেনি। পানিতে নামার জন্য ভুল জায়গা বেছে

নিয়েছে ওরা, ভাবল রানা। তারমানে হাতে আরও কিছুটা সময় পাওয়া গেল। এন্ট্রি হ্যাচের সঙ্গে পেঁচিয়ে-রাখা দড়ি খুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল সোহানা যেদিকে আছে সেদিকে। তারপর সাবমেরিনের পিঠ থেকে পিছলে নেমে পড়ল পানিতে। খানিকটা সাঁতার কেটে আর কোমর-পানিতে হেঁটে পৌঁছে গেল সোহানার কাছে।

এখন রানার ডান দিকে পাথর, গুঁড়ি, শিকড় আর গুল্মের সঙ্গে সাবমেরিনটা। ওগুলো ছাড়িয়ে অনেকদূরের দেয়ালে সী-স্কুটারগুলোর আলোর লাফালাফি। এখনও হাঁপাচ্ছে সোহানা; ওর কোমর থেকে দড়িটা খুলে নিয়ে পুরোটা নিজের কোমরে পেঁচিয়ে নিল রানা, পরে দরকার হতে পারে। কাজ করতে করতে তাকাল বাঁ দিকে। ফুট দশেক দূরে পড়ে আছে আরও কিছু গুঁড়ি, প্রাকৃতিক নিয়মে ওগুলোর উপর গজিয়ে উঠেছে গুল্মের জঙ্গল। এখানে পাথর তেমন নেই, তবে টানেলের দেয়াল অস্বাভাবিকভাবে বাঁক নিয়ে পঞ্চান্ন গ্যালনের ড্রামের মতো আকার ধারণ করেছে, তৈরি করেছে প্রাকৃতিক একটা আড়াল। সোহানার হাঁটুতে টোকা দিল রানা, পানি ভেঙে এগোচ্ছে প্রাকৃতিক ড্রামটার দিকে।

কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে তাকাল ভিতরে। অন্ধকার, স্পষ্টভাবে কিছু দেখা যায় না। ফ্ল্যাশলাইট জ্বালবে কি না ভাবল রানা, কিন্তু বাতিল করে দিল চিন্তাটা। সী স্কুটারগুলো নিশ্চয়ই আরেকটু কাছে এসেছে, উজ্জ্বল আলোর আভা চোখে পড়ে যেতে পারে ওদের কারও। একটা পাথরে ভর দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল "ড্রামটার" ভিতরে। যতদূর মনে হচ্ছে এই দেয়াল উপরে উঠে গিয়ে টানেলের ছাদের সঙ্গে মিশেছে, ব্যাস যদিও নগণ্য। দুই হাত উপরে তুলে একদিকের দেয়াল স্পর্শ করল রানা, পিঠ ঠেকিয়ে দিয়েছে আরেকদিকের দেয়ালের সঙ্গে। হাত আর পিঠের উপর পুরো শরীরের ভর রেখে দুই পা তুলে ফেলল শূন্যে। হাঁটু ভাঁজ

করে পা দুটো ঢুকিয়ে ফেলল ড্রামের ভিতরে। দুই পা একসঙ্গে দেয়ালে ঠেকিয়ে পিঠের উপর চাপ বাড়াল। এবার হাত দুটো আলগা করে আরও উঁচুতে তুলে আগের কায়দায় উঠে গেল কয়েক ফুট উপরে। নীচ থেকে ওর কাজ দেখছে সোহানা।

বেশ খানিকটা যাওয়ার পর রানা যখন নিশ্চিত হলো একই কাজ করতে পারবে সোহানা তখন নেমে এল। ইঙ্গিতে ড্রামের ভিতরে ঢুকে যেতে বলল সোহানাকে। তবে ওর মতো কষ্ট করতে হলো না সোহানাকে, কারণ ওর দুই পা নিজের দুই কাঁধের উপর তুলে নিয়েছে রানা। "ড্রামের" ভিতরে সোহানা ঢোকার পর রানাও ঢুকে গেল প্রথমবারের কায়দায়। এখন রানার মাথার ঠিক উপরে সোহানা।

'কী দেখলে সাবমেরিনে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'তেমন কিছু না,' ফিসফিস করেই জবাব দিল রানা। 'এণ্ট্রি হ্যাচটা খোলার চেষ্টা করেছিলাম।'

'খোলেনি?'

'নাহ্।'

'কী করবো আমরা এখন?'

'অপেক্ষা।'

'কতক্ষণ?'

'যতক্ষণ না সী-স্কুটারগুলোর আওয়াজ মিলিয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছা হলে ভাঙাচোরা দেয়ালের ফোকরে চোখ রেখে দেখতে পারো মেলিখানের চোর-পুলিশ খেলা।'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।

যতটা সময় লাগবে ভেবেছিল রানা, তার আগেই হাজির হয়ে গেল মেলিখান আর ওর লোকেরা। তিনটা স্কুটারে দু'জন করে

মোট ছ'জন। একজনের হাতে শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইট। বার বার এদিক-ওদিক আলো ফেলে খুঁজছে রানা-সোহানাকে। ক্যাটওয়াকের প্রতিটা তক্তা, পিয়ার, এমনকী গাছের গুঁড়িগুলোও বাদ যাচ্ছে না। সাবমেরিনটার অস্তিত্ব ওরা টের পেয়ে গেছে কি না কে জানে!

'শালা-শালী গেল কই?' রাগ সামলাতে কষ্ট হচ্ছে মেলিখানের। 'তোমরা চারজন যেখান থেকে পারো খুঁজে বের করে আনো ওই দু'জনকে।' হুকুম ঝাড়ল সে। যে-স্কুটারে বসে আছে তার চালককে বলল, 'আর তুমি থাকবে আমার সঙ্গে।' হাতেধরা ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল সে, স্কুটার চালককে নির্দেশ দিল একদিকের ক্যাটওয়াকের কাছে এগিয়ে যেতে। সময় নিয়ে আলো ফেলে ফেলে দেখছে প্রতিটা তক্তা।

বাকি দুটো স্কুটার দু'দলে ভাগ হয়ে এগিয়ে গেছে দু'দিকের পিয়ারের কাছে। একদলের ফ্ল্যাশলাইট আগেই জ্বলছিল, এবার আলো জ্বালল আরেকদল। টানেলের ভিতরে আলোর অভাব নেই এখন।

পিয়ারের কাছে এগিয়ে-আসা লোকেরা আলো ফেলছে পিয়ারের উপর, টানেলের দেয়ালে, পানিতে এবং তারপর থেমে থেমে রিভলভার দিয়ে গুলি করছে পানিতে। এক মিনিট কাটল। তারপর হঠাৎ করেই বুলেটের মতোই প্রতিধ্বনিত হলো মেলিখানের চিৎকার, 'থামো! থামো! গুলি বন্ধ করো!'

'এদিকে এসো!' চেঁচিয়ে বলল ওর স্কুটারের চালক, 'কিছু একটা দেখা যাচ্ছে!'

ধক করে উঠল রানার বুকের ভিতরে। সাবমেরিনটা দেখে ফেলেছে ওরা? না কি ওদেরকে?

মনে হয় না। সাবমেরিনটা থেকে এখনও বেশ কিছুটা দূরে আছে মেলিখান আর তার স্কুটারের চালক। অন্য দিকে তাকিয়ে

আছে ওরা। একটা তক্তা থেকে ঝুলছে বহু পুরনো একটা দড়ি, ওটার উপর ফ্ল্যাশলাইটের আলো ধরে রেখে দেখছে।

বাকি স্কুটার দুটো মেলিখানের কাছে গেল। হাত দিয়ে ইশারা করল মেলিখান, সঙ্গে সঙ্গে দুই স্কুটার থেকে চালক ছাড়া বাকি দু'জন লাফিয়ে পড়ল পানিতে। এতক্ষণ খেয়াল করেনি রানা, এবার দেখল, ডাইভিং গিয়ার পড়ে এসেছে ওই দু'জন। তীব্র স্রোত সামাল দিতে কোমরে দড়ি পেঁচিয়েছে ওরা, দড়ির অপর প্রান্ত বাঁধা আছে স্কুটারের পেছনদিকের একটা হুকের সঙ্গে।

স্রোতের মাথায় ভাসছে স্কুটারগুলো। তিনটা ফ্ল্যাশলাইটের আলোই এখন তাক করা আছে ডুবুরিরা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে। দুই ডুবুরির ছাড়া দম বুদবুদ হয়ে থেকে থেকে ভেসে উঠছে উপরে। বেশ কিছুক্ষণ পানির নীচে ঘুরে বেড়াল দু'জনে, তারপর ভুস করে একসঙ্গে উঠে এল। অক্সিজেন সিলিণ্ডারের মাউথপিস সরিয়ে একজন বলল, 'নীচে কিচ্ছু নেই। লুকানোর কোনও জায়গা নেই।'

'তার মানে অন্য কোনও টানেল ধরে নদীর দিকে গেছে ওরা,' মেলিখানের স্কুটারের চালক বলল।

চুপ করে আছে মেলিখান। কী যেন ভাবছে। কিছুক্ষণ পর দুই ডুবুরির উদ্দেশ্যে বলল, 'তোমরা শিওর নীচে কেউ নেই?'

একসঙ্গে মাথা ঝাঁকাল দুই ডুবুরি।

'ঠিক আছে। উপরে উঠে এসো তোমরা। স্কুটারে বসো। অনেকগুলো গাছের গুঁড়ি দেখা যাচ্ছে একপাশে। ওগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে ওরা। ওখানে যাবো আমরা। তবে তিনটা স্কুটার একসঙ্গে না। আনাতোলি,' কোনও এক স্কুটার চালককে উদ্দেশ্য করে বলল, 'বরিসকে সঙ্গে নিয়ে নদীর দিকে যে-টানেলটা গেছে সেদিকে যাও তুমি। আমরা দুই স্কুটারে করে যাচ্ছি গুঁড়িগুলোর কাছে।'

গেল ওরা। এবং সাবমেরিনটা চোখে পড়তে সময় লাগল না মেলিখানের। 'আরে!' খুশি খুশি গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এখানে সাবমেরিন? যা খুঁজছি তা-ই পেয়ে গেলাম নাকি? ভিক্তর, নামো তো পানিতে। ঘটনা কী দেখো।'

সঙ্গে সঙ্গে মুখে মাউথপিস লাগিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিল এক ডুবুরি।

রানা দেখতে পাচ্ছে সাবমেরিনটার কাঠামো জুড়ে এবং তার আশপাশে নাচানাচি করছে দুটো ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বল আলো। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের মৃদু আওয়াজও শোনা যাচ্ছে।

তিন মিনিট কাটল।

পানির উপর মুখ তুলল ভিক্তর। মাউথপিস সরিয়ে বলল, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের সাবমেরিন। জার্মান। মনে হয় ইউ.এম. সেভেনটি সেভেন।'

'ভালো,' মেলিখানের গলায় সন্তুষ্টি। 'ভাসিলি, স্কুটার থেকে নামো। গিয়ে চড়ো সেভেনটি সেভেনের পিঠে। এণ্ট্রি হ্যাচ খোলা যায় কি না দেখো।'

কয়েক মিনিটের নীরবতা। সেভেনটি সেভেনের পিঠে গিয়ে চড়েছে ভাসিলি। সর্বশক্তিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুই করতে পারল না। 'ক্রোবার ছাড়া হবে না,' বলল সে।

পিঠে-ঝুলানো ব্যাকপ্যাক কাঁধ থেকে খসাল মেলিখান। সামনে এনে খুলল, একটা ক্রোবার বের করে ছুঁড়ে দিল ভাসিলির দিকে।

পরের পাঁচ মিনিট শুধু ঠং ঠং আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপর হঠাৎ করেই বলে উঠল ভাসিলি, 'খুলে গেছে।'

'ঢোকো ভিতরে,' সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিল মেলিখান।

সাবমেরিনের ভিতরে ঢুকল ভাসিলি। আরও প্রায় পাঁচ মিনিট পর বেরিয়ে এল সে। হাতে আয়তাকার একটা বাক্স। রানা-

সোহানার হাত, পিঠ, পা ততক্ষণে টনটন করছে ব্যথায়।

'জলদি দাও আমাকে,' বাক্সটা দেখামাত্র বলে উঠল মেলিখান।

দূর থেকে দেখছে, তারপরও কাঠের বাক্সটা চিনতে কষ্ট হচ্ছে না রানা-সোহানার।

স্কুটারে বসে থেকেই ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলে উল্টেপাল্টে বাক্সটা দেখল মেলিখান। তারপর ওর স্কুটারের চালককে লাইটটা ধরতে দিয়ে বাক্সের ডালা খুলল। বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর সন্তুষ্টির হাসি হাসল, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'খুব ভালো।'

'বাঁচাও! বাঁচাও!' আনাতোলি আর বরিস যে-টানেলের দিকে গেছে সেদিক থেকে আর্তচিৎকার ভেসে এল এমন সময়।

বাক্সটা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকপ্যাকের ভিতর চালান করে দিয়ে ব্যাকপ্যাকটা পিঠে ঝুলাল মেলিখান। ইশারায় কথা হয়ে গেল নিজের লোকদের সঙ্গে। সেভেনটি সেভেনের পিঠ থেকে নেমে এসে স্কুটারে চড়ল ভাসিলি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুটো স্কুটার রওয়ানা হয়ে গেল নদীর দিকে যে-টানেলটা গেছে সেদিকে।

কিন্তু সে-পর্যন্ত যেতে হলো না। স্রোতের মাতামাতির কারণে মেলিখানদের এগোনোর গতি ধীর, কিন্তু আনাতোলি চলে আসতে পেরেছে। বেচারার চেহারা রক্তাক্ত। হাঁপাচ্ছে। মাতাল স্রোতের সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না ঠিকমতো। বোঝা যাচ্ছে পানিতে পড়ে গিয়েছিল। হাত পিচ্ছিল হয়ে গেছে, তাই স্কুটারের হ্যাণ্ডেল দুটো ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে।

ওর কাছে পৌঁছে গেল মেলিখানরা।

'কী হয়েছে?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল মেলিখান। 'বরিস কই?'

'প্রচণ্ড একটা স্রোত বাড়ি মেরেছিল স্কুটারে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল আনাতোলি, একহাতের রুমাল বা ওই জাতীয় কিছু একটা

দিয়ে কপালের ক্ষত চেপে ধরেছে, 'উড়ে গিয়ে একটা চোখা পাথরের উপর পড়ল বরিস। ওর কোমরে-বাঁধা দড়ি কেটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বাঁচাও বলে চিৎকার করে উঠেই জোরালো স্রোতের টানে ভেসে গেল সে। কোন্‌দিকে বলতে পারবো না, অন্ধকারে দেখতে পাইনি। আমার অবস্থাও তখন খারাপ। স্রোতের ধাক্কায় স্কুটারসহ বাড়ি খেয়েছি টানেলের দেয়ালে, কপালের একদিক কেটে গেছে। বরিস নেই, এগিয়ে গিয়ে লাভও নেই, তাই ফিরে এলাম।'

'শালা...' জঘন্য একটা গাল দিল মেলিখান। তারপর আনাতোলিকে জিজ্ঞেস করল, 'স্কুটার চালিয়ে বের হতে পারবে এখান থেকে? যেতে পারবে লেগুন পর্যন্ত?'

মাথা ঝাঁকিয়ে নিচু গলায় কিছু একটা বলল আনাতোলি, ঠিকমতো বোঝা গেল না।

'ঠিক আছে,' সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে আরেকদফা গলা ফাটাল মেলিখান, 'লেগুনে ফিরে চলো সবাই। কিছু কাজ সেরে ফিরে আসবো আবার। রানা-সোহানার যদি ইতোমধ্যে সলিলসমাধি হয়ে না থাকে, ওদেরকে জ্যান্ত কবর দেয়ার ব্যবস্থা করবো।'

বিশ

চলে গেছে মেলিখান আর তার লোকেরা। টানেলের ভিতরে আবারও অন্ধকার। স্রোতের একটানা গর্জনের শব্দ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই।

'জ্যান্ত কবর দেয়ার ব্যবস্থা করবে বলতে কী বোঝাতে চেয়েছে লোকটা?' "ড্রাম" থেকে রানার পিছন পিছন নেমে এসেছে সোহানা, বড় একটা পাথরের উপর বসেছে, পায়ের কাছে নাচানাচি করছে স্রোত।

'এক্সপ্লোসিভ,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'ওগুলো আনার জন্যই বোধহয় ফিরে গেছে লেগুনে।'

'আমাদেরকে জ্যান্ত কবর দেয়ার মতো এত এক্সপ্লোসিভ কি আছে ওদের কাছে?'

'মনে হয় না। তবে মেইন এণ্ট্রান্সটা বন্ধ করে দেয়া যায় অনায়াসে। হয়তো সেটাই বোঝাতে চেয়েছে মেলিখান। এখান থেকে যদি বের হতে না পারি আমরা, এখানেই যদি আটকে থাকতে হয়, তা হলে না খেয়ে মরবো, ভালোমতোই জানে সে। আবার হয়তো...'

'হয়তো?'

'হুমকিটা ধাপ্পাবাজিও হতে পারে। যদি বেঁচে থাকি আমরা, যদি আশপাশেই কোথাও থাকি, মেলিখান জানে ওর চিৎকার আমাদের কানে যাবেই। হয়তো ভেবেছে আমাদেরকে জ্যান্ত কবর দিতে চাচ্ছে শুনে ঘাবড়ে গিয়ে উল্টোপাল্টা কিছু করে বসবো, যেসব টানেলের মুখে পাহারা বসিয়েছে সে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সেগুলোর কোনওটাতে ধরা পড়বো ওর লোকদের হাতে। বাদ দাও। কাজের কথা বলি। সাবমেরিনটার আশপাশে কিছু শিকড় গজিয়েছে, খেয়াল করেছ?'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

'তারমানে টানেলের দেয়ালের ওপাশে আছে গাছগুলো। অর্থাৎ টানেলের দেয়ালের প্রাকৃতিক ফাটল ভেদ করে এদিকে এসেছে শিকড়গুলো।'

'কী বলতে চাচ্ছ?' পাথরের চাঁই আর গুঁড়িগুলোর দিকে

তাকাল সোহানা। 'ওই জায়গায় পানির নীচে প্রাকৃতিক কোনও সুড়ঙ্গ আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সেভেনটি সেভেনটাকে যখন দেখতে গিয়েছিলাম তখন খেয়াল করেছি। কিন্তু খুব বেশি চওড়া না ফাটলটা। পানির লেভেল থেকে ছ'ফুট উপরে।'

'দিনের আলো দেখতে পেয়েছ ওখান দিয়ে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'যখন দেখেছি তখন সূর্য ডুবছিল সম্ভবত।'

ব্যঙ্গের হাসি হাসল সোহানা। 'বের হতে পারি বা না পারি, এটুকু তো জানা গেল, এমন একটা ফাটল আছে যেখান দিয়ে আসা তাজা বাতাস টানতে টানতে মরতে পারব!'

'প্রথম টানেলে...' কথা শেষ করতে পারল না রানা। মূল গুহার দিক থেকে ভোঁতা কিন্তু ভারী একটা শব্দ ভেসে এল। তারপর পর পর আরও দু'বার।

'মাথা নামাও!' চাপা গলায় বলল রানা, ধাক্কা দিয়ে বালির উপর ফেলে দিয়েছে সোহানাকে। নিজে পড়েছে ওর উপর।

কয়েক মুহূর্ত পর একঝলক তাজা বাতাস বয়ে গেল ওদের মাথার উপর দিয়ে। ধুলোর একটা ঝড় প্রথমে গুহাটাকে, তারপর টানেলের অনেকখানি আচ্ছন্ন করে ফেলল। দূরে তাকিয়ে রানা-সোহানা দেখল, বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে পাথরের গুঁড়ো আর ছোট-বড় অসংখ্য টুকরো।

রানাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসল সোহানা। 'সব ঘটনারই ভালো-মন্দ দুটো দিক আছে।'

'যেমন?' উঠে বসেছে রানাও।

'যেমন ডিনামাইট ফাটিয়ে গুহার মুখ বন্ধ করল ওরা। এখান থেকে আমাদের এখন বের হওয়ার কোনও সম্ভাবনা আছে কি না জানি না। এটা হলো খারাপ দিক।'

'আর ভালো?'

'ভালো দিকটা হলো এই গুহার ভিতরে এখন শুধু তুমি আর আমি।'

'অ্যাঁ? আরে, তাই তো! ঠিক বলেছ!' বলল রানা, 'হ্যম-তুম ইক কামরে মে বান্দ হুঁ!' হাত ধরল সোহানার, 'এসো, তা হলে...'

'অ্যাই, খবরদার!' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভেংচি কাটল সোহানা। 'বয়েই গেছে আমার!'

'তা হলে আর ভাল দিক হলো কী করে? কী লাভ হলো আদিম এক গুহায় নিজেদের আবিষ্কার করে?'

'লাভ তো রোজই হচ্ছে, এখন কী করে এই নরক থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সে-উপায় বের করো।'

'কী সেটা?'

'মাথা খাটাও।'

নিজের বেল্টে-ঝুলানো ফ্ল্যাশলাইটটা খুলে নিয়ে জ্বালল রানা। আলো ফেলল পানিতে, সাবমেরিনের কাঠামোটাকে দেখাচ্ছে। 'উপায়টা দেখতে পাচ্ছ, সোহানা?'

'বোধহয় পাচ্ছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না কী সেটা। পানি?'

'বুঝিয়ে বলতে হলে আগে আমার নিজেকে বুঝে দেখতে হবে। তবে যেদিক দিয়ে এই গুহায় ঢুকেছি, সেদিক দিয়ে বের হতে পারবো না, এটা শিওর। কারও দ্বারা উদ্ধার পাওয়ার আশাও নেই। কাজেই যা-করার, নদীপথ ধরেই করতে হবে। মেলিখানের কথা শুনে নিশ্চিত হয়েছি, ডানদিকের টানেলটা কোনও একটা নদীর উৎপত্তিস্থল। তোমার অনুমান ঠিক, সোহানা—পানি।'

'কিন্তু নদীটা দিয়ে বের হতে গিয়ে মেলিখানের একজন লোক মারা গেছে, আরেকজন মরতে মরতে বেঁচেছে।'

'আমাদের আর কোনও উপায় নেই, সোহানা। আমার

অনুমান টানেলটা চওড়ায় পনেরো ফুটের মতো। স্রোত জোরালো, কিন্তু পানি যেহেতু নীচের দিকে যাচ্ছে সেহেতু গতি বাড়ে না। আর বাড়লেও খুব বেশি তারতম্য হওয়ার কথা নয়।'

'কিন্তু যদি কিছুদূর যাওয়ার পর পাহাড়ি দেয়ালে আটকা পড়ে...'

'এত জোরালো স্রোত যদি পাহাড়ি দেয়ালে বাড়ি খেত, আওয়াজ পাওয়া যেত। ঘূর্ণি বা বুদবুদ জাগত পানিতে। আলো ফেলে টানেলের ভিতরে যতদূর দেখেছি, ঘূর্ণি চোখে পড়েনি। আমার বিশ্বাস পানি বাইরে কোথাও পড়ছেই। হয় কোনও লেকে নয়তো অন্য কোনও সী কেভ-এ।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল সোহানা। কী যেন ভাবছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'আরেক কাজ করলে কেমন হয়, রানা? ধরো দিনের আলো ফোটার জন্য অপেক্ষা করলাম আমরা। তারপর, এখানে যেসব শিকড়বাকড় আছে, সেগুলোতে কোনওভাবে আগুন লাগিয়ে দিয়ে স্মোক-সিগনাল দিলাম...'

'আমি কি জানতে পারি, সেই সিগনালটা কাকে দেবো আমরা?'

জবাব দিল না সোহানা।

'কাজেই নদীটাই আমাদের একমাত্র ভরসা।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। মেনে নিল।

হাতে যেহেতু যথেষ্ট সময় আছে তাই কাজ শুরু করার আগে, প্রথম যে-গুহায় ঢুকেছিল সেটা দেখে এল রানা। হ্যাঁ, ডিনামাইট ফাটিয়ে পাহাড়ি দেয়াল ধসিয়ে দিয়েছে মেলিখান আর ওর সাঙ্গপাঙ্গরা। রেসকিউ টিমের সাহায্য ছাড়া বের হওয়া অসম্ভব ওখান দিয়ে।

মোটরবোটটা ডুবে গেছে, কিন্তু টুকটাক কিছু জিনিস রয়ে

গেছে রানার সঙ্গে। ইউ.এম. সেভেণ্টি সেভেন যেখানে আছে সেখানে, সোহানার কাছে ফিরে গিয়ে প্রথমেই সেসব জিনিস গুছিয়ে নিল রানা। তারপর কী মনে হওয়াতে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলে ফেলে দেখতে লাগল কাছের পাহাড়ি দেয়ালটাকে।

এক জায়গায় এসে স্থির হলো আলো। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা কিছুক্ষণ। ওকে তাকাতে দেখে সোহানাও তাকাল।

দেয়ালের বিশেষ এক জায়গায় একটা ফাটল দেখা যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে প্রাকৃতিক না, বিশেষ উদ্দেশ্যে ভারী কোনও যন্ত্র দিয়ে ফাটল বা গর্ত বানানো হয়েছে। দেয়ালের রঙের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান ধূসর-রঙা একটা পাথর দিয়ে চাপা দেয়া হয়েছে গর্তটার মুখ। তাড়াহুড়োর কারণে আগে খেয়াল করেনি রানা-সোহানা, হয়তো একই কারণে খেয়াল করেনি মেলিখানরাও।

সোহানার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ নাচাল রানা। জবাবে মাথা নাড়ল সোহানা।

গর্তটার দিকে এগিয়ে গেল রানা। যে-পাথর গড়ায় তাতে শ্যাওলা জমে না—নীতিবাক্যটাকে সত্য প্রমাণিত করে গর্তের মুখ চাপা-দেওয়া পাথরটার গায়ে পুরু শ্যাওলা জন্মেছে পাথরটা তুলতে গিয়ে পিছলে গেল রানার হাত, খাবলা লেগে সরে গেল বেশ কিছু শ্যাওলা, পাথরের গায়ে টেকসই রঙে-আঁকা ক্রিগস্‌মেরিন চিহ্নটা বেরিয়ে পড়ল। কয়েক যুগ পার হয়ে গেছে, ভাবল রানা, রঙ ফিকে হয়ে গেছে কিন্তু পুরোপুরি মুছে যায়নি।

দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় পাথরটা সরাল ও। আস্তে করে নামিয়ে রাখল পায়ের কাছের বালিতে। উঁকি দিয়ে ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখল গর্তের ভিতরটা।

প্রথমেই একটা টুলবক্স বের করল পাশে-এসে-দাঁড়ানো সোহানা। খুলল বক্সটা। প্রয়োজনীয় বেশ কিছু উপকরণ আর যন্ত্রপাতি আছে ভিতরে, তবে প্রায় সবগুলোয় মরচে পড়ে গেছে।

পাওয়া গেল চারটা লণ্ঠন। ঝাঁকি দেয়াতে আওয়াজ করল ভিতরের অবশিষ্ট কেরোসিন। আরও পাওয়া গেল ডজনখানেক লম্বা লম্বা মোমবাতি। এ-রকম মোমবাতি গির্জায় প্রার্থনার সময় ব্যবহৃত হয় সাধারণত।

ফ্ল্যাশলাইট নিভিয়ে দিয়ে পকেট থেকে ওয়াটারপ্রুফ গ্যাসলাইটার বের করল রানা। দু'টো মোমবাতি জ্বালল। অদ্ভুত এক হলুদ আলোয় ভরে উঠল আশপাশের খানিকটা জায়গা। বালির উপর যে-পাথর নামিয়ে রেখেছে সেটার উপর একটা এবং সবচেয়ে কাছের গাছের শিকড়ে দ্বিতীয় মোমবাতিটা এমনভাবে বসিয়ে দিল রানা যাতে আলোর কোনও তারতম্য না হয়।

ইতোমধ্যে ওর কাছ থেকে সরে গেছে সোহানা; বালির উপর, ইউ.এম. সেভেণ্টি সেভেনের কাছে যেসব "জিনিস" মজুদ করেছে রানা সেগুলো দেখছিল। মোমবাতি নামিয়ে রেখে রানা সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর ওকে বলল, 'বিভিন্ন রকমের কাজের-জিনিস আছে আমাদের কাছে, কিন্তু সেগুলো কাজে লাগিয়ে কীভাবে উদ্ধার পাবো বুঝতে পারছি না।'

'কী কী আছে?' কোমরে হাত রেখে ওর দিকে ঘুরল রানা।

'দুটো এয়ার ট্যাঙ্ক। একটার তিন ভাগের দু'ভাগ ভরা, আরেকটা ফুল। তোমার কাছে একটা আর আমার কাছে একটা, মোট দুটো ফ্ল্যাশলাইট আছে। দুটোই কাজ করছে। কিন্তু কারটাতে কতখানি চার্জ আছে জানি না। ক্যামেরা আছে, তবে বাড়ি লেগে লেন্স ভেঙে যাওয়ায় বিকল হয়ে গেছে। বিনকিউলার আছে, কাজ করছে। ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগে থাকার কারণে পানি থেকে বেঁচে গেছে রিভলভার। কিন্তু বুলেটগুলোর কী অবস্থা বুঝতে পারছি না। দুই ক্যান্টিন পানি আছে। খাবারের মধ্যে আছে কিছু বিস্কুট আর গরুর মাংস। তবে মাংসগুলো ভিজে গেছে, খেতে হলে আগুন জ্বালিয়ে সেঁকতে হবে ভালোমতো।

একটা ফার্স্ট এইড কিট দেখতে পাচ্ছি। ও, বড় এক টুকরো পনিরও পাওয়া গেছে। কিন্তু খাওয়া যাবে না, আগুনেও সেঁকা যাবে না—পানিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। আর অলৌকিক হলেও সত্য আমাদের সেলফোন দুটো আছে। পানিতেও ভেজেনি, চার্জ একটুও কমেনি। কিন্তু এই সী-কেভের ভিতরে নেটওয়ার্ক নেই।'

'ভালো। এবার তা হলে আমার পরিকল্পনাটা শোনো।'

আণ্ডারওয়্যার ছাড়া সব কাপড় খুলে ফেলেছে রানা। ডাইভিং মাস্কটা আছে চেহারায়, কোমরে ঝুলিয়েছে ডাইভিং বেল্ট। ইউ.এম. সেভেন্টি সেভেনের কাছে কয়েকবার ডাইভ দিল আর ভেসে উঠল ও, আসলে প্র্যাকটিস করে করে ফুসফুসের দম-চেপে-রাখার ক্ষমতা বাড়িয়ে নিচ্ছে। শেষে লম্বা করে দম নিয়ে ডুব দিল পানিতে। যা চায়, এয়ার ট্যাঙ্কের সাহায্য ছাড়াই করতে চায়।

বেশ কিছুটা নীচে নেমে এল রানা, সাবমেরিনের তলার কাছে পৌঁছাতে চাচ্ছে। ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালিয়ে দিয়েছে। ডোম হ্যাচের কাছে হাজির হলো ও। মোচড় দিয়ে খুলে ফেলল ওটা, ঢুকে পড়ল ভিতরে। পানির চাপে আপনাআপনি আগের জায়গায় লেগে গেল হ্যাচটা।

আণ্ডারওয়াটার মোল্‌শ্‌ সাবমেরিনের ভিতরে, আগেরবারও খেয়াল করেছে রানা, জায়গা থাকে খুব কম। নাকের কাছে থাকে একেবারে আদিম পর্যায়ের স্টিয়ারিং সিস্টেম এবং ডাইভিং কণ্ট্রোল মেকানিযম। তবে রানা আসলে খুঁজছে স্কাটল ভাল্‌ভ। এগুলো সাধারণত থাকে সাবমেরিনের লেজের কাছাকাছি কোথাও।

সাবমেরিনের ভিতর ঘুটঘুটে অন্ধকার। সঙ্গে আছে কাদা আর জলজ আগাছায় ভরা পানি। ফ্ল্যাশলাইটের আলো খুব একটা

সুবিধা করতে পারছে না। এগোতে গিয়ে হাতড়াতে হচ্ছে রানাকে। সাবমেরিনের সিলিণ্ডারের-আকৃতিবিশিষ্ট দেয়ালগুলোর স্পর্শ পাচ্ছে ও একটু পর পর। টের পাচ্ছে বদ্ধ জায়গায় পানি যেন চ্যাপ্টা করে ফেলতে চাচ্ছে ওকে। বাতাসের জন্য হোক অথবা অজানা কোনও কারণেই হোক, কেমন যেন করছে বুকের ভিতরে। মাথা ঝাঁকিয়ে অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলতে চাইল রানা। স্কাটল ভাল্‌ভ শব্দটা মনে মনে আউড়াল দু'বার।

ডানে, বাঁয়ে, সামনে বার বার ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলছে ও, সাবমেরিনের কাঠামোর সঙ্গে আটকানো বিশেষ একটা লিভার খুঁজছে। হঠাৎই দেখতে পেল লিভারটা। কিছুটা সামনের দিকে, বাঁয়ে। কাদাপানি আর জলজ আগাছা ঠেলে আরও কয়েক কদম এগিয়ে গেল রানা। লিভারটাকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে শক্ত করে ধরল। তারপর জোরে ঠেলা মারল উপরের দিকে।

নড়ল না লিভার। শক্ত হয়ে আটকে গেছে। আরও একবার ঠেলা মারল রানা। এবারও একই ফলাফল।

কোমর থেকে ডাইভিং নাইফটা বের করল রানা। লিভার আর সাবমেরিনের কাঠামোর সংযোগস্থলে ছুরিটা ঢুকিয়ে দিল। তারপর বাঁট ধরে বারকয়েক মোচড় দিয়ে আরও ভিতরে ঢুকাল ছুরির ফলা। এবার বাঁ হাতে ফ্ল্যাশলাইট আর ছুরির বাঁট ধরে রেখে ডান হাতের তালু দিয়ে সজোরে ধাক্কা মারল লিভারে।

তিমির গায়ে হারপুন বিঁধলে যেভাবে রক্ত বের হতে শুরু করে, কয়েক যুগ ধরে জমা বেশ কিছু মরিচা সেভাবে আলগা হলো লিভারের গোড়া থেকে। কিন্তু নড়ল না ওটা। দাঁতে দাঁত চাপল রানা। বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি টের পাচ্ছে। একটু পরই অক্সিজেনের জন্য আকুলিবিকুলি শুরু করে দেবে ফুসফুস। তারপর মাথায় পড়তে শুরু করবে হাতুড়ির বাড়ি।

শরীরের প্রায় সব শক্তি হাতের তালুতে জড়ো করে তৃতীয়বার

ধাক্কা মারল রানা লিভারে। এবার কাজ হলো। উপরে উঠে গেল লিভার। সময় নষ্ট না করে নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরল রানা, এগিয়ে যাচ্ছে দ্বিতীয় লিভারটার দিকে। টের পাচ্ছে হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি আরও বেড়েছে।

দ্বিতীয় ভালভটাকে ঠেলা মারার আগে ওটার "পাদদেশে" ছুরি ঢুকিয়ে আগেরবারের মতো করে মোচড় দিয়ে নিল ও। তারপর ঠেলা মেরে ভালভটাকে উপরে উঠিয়ে দিয়েই ঘুরল। পানি ঠেলে এগিয়ে গেল ডোম হ্যাচের দিকে, বের হয়ে নষ্ট করল না এক সেকেণ্ডও, পানিতে দু'-তিনবার লাথি মেরে উঠতে শুরু করে দিয়েছে উপরের দিকে।

ভেসে উঠেই মুখ হাঁ করল রানা, ওর ফুসফুস দুটো পুরো গুহার সব বাতাস এক নিমিষে টেনে নিতে চাচ্ছে যেন। ওকে একটানা কিছুক্ষণ দম নেয়ার সুযোগ দিল সোহানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক আছো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে প্রশ্নটার উত্তর দিল রানা।

রানার পরিকল্পনার পরবর্তী অংশটা সময় নিল পাক্কা তিন ঘণ্টা।

ওদের কাছে যতটুকু দড়ি আছে তার সবটুকু কাজে লাগাল ও। যথেষ্ট সময় আর ঝুঁকি নিয়ে জার্মানদের পিয়ার থেকে খুলে বা কেটে নিয়ে এল কয়েক শ' ফুট লম্বা দড়ি। কোনও কোনও দড়ি পচে গেছে, ওগুলো দিয়ে কাজ হবে না। কোনও কোনওটা পানিতে ভিজে অথবা কালের ছোবলে এত দুর্বল হয়ে গেছে যে, রানার নিজেরই সন্দেহ হলো কাজ হবে কি না।

যেসব দড়ি দিয়ে কাজ হতে পারে সেগুলোকে যখন জোড়া লাগাচ্ছে রানা তখন সোহানা জিজ্ঞেস করল, 'যদি ছিঁড়ে যায় এগুলো তা হলে তো তোমার প্ল্যান বাতিল, না?'

'হুঁ,' ছোট করে জবাব দিল রানা।

‘সেক্ষেত্রে কী করবে ভেবেছ?’

‘তোমার সিগনাল আইডিয়াটা কাজে লাগানো যায় কি না দেখবো।’

‘তার মানে আমাদের হাতে একটামাত্র সুযোগ আছে?’

মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘ওয়ান অ্যাণ্ড ওনলি। ঠিক তোমার মত।’

ঘণ্টা চারেক পর, রানার হাতঘড়িতে তখন রাত দুটো, ওদের পরিকল্পনার প্রস্তুতিপর্ব শেষ হলো। ওরা দু'জন তখন দাঁড়িয়ে আছে সাবমেরিনের কাছের বালিতে, এতক্ষণ যা করেছে তা দেখছে ফ্ল্যাশলাইটের আলোয়।

দড়ির চতুর্মুখী চারটে লাইন বের হয়ে এসেছে পানির উপরিতল থেকে। একটা লাইনের একপ্রান্ত আটকানো হয়েছে সাবমেরিনের সামনের দিকের সঙ্গে। আরেকটা লাইনের একপ্রান্ত বাঁধা হয়েছে ওটার স্টার্ণ ক্লিটের সঙ্গে। গুহার ছাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর বিশেষ কায়দায় অনেকগুলো হুক আটকিয়েছিল জার্মানরা, পিয়ারের তক্তাগুলোকে ধরে রেখেছে ওগুলো: দুটো লাইনের দু'প্রান্ত এসে ঢুকেছে আলাদা দুটো হুকের ভিতর দিয়ে। এ-কাজটাও করেছে রানা। কোমরের সঙ্গে দড়ির একটা প্রান্ত ভালোমতো জড়িয়ে নিয়ে পিয়ার-ধরে-রাখা স্টীলের দড়ি বেয়ে উঠে গেছে ও দক্ষ ক্লাইম্বারের মতো, তারপর জায়গামতো ঢুকিয়ে দিয়েছে কোমরের দড়িটা। একই কাজ দু'বার করতে হয়েছে ওকে। পরে ক্যাটওয়াকের তক্তাগুলোকে সাপোর্ট-দেয়া আলাদা দুটো কেবলের সঙ্গে বেঁধেছে দুটো দড়ির অন্যপ্রান্ত।

সঙ্গমের সময় একটা সাপ আরেকটা সাপকে যেভাবে পেঁচিয়ে ধরে, বাকি দুটো লাইন সাবমেরিনের তলাটাকে পেঁচিয়ে ধরেছে ঠিক সেভাবে, তারপর পানির নীচ থেকে উঠে এসে আগের দুটো লাইন যে-ক্যাটওয়াকের সঙ্গে বাঁধা হয়েছে সেখানেই বাঁধা পড়েছে। তবে বিশেষ একটা জায়গায়, বিশেষ একটা কায়দায়।

ক্যাটওয়াকটার ঠিক মাঝখানে বেঁধেছে রানা শেষের লাইন দুটোকে, সঙ্গে নিখুঁত হিসেব কষে আটকে দিয়েছে একটা স্কুবা ট্যাঙ্ক। সামনের এক অন্ধকার টানেলের দিকে মুখ করে আছে ট্যাঙ্কটা, দেখে মনে হচ্ছে ছুট লাগানোর অপেক্ষায় আছে কোনও অনুভূমিক রকেট।

'তা হলে,' স্কুবা ট্যাঙ্কটাকে আরেকবার দেখে নিয়ে মুখ খুলল সোহানা, 'তোমার প্ল্যানটা হলো এ-রকম: গুলি করবে তুমি স্কুবা ট্যাঙ্কে। বিস্ফোরিত হবে ওটা, প্রচণ্ড টান পড়বে ওটার গায়ে-প্যাঁচানো দড়িতে। ট্যাঙ্কটা ক্যাটওয়াকের ঠিক মাঝখানে বসানো হয়েছে বলে বিস্ফোরণের ফলে একইসঙ্গে ধসে পড়বে ক্যাটওয়াকটাও। কাজেই ধরে নিচ্ছি সাবমেরিনের তলা পেঁচিয়ে-রাখা দড়িতে এবং ওটার সামনের আর পিছনের দিকে দড়িতে টান পড়বে একইসঙ্গে। যেহেতু আলাদা দুটো হুকের সঙ্গে বাঁধা আছে দড়ি, তাই ক্যাটওয়াক পড়তে শুরু করলে কপিকলের ভূমিকা পালন করবে সেটা। সুতরাং আমরা আশা করছি পানির উপরে ভেসে উঠবে সাবমেরিন, ভিতরের সব পানি হুড়মুড় করে বেরিয়ে যাবে একইসঙ্গে।'

'ঠিক বলেছ, সোহানা, আশা করছি সে-রকমটাই ঘটবে। বিস্ফোরিত হলে রকেটের গতি পাবে ট্যাঙ্ক, ছুট লাগাবে সামনের দিকে। ধাক্কার চোটে ছিঁড়ে পড়ে যাবে ক্যাটওয়াকের ঠিক মাঝখানের কেবল দুটো। বাকিটা...আমাদের ভাগ্য বলতে পারো।'

'তুমি ঠিক হিসেব করেছ তো? সাবমেরিন আর তার ভিতরের পানির ওজন, ক্যাটওয়াকের ওজনের চেয়ে কম?'

নির্মল হাসি হাসল রানা। 'হ্যাঁ, সোহানা, ঠিকই আছে, যদি না ম্যাথ ভুলে গিয়ে থাকি।'

হাসল সোহানাও। 'পুরনো হয়ে মরচে ধরে যাওয়ার পরও

টুলবক্সে-পাওয়া হ্যাকস'টা কাজে লেগেছে। ওটা দিয়ে ক্যাটওয়াক ধরে-রাখা আঠারোটা স্টীল কেবলের এগারোটা কেটেছি।'

সাবমেরিনের কাছে জড়াজড়ি করে থাকা শিকড়গুলোর আড়ালে গিয়ে "পজিশন" নিল দু'জনে। ডান হাতে রিভলভার নিয়ে হাতটা বাঁ হাতের কব্জির উপর স্থির করল রানা, তাক করল, টান দিল ট্রিগারে। প্রায় একসঙ্গে অনেকগুলো ঘটনা ঘটল তারপর।

বদ্ধ জায়গায় রিভলবারের আওয়াজ শোনাল কামানের গোলার মতো। প্রচণ্ড এক হিসহিসানি শোনা গেল, তারপরই আরেকটা বিস্ফোরণের আওয়াজ, রিভলভারের চেয়ে বেশি বৈ কম না। একঝলক আলো দেখা দিয়েই উধাও হলো, সঙ্গে সঙ্গে ধসে পড়ল ক্যাটওয়াক, পায়ের নীচে টের পাঁওয়া গেল অদ্ভুত এক কম্পন। প্রচণ্ড এক ভুস্স্ শব্দ শুনতে পেল রানা-সোহানা; সোহানার মনে হলো মাথার ফুটো দিয়ে পানি ছিটিয়েছে কোনও নীল তিমি।

শিকড়ের "আড়াল" ছেড়ে বের হলো রানা-সোহানা। টানা প্রায় দশ সেকেণ্ড কিছুই দেখতে পেল না ওরা, কারণ জায়গাটা ভরে গেছে সূক্ষ্ম কুয়াশায়। আস্তে আস্তে কেটে গেল কুয়াশা, সামনের দিকে তাকাল রানা-সোহানা।

শান্ত ভঙ্গিতে পানির উপর ভাসছে মিনি সাবমেরিন ইউ.এম. সেভেণ্টি সেভেন। মোটা জলধারা গড়িয়ে নামছে ওটার প্রায় পুরো কাঠামো বেয়ে।

একুশ

রানা-সোহানার দু'জনেরই মাথার ভিতরে দপ দপ করছে। আরেকবার পাক খেল সাবমেরিনটা, তারপর বড় একটা বোল্ডারের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে কাত হয়ে গেল বাঁ দিকে। এরপর স্রোতের ধাক্কায় খাড়া হয়ে গেল হঠাৎ, ঢুকে পড়ল নদীর মেইন চ্যানেলে।

সাবমেরিনের অ্যাক্রিলিক ডোম দিয়ে সমানে পানি ঢুকছে। পানির ছিটায় বার বার চোখ বন্ধ করতে হচ্ছে রানাকে। ভালোমত দেখতে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর কমলো পানির অত্যাচার। হাত দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল ও। এদিক-ওদিক তাকাল।

দু'দিকে ভেজা পাহাড়ি দেয়াল, চকচক করছে ফ্ল্যাশলাইটের আলোয়। সাবমেরিনের মোচাকৃতির নাক বেয়ে এখনও পানি ঢুকছে। থেকে থেকে দুলে দুলে উঠছে সাবমেরিনটা।

সোহানার দিকে তাকাল রানা। 'ঠিক আছো?'

ককপিটের সীটের পিছনে শুয়ে আছে সোহানা। দু'হাত জড়িয়ে ধরে আছে সীটটাকে। রানার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'কতক্ষণ হলো এই নাগরদোলায় দুললাম আমরা?'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'বিশ মিনিটের মতো।'

'মাই গড!' চিৎকার করে উঠল সোহানা। 'মাত্র?'

এর আগে, সাবমেরিনটা ভেসে ওঠার পর, বুক-পানি ঠেলে ওটার

কাছে গিয়ে দাঁড়ায় রানা-সোহানা।

'তোমার প্ল্যানটা তা হলে কাজে লাগছে রানা!' বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে সোহানা।

মাথা নাড়ে রানা। 'বলো প্ল্যানের অর্ধেকটা কাজে লেগেছে। বাকি অর্ধেক...' কথা শেষ না করে সোহানার হাত ধরে টান দেয় ও, 'চলো গিয়ে ঢুকি সাবমেরিনটাতে।'

ভিতরে ঢোকার আগে উঁকি দিয়ে দেখে নেয় রানা। তারপর সোহানাকে নিয়ে পিছনের দিক দিয়ে ওঠে। এতে কিছুটা নিচু হয়ে যায় পিছনের দিক, সাবমেরিনের সামনের দিকে জমে-থাকা পানি গড়িয়ে পড়ে যায় আপনা থেকে।

এরপর রানা ভালোমতো দেখে সাবমেরিনের কোথাও কোনও লিক আছে কি না। নেই, তাই সন্তুষ্ট হয়ে আরও কিছু পরীক্ষানিরীক্ষার কাজে মন দেয় ও। সাবমেরিনের দু'পাশের পঞ্চাশ গ্যালনের ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক দুটো ঠিক আছে, দেখে মনে হচ্ছিল ভর্তি, তাই ভারসাম্য বজায় রাখতে অসুবিধা হচ্ছিল না সাবমেরিনটার।

ইঙ্গিতে সোহানাকে নেমে আসতে বলে রানা। পানি ঠেলে তীরের বালিতে এসে দাঁড়ায় দু'জনে। পাথর সরিয়ে-পাওয়া চারটে লণ্ঠনই জ্বালায় রানা। ছোট করে আগুন ধরায় সোহানা. গরুর মাংস সেঁকে নিয়ে খেয়ে নেয় দু'জনে। পরবর্তী সময়ে কোন কোন জিনিস কাজে লাগতে পারে হিসেব করে সেগুলো গুছিয়ে রাখে রানা। কাজ শেষে ঝাঁপিয়ে পড়ে পানিতে, ক্যাটওয়াকটা যেদিকে ধসে পড়েছে সাঁতার কেটে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে কিছু তক্তা কুড়িয়ে আনে। হ্যাক-স'টা আবার কাজে লাগিয়ে অনেকটা বৈঠার মতো আকৃতিতে কাটে দুটো তক্তা। যথেষ্ট সময় খরচ হয়, ঠিকমতো হয় না "বৈঠা" বানানো, তারপরও নিজের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকায় ও। সবশেষে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো, "বৈঠা"

দুটো আর সোহানাকে নিয়ে গিয়ে ওঠে সাবমেরিনে।

'এবার?' জানতে চায় সোহানা।

'এবার ঠিক দু'ঘণ্টা ঘুমাবো। খেয়াল করেছ কি না জানি না, এতক্ষণ ভাটা চলছিল, তাই স্রোতের তেজ ছিল না বললেই চলে। কিন্তু আমরা যখন জেগে উঠবো তখন আবার ফুঁসতে শুরু করবে গুহার পানি। আশা করছি ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটে উঠবে আকাশে। এণ্ট্রি হ্যাচটা আপাতত খোলা থাক। রওনা দেয়ার সময় বৈঠা চালিয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ড নদীর মূল স্রোতে নিয়ে ফেলতে হবে সাবমেরিনটাকে।'

'তারপর?'

'তখন সঙ্গে সঙ্গে এণ্ট্রি হ্যাচ বন্ধ করে দিয়ে হাতের কাছে যা পাবো আঁকড়ে ধরে বসে থাকবো। ভাগ্য আমাদেরকে ভাসাতে ভাসাতে কোথায় নিয়ে যায়, দেখা যাক।'

'সাবমেরিনের অবস্থা কী?' আবারও চিৎকার করল সোহানা।

'মনে হচ্ছে ভালোই। অ্যালুমিনিয়ামের বডির তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি। আর এখানকার জিয়োলজিও আমাদের পক্ষে।'

'মানে?'

'টানেলের দেয়াল এবড়োখেবড়ো। কিন্তু ভিতরকার পাথর আর বোল্ডারগুলো প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষয়ে গিয়ে অনেকখানি মসৃণ হয়ে গেছে। চোখা কোনও প্রান্ত নেই কোথাও। তাই সাবমেরিনের অ্যালুমিনিয়াম বডিতে চিড় ধরেনি।' ধাক্কা সামলানোর ভঙ্গিতে একদিকে কাত হয়ে গেল রানা, চেঁচিয়ে বলল, 'সাবধান, সোহানা! সামনে আরেকটা বড় পাথর!'

ককপিটের সীটটাকে আবারও জড়িয়ে ধরল সোহানা।

স্রোতের ধাক্কায় আরও একবার ঘুরপাক খেল সাবমেরিনটা,

আগের চেয়েও বড় একটা বোল্ডারের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে স্থির হলো কয়েক মুহূর্ত পর।

'উহ্, মাগো!' দুলুনি থেমে যাওয়ার পর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল সোহানা।

ওর কপালের কয়েকটা আঁচড়ের দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা। 'আফসোস কোরো না। কথা দিচ্ছি, হোটেলে যদি ফিরতে পারি, ভালোমতো খাতিরযত্ন করবো তোমার।'

হাসল সোহানা, জিভ বের করে ভেংচি কাটল।

নদীর এই অংশে গভীর একটা ঢাল আছে। সে-কারণে এখানে স্রোত বেশ তীব্র। ক্যারমের ঘুঁটিগুলো বোর্ডের দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে যেভাবে এদিক-সেদিকে ছিটকে যায়, পাহাড়ি দেয়াল বা বোল্ডারে বাড়ি খেয়ে খেয়ে সাবমেরিনটাও প্রায় সেভাবে এগোচ্ছে। সময়ে সময়ে, অনেকটা হঠাৎ করেই চওড়া হয়ে যাচ্ছে টানেলটা। স্রোতের তীব্রতা কমছে অনেকখানি। রানা তখন উঠে গিয়ে খুলে দিচ্ছে অ্যাক্রিলিক ডোম। তাজা বাতাস ঢুকছে সাবমেরিনের ভিতরে। ডোম যখন বন্ধ থাকছে, স্কুবা ট্যাঙ্ক থেকে অক্সিজেন সাপ্লাই দিচ্ছে সোহানা।

এভাবে প্রায় তিন ঘণ্টা চলার পর পানির শব্দ কমে এল অনেকখানি, হঠাৎ করেই। রানা-সোহানা টের পেল সাবমেরিনের "গতি" কমতে শুরু করেছে। আগেরমতো ঘুরপাকও খাচ্ছে না। দুলুনিও কমে গেছে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল সোহানা, ভুরু নাচাল।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক বুঝতে পারছি না। দেখা যাক।'

অ্যাক্রিলিক ডোমের দিকে এগিয়ে গেল ও। 'একদিকের গাল

ঠেসে ধরল ওটার সঙ্গে। চোখ বড় বড় দেখার চেষ্টা করছে কী আছে বাইরে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে কোনও একটা গুহার ভিতরে হাজির হয়েছে ওরা। ছাদ থেকে ঝুলছে স্ট্যালাকটাইটের দণ্ড। অস্পষ্ট একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে বাইরে থেকে। কীসের, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ডোমের গায়ে জড়াজড়ি করে আছে কিছু আগাছা। তেজহীন রোদের হলুদ আভা চোখে পড়ছে।

'সূর্য নাকি!' সোহানার কণ্ঠে জিজ্ঞাসার চেয়ে আশ্চর্য হওয়ার ভাব বেশি।

জবাব না দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা।

তারপর আরও কিছুক্ষণ ধীর গতিতে এগিয়ে মৃদু একটা ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে দাঁড়াল সাবমেরিন। বোঝা গেল, তীরে ভিড়েছে। আবারও বাইরে তাকাল রানা। আরেকটা লেগুনের চড়ায় এসে আটকে গেছে সাবমেরিনটা। 'সোহানা, মনে হয় পৌঁছে গেছি আমরা,' বলল ও।

ডোমটা খুলল ও। এক ঝলক ঠাণ্ডা, নোনা বাতাস ঢুকে পড়ল ভিতরে। লম্বা করে দম নিল রানা। দু'হাত বাইরে বের করে আঁকড়ে ধরল ডোমের দু'প্রান্ত, ঝুলে পড়ল। শরীরের সব ভার হাতে নিয়ে মাথাটা বের করল ডোমের বাইরে। উজ্জ্বল সূর্যালোকে আপনা থেকে কুঁচকে গেল চোখ।

বাঁ দিক থেকে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ আসছে। বিস্ময়ধ্বনি প্রকাশ করেছে কেউ। সেদিকে ঘাড় ঘুরাল রানা। বড়জোর দশ ফুট দূরে, বালির উপর বসে আছে একজোড়া কপোতকপোতী। পরনে ডাইভিং ফিন আর স্কুবা হার্নেস। দু'জনই হতভম্ব। যুবতীর মুখ হাঁ। রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওরা।

কিছুটা সময় নিয়ে ওদেরকে দেখল রানা। রোদে পুড়ে বাদামি হয়ে গেছে যুবকের গায়ের রঙ। যুবতীর মাথায় ব্লণ্ড চুল। বোঝা

গেল, ট্রপিকাল অ্যাডভেঞ্চারে বের হয়েছে প্রেমিক-প্রেমিকা।

'গুড মর্নিং,' মিষ্টি করে হাসল রানা। 'তোমরা দেখছি আমাদের মতোই কেভ ডাইভিং করছ। পার্থক্য একটাই—আমাদের সঙ্গে আদ্যিকালের একটা সাবমেরিন আছে।'

একইসঙ্গে মাথা ঝাঁকাল কপোতকপোতী, কিছু বলল না। বিস্ময়ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও।

'জায়গাটা বেশি ভালো না, বুঝেছ?' উপদেশ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল রানা, ডোমের ফোকর দিয়ে পুরো শরীর বের করে উঠে এসেছে সাবমেরিনের উপর। 'সাবধান থেকো। না হলে হারিয়ে যেতে পারো।'

এবারও কিছু বলল না কপোতকপোতী।

একটা বুদ্ধি খেলে গেল রানার মাথায়। সাবমেরিনের পিঠ থেকে লাফ দিয়ে বালির উপর নামল ও। এগিয়ে গেল কপোতের দিকে। বন্ধুত্বের ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল, হ্যাণ্ডশেকের সময় ঝাঁকুনি দিল জোরে। বলল, 'নাম কী তোমার?'

'বব,' সংক্ষেপে বলল যুবক।

'আমি অ্যানা,' যুবতী নিজে থেকেই নাম জানিয়ে দিল।

'কোত্থেকে এসেছ?'

'মিনেসোটা থেকে,' জবাব দিল সারা। 'হানিমুন করছি।'

'আসলে...' ইতস্তত করার ভঙ্গি করল রানা, 'আমরা হারিয়ে গেছি।' সোহানার দিকে ইঙ্গিত করল। 'আমরাও হানিমুনে এসেছি। কিন্তু কোন্ গুহার ভিতরে ঢুকে যে কীভাবে কী হয়ে গেল বলতে পারবো না। এখন কোথায় আছি বলতে পারো?'

'রাম কে'র দক্ষিণ উপকূলে। নাসাউকানু পাহাড় আর ফ্রিডম পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায়।'

তারমানে, মনে মনে হিসাব করল রানা, আণ্ডারগ্রাউণ্ড নদী দিয়ে ন'মাইলের মতো এসেছি আমরা।

টুকটাক কথাবার্তার মাধ্যমে জানা গেল বব আর অ্যানা বেশিক্ষণ থাকবে না এখানে, এবার ওদের ফেরার পালা। ভাড়া-করা নৌকায় রানা-সোহানাকে স্বাচ্ছন্দ্যে তুলে নিতে রাজি হলো ওরা।

ফেরার পথে সাবমেরিনের ব্যাপারে বেশ আগ্রহী দেখা গেল ববকে। বার বার এটা-সেটা জিজ্ঞেস করতে লাগল। যতটা সম্ভব সংক্ষেপে এবং সত্য এড়িয়ে গিয়ে জবাব দিল রানা।

যে-ল্যাণ্ডিংবীচের মাধ্যমে রাম কে-তে আগমন ঘটেছিল রানা-সোহানার, "গোট'স হেডের" সন্ধানে বের হওয়ার বিয়াল্লিশ ঘণ্টা পর সেখানে ফিরে এল দু'জনে।

প্রথমেই পিলাতোসের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল রানা। পাত্তা নেই লোকটার। ওর কুঁড়েঘরটাও কেমন খাঁ খাঁ করছে।

রানা টের পেল, কেন যেন অস্বস্তি লাগছে ওর কাছে।

বোনানযাটা আগের জায়গাতেই আছে। দেখে মনে হচ্ছে কেউ হাত দেয়নি। ধীর পায়ে ওটার দিকে এগিয়ে গেল রানা। ককপিটের দরজা খুলে সাবধানে উঁকি দিল ভিতরে। না, কেউ লুকিয়ে নেই। খানিকটা আশ্বস্ত হলো ও। সোহানা দাঁড়িয়ে আছে দূরে, ওকে ইঙ্গিতে নিজের হাতঘড়িটা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল দেরি করতে চাচ্ছে না।

এদিক-সেদিক তাকাচ্ছিল সোহানা। রানা ককপিটে উঠে বসছে দেখে হাঁটা ধরল। কিছুক্ষণ পর উঠে বসল রানার পাশের সীটে।

ওদের দু'জনকে নিয়ে বোনানযাটা রওয়ানা দিল রাম কে'র মেইন আইল্যাণ্ডের দিকে।

বাইশ

হোটেলে ফিরে এসেছে রানা-সোহানা। লম্বা সময় নিয়ে একসঙ্গে গোসল করেছে দু'জন। সী-ফুড সালাদ, গরম রুটি আর ট্রপিকাল ফ্রুট দিয়ে লাঞ্চ করতে বসেছে এখন।

'স্বর্গ, রানা,' খেতে খেতে বলল সোহানা।

কথাটা বুঝতে না পেরে মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল রানা। 'কী বললে?'

'বললাম গত দু'দিন যে-অবস্থার মধ্যে ছিলাম তার তুলনায় এই হোটেল এককথায় স্বর্গ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল রানা। একটুকরো রুটি ছিঁড়ে নিয়ে মুখে দিল। চিবাতে চিবাতে বলল, 'অপির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। জানিয়ে দিয়েছি ঠিক আছি আমরা।'

'ও কী বলেছে?'

রানা জবাব দেয়ার আগে স্যাটেলাইট ফোনটা বেজে উঠল। স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে রানা দেখে নিল কে ফোন করেছে। তারপর সোহানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আগেরবার কিছু বলেনি, এবার বলবে। অপিই ফোন করেছে।' কল রিসিভ করে স্পিকারফোন চালু করে দিল।

'মাসুদ ভাই, কী অবস্থা আপনাদের?' গলা শুনে মনে হলো দুশ্চিন্তায় ভুগছে অপি।

গোট'স হেড অ্যাডভেঞ্চারের কথা গুছিয়ে কিন্তু সংক্ষেপে

বলল রানা। ওরা সম্পূর্ণ অক্ষত আছে, নিরাপদে আছে, জানাল আবারও।

'মাসুদ ভাই, সোহানাদিকে নিয়ে আপনি কোথাও যাবেন, আর সেখানে কোনও ঝামেলা হবে না—এ হতেই পারে না। আপনার পদে পদে বিপদ, আবার বুদ্ধি খাটিয়ে সেই বিপদ থেকে সবসময় উদ্ধার পান আপনি।'

রানা বা সোহানা কেউ কোনও মন্তব্য করল না এ-ব্যাপারে।

অপি বলে চলল, 'একটা খবর আছে আপনাদের জন্য।'

রানা বলল, 'যেমন?'

'যেমন নিয়াযভের বদলে কেন মেলিখান হঠাৎ হাজির হলো আপনাদের সামনে।'

'কেন?'

'কারণ য়াল্টা, মানে দক্ষিণ ইউক্রেনের এক অবকাশ যাপনকেন্দ্রের বাইরে, পার্কিং লটে পাওয়া গেছে নিয়াযভের লাশ। হাত-পা নেই। শটগান দিয়ে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে ওকে।

'জানলে কীভাবে?'

'আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলেন সোহেল ভাই। সম্ভব হয়নি দেখে আমাকে ফোন দিয়েছেন। তিনি বলেছেন আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ হলে যেন...'

'সাবধানে থাকতে বলো আমাদেরকে, না?' অপিকে কথা শেষ করতে দিল না রানা। 'সাবধানেই আছি আমরা। ওর সঙ্গে যদি আবার যোগাযোগ হয় তোমার, ওকেই বরং দুশ্চিন্তা করতে মানা কোরো।'

'আচ্ছা মাসুদ ভাই, মেলিখান এত জলদি আপনাদেরকে খুঁজে বের করল কীভাবে?'

'কথাটা আমরাও ভাবছি। ক্রেডিট কার্ডের সূত্র ধরে...'

'এমনকী মেলিখানের মতো একজন অর্গানাইযড ও ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনালের পক্ষেও কাজটা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব না,' এবার রানাকে থামিয়ে দিল অপি। 'তবে আমার মনে হয় না এত ঝামেলা করেছে সে। আমাদের এখানকার কোনও কম্পিউটারও হ্যাকড হয়নি। তারমানে অন্য যে-কোনওভাবেই হোক, আপনারা কখন কোথায় যাচ্ছেন সে-খবর ঠিকই পেয়ে যাচ্ছে সে।'

'তা হলে আমাদের আগেই তো গোট'স হেড সম্পর্কে জানার কথা মেলিখানের,' বলল রানা। 'কিন্তু দেখা গেল ওদের আগে সেখানে হাজির হয়েছি আমরা।'

'হয়তো...' অপির কণ্ঠে অনিশ্চয়তা, 'আমরা যতটা খোঁজখবর করেছি ততটা করেনি ওরা। যা-হোক এ-বিষয়ে আবারও কথা বলতে হবে সোহেল ভাইয়ের সঙ্গে। দেখি তিনি কী বলেন। এবার মিস্টার হোগানের বোতলের ব্যাপারে কিছু বলি।'

নড়েচড়ে বসল রানা-সোহানা দু'জনই। বুঝতে পারছে গত দু'দিন বোতলের ব্যাপারে আরও কিছু গবেষণা করেছে অপি।

'ওটার ছবি তুলে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। ছবিগুলো বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বার বার দেখেছি আমি। চামড়ার লেবেলটা আসলে...কী বলবো...একক কোনও খণ্ড না। আসলে দুটো লেয়ারকে বিশেষ কায়দায় জোড়া দিয়ে ওই লেবেল বানানো হয়েছে। উপরের লেয়ারটা তুলতে পেরেছি। খুব সাবধানে করেছি কাজটা যাতে নীচের লেয়ারের কোনও ক্ষতি না হয়।'

'কী পাওয়া গেল নীচের লেয়ারে?' জানতে চাইল সোহানা।

'একটা সংকেত।'

'সংকেত? কীসের?'

'জানি না। একটার সঙ্গে আরেকটার মিল নেই এ-রকম আটটা চিহ্ন দিয়ে বানানো একটা সংকেত। আমি...নেপোলিয়নের

সঙ্গে এই সংকেতের কোনও মিল বের করতে পারিনি এখনও।'শূন্য দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল সোহানা। ধাঁধা আরও জটিল হচ্ছে।

'ক্রিপটোগ্রাফি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার মনে হয় তা-ই,' বলল অপি। 'ওই সংকেত দেখে দেখে হুবহু আঁকার চেষ্টা করেছি, বলতে গেলে মিলে গেছে পুরোপুরি। আমার ড্রইংটা স্ক্যান করে রেখেছি, ফাইলটা পাঠিয়ে দিচ্ছি এখনই।'

নীরবতা। কয়েক মুহূর্ত পর রানার ই-মেইল অ্যাকাউণ্টে শব্দ হলো, অপির মেইলটা এসেছে। অ্যাটাচমেন্টটা ডাউনলোড করল রানা: 

অনেকক্ষণ চুপ করে সংতেটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। সোহানাও কিছু বলছে না।

'সংকেতটা কীভাবে ডিকোড করতে হবে সে-বিষয়ে ভেবেছি আমি,' রানা-সোহানাকে চুপ করে থাকতে দেখে মুখ খুলল অপি। 'অন্তত শুরু করতে হবে কোত্থেকে তা অনুমান করতে পেরেছি মনে হয়। "দ্য মেজর" নামের ওই রহস্যময় মানুষটার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের? সেইন্ট হেলেনায় যাওয়ার জন্য চোরাকারবারি অ্যারিয়েনকে ভাড়া করেছিল যে লোক?'

'হুঁ, আছে,' সংক্ষেপে বলল রানা।

'আমার মনে হয় ওই মেজরের পরিচয় জানতে পেরেছি।'

চুপ করে অপেক্ষা করছে রানা-সোহানা।

'১৮৪০ সালে বিখ্যাত এক জার্মান ইতিহাসবিদ নেপোলিয়নের জীবনকাহিনি রচনা করেন। সেখানে তিনি বলেন, ১৭৭৯ সালে একটা ফরাসি সামরিক স্কুলে পাঠানো হয় নেপোলিয়নকে। তখন তাঁর বয়স নয় বছর। স্কুলটা ট্রয়েসের কাছে, নাম ব্রিয়েনে-ল্য-শ্যাতো। সেখানে আরনঁদ লোরন নামের

এক বালকের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। পরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয় দু'জনের। এমনকী ওয়াটারলু যুদ্ধেও একসঙ্গে লড়েছেন তাঁরা। ফরাসি সেনাবাহিনীতে এমন একটা সময় ছিল যখন নেপোলিয়নের চেয়ে এক র‍্যাঙ্ক উপরে ছিলেন লোরন। দু'বন্ধু যখন নিজেরা নিজেরা কথা বলতেন, তখন প্রায়ই ঠাট্টা করে লোরনকে "দ্য মেজর" বলে ডাকতেন নেপোলিয়ন। জীবনে অনেক বন্ধু পেয়েছেন ফরাসি সম্রাট, কিন্তু ওই জার্মান ইতিহাসবিদের মতে, কেউই লোরনের মতো বিশ্বস্ত ছিলেন না।'

'বুঝলাম,' আলতো করে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কিন্তু এই কোডের সঙ্গে লোরনের সম্পর্ক...'

'বলছি,' আরও একবার রানাকে থামিয়ে দিল অপি। 'আঠারো শ' পঁচিশ সালে, নেপোলিয়নের মৃত্যুর চার বছর পর, মারা যান লোরন। তবে তার আগে, উত্তরসূরী বা ঘনিষ্ঠজন যা-ই বলি না কেন, তাদেরকে বলে যান তাঁর সবচেয়ে দামি সম্পদটা যেন তাঁর লাশের সঙ্গেই কবর দেয়া হয়...'

'এবং সেই "সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ" হচ্ছে একটা বই—ডিকোডার বুক,' এবার অপিকে থামিয়ে দিল সোহানা, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। 'জলদি বলো কোথায় কবর দেয়া হয়েছে দ্য মেজরকে?'

'লোরনের বিধবা স্ত্রী মেরি ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন জানান যাতে নেপোলিয়নের কবরের পাশেই সমাধিস্থ করা হয় স্বামীর লাশ। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এই আবেদনে সাড়া দেয়নি। বাধ্য হয়ে, আবার কেউ কেউ বলে খেয়ালের বশে, স্বামীকে এলবা দ্বীপে কবর দেন মেরি।'

'অদ্ভুত,' বিড়বিড় করে বলল সোহানা।

'এলবা দ্বীপে লোরনের কবর আজও আছে,' বলছে অপি। 'তবে ওটা আক্ষরিক অর্থে কবর না। ভূগর্ভস্থ কক্ষ বা মাটির

নীচের একটা ঘর বললেই বোধহয় মানায় বেশি। এখন কথা হচ্ছে, ওই কোডের মানে বের করতে হলে লোরনের কবর খুঁড়তে হবে আপনাদেরকে। কিন্তু...'

'কিন্তু কী?' অধৈর্য হয়ে উঠেছে সোহানা।

'কাজটা করতে হলে লোরনের আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীর অনুমতি লাগবে।'

'মানে?'

'লোরনের এক নাতনীর নাতনী আছে, মোনাকোতে থাকে। যতদূর জানতে পেরেছি, এই মহিলাই এখন তাঁর আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী। কবর যদি খুঁড়তে হয়, আগে এই মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে আপনাদেরকে।'

'তারমানে,' সোহানার দিকে তাকাল রানা, 'আমাদের এখনকার গন্তব্য মোনাকো।'

তেইশ

মোনাকো।

এটা দক্ষিণ-পশ্চিম য়োরোপের একটা স্বাধীন রাষ্ট্র। পৃথিবীর দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম দেশ। এর একদিকে ফ্রান্স, আরেকদিকে ইটালি, বাকিটা ঘিরে রেখেছে ভূমধ্যসাগর। চমৎকার সব বীচ, হোটেল, ক্যাসিনো এবং বার্ষিক মোনাকো গ্রাঁ প্রি অটোমোবাইল রেসের জন্য এ জায়গা পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তাই সারাবছরই এখানে লোক গিজগিজ করে।

লাইলাকে ছাওয়া ড্রাইভওয়ের একপাশে জলপাই-সবুজ পোরশেটাকে থামাল রানা। সামনে একটা সাদা রঙের চার তলা বাড়ি, প্রায় প্রাসাদই বলা যায়। ছাদ টেরাকোটার। ড্রাইভওয়ের মাথায় মস্ত ফটকে লেখা: বেলা ভিস্তা।

আরনঁদ লোরনের নাতনীর নাতনীর নাম জিয়োভানেটা দেলফিনা। বিধবা এবং নিঃসন্তান। পনেরো বছর আগে স্বামী মারা গেছেন। সেই সুবাদে আটটা বীচ রিসোর্ট আর চারটা মোটরস্পোর্টিং ক্লাবের মালিক হয়েছেন তিনি। মোনাকোর বাতাসে জোর গুজব, মহিলার চরিত্র নাকি খারাপ। পঞ্চান্ন বছর বয়সেও ফষ্টিনষ্টির অভ্যাস যায়নি। টাকার লোভে যারা অন্ধ তারা ওঁর শরীর বা বয়স না দেখে সহায়সম্পত্তি দেখে। মহিলা এই বয়সেও ডেটিং-এর অফার পান। তাজ্জব ব্যাপার, হাসিমুখে সে-সব অফার গ্রহণও করেন তিনি। কিন্তু চার মাসের বেশি কাউকে রাখেন না। শখ মিটে গেলে সোজা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন। এই "অর্ধচন্দ্রের" তালিকায় য়োরোপের খানদানি বংশের যুবক থেকে শুরু করে নামীদামি সিলেব্রিটি ও শিল্পপতিরাও আছে। বৈধব্যের পনেরো বছরে কম করে হলেও পনেরোবার বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছেন তিনি। বলা বাহুল্য প্রতিবারই পায়ে ঠেলেছেন। সুখের সব উপকরণ হাতের কাছে থাকতে বিয়ে নামের পরাধীনতায় রুচি নেই দেলফিনার।

কাজেই তাঁর বিশাল ভিলায় একাই থাকেন তিনি। তবে একেবারে একা বলাটা ভুল হবে। একজন খাস চাকরানী আছে। আর আছে রিহেন নামের বিশাল এক ডিয়ারহাউণ্ড।

আশ্চর্যের ব্যাপার, দেলফিনার সঙ্গে দেখা করতে অসুবিধা হলো না রানা-সোহানার। ওরা প্রথমে ভদ্রমহিলার উকিলের সঙ্গে যোগাযোগ করে, কেন দেখা করতে চায় সংক্ষেপে জানায়। একদিনের মধ্যেই ই-মেইলের মাধ্যমে জবাব দেন দেলফিনা।

নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বলে দেন।

পোর্শের দরজা খুলে বেরিয়ে এল রানা-সোহানা। বাড়ির সামনে বড় উঠান, হাঁটছে সেদিকে। পথের একদিকে দেখা যাচ্ছে বেশ বড় একটা ফোয়ারা। মৃদু শব্দে একটানা পানি গড়াচ্ছে সেখানে। ধীর পায়ে হেঁটে এসে সদর-দরজার সামনে থামল দু'জনে।

পুরু মেহগনি কাঠের মধ্যে বর্গাকৃতির অনেকগুলো কাঁচ সুন্দরভাবে বসিয়ে বানানো হয়েছে দরজাটা। বাড়তি কারুকার্য নেই, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় অত্যন্ত দামি। দামটা কত হতে পারে ভাবতে ভাবতে দরজার পাশে দেয়ালে বসানো কলিংবেলে চাপ দিল রানা।

'আ মারসিয়া দে মুনেঘু,' বলল সোহানা।

'কী?' বুঝতে না পেরে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল রানা।

'কলিংবেলের আওয়াজ খেয়াল করোনি? ওটা আ মারসিয়া দে মুনেঘু। মানে প্রিন্সিপালিটি অভ মোনাকোর জাতীয় সঙ্গীত।'

হাসল রানা। 'প্লেনে করে আসার সময় গাইডবুক ঘেঁটেছ মনে হয়?'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল, দরজাটা হঠাৎ করেই খুলে যাওয়ায় বলতে পারল না।

হালকা-পাতলা মধ্যবয়স্ক এক লোক দাঁড়িয়ে আছে ভিতরে। পরনে নেভি ব্লু পাজামা আর পোলো শার্ট। রানা-সোহানাকে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর ভারী গলায় ব্রিটিশ টানে বলে উঠল, 'মিস্টার ও মিসেস রানা?'

ওরা জবাব দেয়ার আগেই দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল লোকটা। মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাল মেহমানদেরকে।

ঢুকল ওরা। ভিতরটা ছিমছাম, রুচিসম্মতভাবে সাজানো। মেঝেতে ব্যবহার করা হয়েছে মিশরীয় পাথর। দেয়ালে নীল

প্লাস্টার। এককোনায় আঠারো শতকের নকশার একটা টেবিল। তার উপর দেয়ালে ঝুলছে রূপার ফ্রেমে বাঁধানো একটা আয়না।

'আমার নাম জনসন,' মধ্যবয়স্ক লোকটা জানাল, 'টেনি জনসন। মালকিন বারান্দায় আছেন। এই দিকে, প্লিয,' হাত তুলে পথ দেখিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

ওকে অনুসরণ করল রানা-সোহানা। হল ধরে এগোচ্ছে জনসন। হাতের ডান দিকে কয়েকটা ঘর। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর ধাক্কা দিয়ে একটা ফ্রেঞ্চডোর খুলল লোকটা। দেখা যাচ্ছে পালিশ করা আখরোটের কাঠ দিয়ে বানানো একসারি সিঁড়ি। হলের বাইরের দিকের দেয়াল বেয়ে উঠে গেছে সিঁড়ির ধাপগুলো।

ফ্রেঞ্চডোরের পাল্লা টপকাল রানা-সোহানা।

'কিছু মনে করবেন না, আপনাদের সঙ্গে আর থাকতে পারছি না,' বলে ঘুরে ফ্রেঞ্চডোর দিয়ে অদৃশ্য হলো জনসন।

'মাই গড, রানা,' সোহানার কণ্ঠে বিস্ময়, 'কী সুন্দর, দেখেছ!'

রেলিং ঘেঁষে, সোহানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ছোট-বড় পাথর ফেলে বেড়িবাঁধের মতো বানানো হয়েছে নীচে। পাশে তালগাছের সারি। সঙ্গে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় গুল্মঝোপ, তাতে বুনোফুলের বাহার। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে মেঘমুক্ত আকাশের পটভূমিতে যেন বিছিয়ে রাখা হয়েছে একটা বেগুনি কার্পেট।

'এ-দৃশ্য এত দেখি,' পিছন থেকে বলে উঠল একটা নারী কণ্ঠ, 'তারপরও আমার ক্লান্তি আসে না।'

ঘুরল ওরা।

সাদা সানড্রেস আর সূর্যমুখীর মতো চওড়া-কানার হ্যাট পরে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন মহিলা। দেখলে চল্লিশের বেশি মনে হয় না বয়স, অথচ রানা-সোহানা শুনেছে পঞ্চান্ন। চেহারাটা রোদেপোড়া, কিন্তু রঙ গাঢ় না। লালচে-বাদামি চোখের কোণ

সামান্য কোঁচকানো।

'রানা আর সোহানা, না?' সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন মহিলা। 'আমি দেলফিনা। আসার জন্য ধন্যবাদ,' তাঁর ইংরেজি উচ্চারণ খাসা। তবে খানিকটা ফরাসি টান আছে।

হাত মেলাল ওরা, সিঁড়ি বেয়ে উঠে হাজির হলো একটা সানরুমে। খুলে দেয়া হয়েছে থাই গ্লাস, সরিয়ে রাখা হয়েছে গজ পর্দা। সেগুনকাঠের কয়েকটা চেয়ার আছে। লম্বা হাতলওয়ালা লাউঞ্জ চেয়ারও আছে দুটো। একটা চেয়ারের ছায়ায় বসে আছে মস্ত এক কালো কুকুর। সতর্কভঙ্গিতে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল রানা-সোহানার দিকে, ওদেরকে কাছে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল। 'বস্, রিহেন,' মনিবের নির্দেশ পেয়ে বসে পড়ল।

বসলেন দেলফিনা, রানা-সোহানাও বসল।

দেলফিনা বললেন, 'আপনারা বোধহয় একটু চমকে গেছেন, না?'

'কেন?' জানতে চাইল সোহানা।

'যেমনটা দেখবেন বলে ভেবেছিলেন আমাকে সে-রকম না আমি।'

'সত্যি বলতে কি, মিসেস দেলফিনা, আসলেই একটু অবাক হয়েছি আমরা,' স্বীকার করল রানা।

হাসলেন দেলফিনা। রোদে ঝিক্ করে উঠল তাঁর সাদা দাঁত। 'কী ভেবেছিলেন? বয়স্কা বিধবা এক মহিলাকে দেখতে পাবেন যার পা থেকে মাথা পর্যন্ত গহনার বাহার? ঘন কোঁকড়া লোমওয়ালা ছোট্ট পুডল কুকুর কোলে নিয়ে বসে থাকবে সে?'

'হ্যাঁ, ঠিক সে-রকমই ভেবেছিলাম,' অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল সোহানা। 'দুঃখিত।'

'না, না, এতে দুঃখ প্রকাশ করার কী আছে? এসব জায়গায় ধনী বিধবা মহিলারা ও-রকম ফ্যাশন করে আসছে অনেক আগে

থেকেই। আমার ব্যাপারটা আলাদা। শিকাগোতে জন্মেছি আমি। পড়াশোনা করেছি সেখানকার এক গ্রেড স্কুলে। তারপর বাবা-মা নীস-এ চলে আসে, ফিরতে হয় আমাকেও। তাঁরা ধনী ছিলেন, কিন্তু খুব সাধারণভাবে চলাফেরা করতেন, আমাকেও তা করতে বলতেন। তাঁদের সাদামাটা আদর্শকে বেছে নিয়েছি বলেই এখানকার আর দশটা মহিলার চেয়ে আমি অন্যরকম।'

আইস টী'র পাত্র আর ফ্রস্টেড গ্লাস নিয়ে হাজির হলো জনসন। রানাদের সামনের ছোট টেবিলে নামিয়ে রাখল।

'ধন্যবাদ, জনসন,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন দেলফিনা।

'ইয়েস, ম্যা'ম,' চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল জনসন।

'ইচ্ছা হলে আমোদফুর্তি করতে পারো আজ রাতে,' বললেন দেলফিনা। 'গুড লাক।'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম।'

জনসন চলে যাওয়ার পর সামনে ঝুঁকলেন দেলফিনা। নিচু গলায় বললেন, 'বছরখানেক ধরে এক বিধবার সঙ্গে ডেটিং করছে জনসন। শুনেছি বিয়ের প্রস্তাব দেবে শীঘ্রিই। জানেন না হয়তো, জনসন কিন্তু মনাকোর সেরা ফর্মুলা ওয়ান ড্রাইভারদের একজন।'

'তা-ই নাকি?' সোহানা আবারও বিস্মিত।

'হ্যাঁ। ওর জনপ্রিয়তাও প্রচুর।'

'কিন্তু...যদি কিছু মনে না করেন...'

'সে আমার এখানে কাজ করছে কেন, তা-ই তো?' সোহানা মাথা ঝাঁকানোয় বলে চললেন দেলফিনা, 'অনেক বছর ধরে আছে সে আমার কাছে। আমার বিয়ের পর পরই এখানে কাজ নেয়। সে শুধু একজন বাটলারই নয়, আমেরিকান ফুটবলে 'ফ্রি সেফটি' বলে একটা পজিশন আছে না? ও আমার জন্য অনেকটা সেরকম। আইস টী-তে আপত্তি নেই নিশ্চয়ই?'

মাথা নাড়ল সোহানা। কেরাফ থেকে গ্লাসে চা ঢালছেন

মিসেস দেলফিনা। 'এটা বড়লোকদের পানীয় না। তারপরও ভালো লাগে আমার। যা-হোক, এত লোক থাকতে লোরনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন কেন আপনারা বলবেন?'

একজন আরেকজনের দিকে তাকাল রানা-সোহানা। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল দু'জনের। বিশ্বাস করা যায় মিসেস দেলফিনাকে।

'একটা মদের-বোতল পেয়েছি আমরা। জিনিসটা এককথায় যদি বলি খুব দুষ্প্রাপ্য। আমাদের মনে হচ্ছে ওটার সঙ্গে লোরনের...'

'অন্যকথায় নেপোলিয়নের হারানো মদভাণ্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে?' রানাকে কথা শেষ করতে দিলেন না মিসেস দেলফিনা।

'সম্ভবত।'

'চমৎকার!' হাসছেন মিসেস দেলফিনা। 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে কেউ যদি সেই মদভাণ্ডার খুঁজে বের করতে পারে, আপনারা দু'জনই পারবেন। আমার পক্ষ থেকে যা যা সাহায্য করা সম্ভব সব করবো। তবে তার আগে আরেকটা কথা। আপনাদের আগে আরও একজন যোগাযোগ করেছে আমার অ্যাটর্নির সঙ্গে, কিছুদিন আগে।'

'লোকটার নাম মনে আছে?' সতর্ক হয়ে উঠেছে রানা।

'না, আমার মনে নেই। আমার অ্যাটর্নি বলতে পারবে হয়তো। তবে এটা খেয়াল আছে লোকটা রাশান। অ্যাটর্নি বলেছে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য নাকি বেশ পীড়াপীড়ি করেছে সে। অ্যাটর্নির সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করেছে। তাই শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিই দেখা করবো না। আপনাদের চেহারা দেখে কেন যেন মনে হচ্ছে লোকটাকে চেনেন আপনারা। ঠিক?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'পীড়াপীড়ি করা, খারাপ ব্যবহার করা

ওই লোকের স্বভাব। আপনি যে দেখা করলেন না, পরে কেউ আবার জোরজবরদস্তি করে ঢুকে পড়েনি তো আপনার এখানে?'

'না, না। ওসব নিয়ে একটুও চিন্তা করি না আমি। জনসনের সঙ্গে আরও তিনজন লোক কাজ করে এখানে। তা ছাড়া রিহেন আছে, অ্যালার্ম সিস্টেম আছে। হাতের কাছে পিস্তল রাখি। এবং আমার নিশানাও যথেষ্ট ভালো।'

'সোহানার মতো,' মন্তব্য করল রানা।

'তা-ই নাকি?' কৌতূহলী দৃষ্টিতে সোহানাকে দেখছেন দেলফিনা। 'আপনিও মার্কসম্যান?'

'না, মানে...' কী বলবে বুঝতে পারছে না সোহানা।

'তা হলে এক কাজ করুন। সময় নিয়ে একদিন আসুন আমার এখানে। কাছেই চমৎকার একটা বীচ ক্লাব আছে। শুটিং-এর বন্দোবস্ত আছে সেখানে। দেখবো কার হাত কত ভাল। নারীসুলভ কৌতূহল আর কী। যা-হোক, রাশান লোকটার কথায় আসি। এলবায় লোরনের কবরের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ দেখায় সে। আমার মনে হয় একই কারণে আপনারাও এসেছেন এখানে।'

'হ্যাঁ,' বলল সোহানা।

'ওই লোককে কিছু বলিনি আমরা। আমার সন্দেহ হচ্ছিল, ইতোমধ্যেই সেখানে গিয়েছে সে, যা চাচ্ছিল তা না পেয়ে হতাশ হয়ে দেখা করতে এসেছে আমার সঙ্গে।'

'হতাশ হয়ে মানে?'

'কয়েক বছর আগে এলবায় একটা ঘটনা ঘটে। নেহাৎ খেয়ালের বশে ধ্বংসযজ্ঞে মেতে ওঠে কিছু টিনেজ ছেলেপেলে। লোরন কে, ভালোমতোই জানি আমরা। এ-ও জানি, নেপোলিয়নের কিছু ক্ষ্যাপা ভক্ত আছে, ঈর্ষান্বিত হয়ে কী করতে পারে তারা। তখন ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিই, লোরনের

সারকোফেগাস, মানে কফিনটা সরিয়ে ফেলবো।'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এলবার বাইরে?'

'না। ওটা এখনও এলবাতেই আছে। তবে অন্য একটা কবরস্থানে। যতদূর জানি এখন পর্যন্ত "নিরুপদ্রবেই" আছেন আমার পূর্বপুরুষ। আপনারা বোধহয় তাঁর সারকোফেগাসটা খুলতে চান, না? সে-অনুমতি চাইতেই তো এসেছেন আমার কাছে?'

হাসল রানা। 'আমাদের মনের কথা বুঝতে পেরেছেন বলে ধন্যবাদ। একদিক দিয়ে ভালো হয়েছে, কথাটা কীভাবে বলবো বুঝতে পারছিলাম না। পূর্বপুরুষের কবর, সারকোফেগাস ইত্যাদি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করাটা পছন্দ করে না অনেকেই।'

"আরে বাদ দাও" এমনি ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন দেলফিনা। 'আমিও পছন্দ করি না। কিন্তু আপনাদের উপর বিশ্বাস আছে আমার। জানি কাজ করতে গিয়ে কাজ বাড়িয়ে ফেলবেন না। আর যদি কিছু নেন সেখান থেকে, ফিরিয়ে দেবেন। ঠিক?'

'অবশ্যই,' বলল সোহানা। 'তবে কোনওকিছু নেয়ার দরকার না-ও হতে পারে। আমাদেরকে বলা হয়েছে লোরনের কফিনের ভিতর নাকি তাঁর ব্যক্তিগত কিছু জিনিস দিয়ে দেয়া হয়েছিল। সেগুলো কী, জানেন?'

'না, জানি না। আমার মনে হয় প্রশ্নটার উত্তর জানতেন একজনই—লোরনের স্ত্রী মেরি। তাঁকে যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে না, কাজেই না দেখা পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু বলাও যাচ্ছে না। তবে একটা কথা জানি। লোরনের মৃত্যুর পর তাঁর কফিন খোলেনি কেউ কখনও।'

'কোথায় আছে তা হলে সেই ঐতিহাসিক কফিন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বলছি। তবে তার আগে একটা শর্ত আছে। কঠিন শর্ত।'

'কী?' সোহানার চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ।

'আজ রাতে আমার সঙ্গে আপনাদের দু'জনকেই ডিনার করে যেতে হবে।'

হেসে ফেলল রানা-সোহানা। দেলফিনাও যোগ দিয়েছেন এই হাসিতে।

সোহানা বলল, 'খুশিমনেই রাজি আমরা।'

'চমৎকার! এবার শুনুন তা হলে গোপন খবরটা। এলবায় পৌঁছানোর পর রিও মারিনায় যেতে হবে আপনাদেরকে। তারপর সেখান থেকে যেতে হবে পশ্চিমের পার্বত্য এলাকার দিকে...

চব্বিশ

এলবা, ইটালি।

আঙুল বেয়ে উঠে আসছে গুবরেপোকাটা। তালুর উল্টোপিঠে এসে থামল, কী মনে হতে দিক পাল্টে চলে এল তালুতে। পোকাটাকে দেখল কিছুক্ষণ রানা। তারপর আরেকহাতের তর্জনী দিয়ে হালকা একটা টোকা মারল। উড়ে গিয়ে একটা পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হলো পোকাটা।

ধূলিধূসরিত পথের ধারে উবু হয়ে বসে ছিল রানা, এবার সোজা হলো। তাকাল সোহানার দিকে। অনেক দূরে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো গর্জাচ্ছে সমুদ্র, যুম লেন্সে ছবি তুলছে ও।

'ইতিহাস একটা মজার বিষয়,' বলল রানা।

'কীভাবে?' ঘুরল সোহানা।

'এইমাত্র টোকা দিয়ে একটা গুবরেপোকাকে উড়িয়ে দিলাম। কে জানে, কালি বানানোর কাজে যেসব পোকা ব্যবহার করতেন নেপোলিয়ন সেগুলোর কোনওটার সঙ্গে ওটার কোনও যোগাযোগ আছে কি না!'

'ওটা তোমার হাতে রস বের করেছে নাকি?'

'করে থাকলেও টের পাইনি।'

'অপি বলেছে ওই কালি বানানো হতো এ-রকম গুবরেপোকা থেকে রস বের করে। চলো রওনা দিই আবার। তিনটা বাজতে চলল।'

আগের রাতে মিসেস দেলফিনার সঙ্গে ডিনার করেছে ওরা। ইচ্ছা ছিল তাড়াতাড়ি খেয়ে বের হবে, কিন্তু পারেনি। এটা-সেটা নিয়ে কথা বলতে বলতে অনেক দেরি করিয়ে দেন ভদ্রমহিলা। হালকা-পাতলা শরীর দেখলে বোঝা যায় না তিনি কত খেতে পারেন, ছিমছাম চেহারা দেখলে টের পাওয়ার উপায় নেই কত কথা আছে তাঁর পেটের ভিতর। রানা-সোহানাকে নিয়ে তিন বোতল ওয়াইন শেষ করেন তিনি একবৈঠকে। তারপর সে-রাতটা তাঁর ওখানে থেকে যেতে রাজি করিয়ে ফেলেন ওদেরকে। হোটেল রিযার্ভেশন বাতিল করে মিসেস দেলফিনার বাসাতেই থেকে যায় ওরা।

পরদিন সকালে সেই বারান্দায় বসে পেস্ট্রি রোল, তাজা আনারস, বেশি করে পেঁয়াজ দিয়ে বানানো ফ্রেঞ্চ স্ক্যাম্বল্ড্ এগ আর তাজা ফলের জুস দিয়ে নাস্তা সারে তিনজনে একসঙ্গে। তারপর মিসেস দেলফিনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে রওয়ানা হয়ে যায় রানা-সোহানা। সেখান থেকে এয়ারফ্রান্সের একটা ফ্লাইটে করে প্রথমে আসে ফ্লোরেন্সে। তারপর ট্রেনে করে পিয়োম্বিনো। শেষে ফেরিতে চড়ে ফোলোনিকা উপসাগরের দশ মাইল পাড়ি দিয়ে এলবার পূর্ব

উপকূলে রিয়ো মারিনায়।

১৯৯১ মডেলের একটা ল্যান্সিয়া ডেল্টা গাড়ি ভাড়া করেছে ওরা। গাড়িটা ছোট, তবে এয়ারকণ্ডিশনিং সিস্টেম কাজ করছে এবং সবচেয়ে বড় কথা ঠিকমতো চলছে এখন পর্যন্ত।

মিসেস দেলফিনার নির্দেশনা অনুযায়ী রিও মারিনা থেকে ইনল্যাণ্ডের দিকে ঢুকেছে ওরা। একে একে পার হয়েছে তিনটা টাস্কান গ্রাম—টগলিয়াটি, সিভেরা, স্যান লরেঞ্জো। আঁকাবাঁকা কিন্তু মসৃণ পাহাড়ি পথ ধরে, একের পর এক আঙুরের-ক্ষেত পার হয়ে একটু একটু করে উঠে এসেছে সমুদ্র সমতল থেকে অনেক উঁচুতে। শেষপর্যন্ত যাত্রাবিরতি করেছে এই শৈলান্তরীপে, এখন যেখানে আছে। দ্বীপের পুব পাশের অনেকখানি দেখা যায় এখান থেকে, দেখা যায় দিগন্তবিস্তৃত ফোলোনিকা উপসাগরের সুনীল জলরাশি।

আরও কয়েকটা ছবি তুলল সোহানা। তারপর গাড়িতে উঠল দু'জন। রওয়ানা দিল আবার।

'নির্বাসনে থাকার সময় এই দ্বীপের ঠিক কোন্ জায়গায় ছিলেন নেপোলিয়ন, জানো?' সোহানাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

ড্যাশবোর্ডে-রাখা একটা গাইডবুক নিল সোহানা। কয়েকটা পাতা উল্টাল। 'উত্তর উপকূলের কাছে পোর্টোফেরেইয়ো নামের এক জায়গায়। থাকার জন্য দুটো বাড়ি দেয়া হয় তাঁকে—ভিলা স্যান মার্টিনো এবং ভিলা ডেই মুলিনি। নির্বাসিত হওয়ার পরও তাঁর অধীনে নাকি ছয়শ' থেকে এক হাজারের মতো লোক ছিল। জানো কি না জানি না, তিনি এলবার সম্রাট উপাধি ধারণ করেছিলেন।'

'ধারণ করেছিলেন নাকি উপাধিটা দেয়া হয়েছিল তাঁকে? য়োরোপের বেশ বড় একটা অংশ যাঁর দখলে ছিল একসময়, তাঁর জন্য এলবার সম্রাট উপাধিটা কি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো

হয়ে যায় না?'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'আরেকটা মজার কথা শোনো। এলবায় নির্বাসন দেয়া হলো নেপোলিয়নকে। এখানে চলে আসার আগে তিনি কী করলেন জানো? বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন।'

সোহানার দিকে তাকাল রানা। 'ঠাট্টা করছ নাকি?'

'না। যে লোক যত বিখ্যাত, খ্যাতি নষ্ট হওয়ার পর তার হতাশাও তত বেশি। বিষের বোতলটা গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছিলেন নেপোলিয়ন। বিষের জাতটাও ছিল সে-রকম। আফিম, বিষকাঁটালি আর সাদা হেলাবোরের মিশ্রণ।'

'তারপর?' সামনে অনেকটা পথ একেবারে সোজা আর খালি, তাই গতি বাড়াল রানা। 'বিষ খাওয়ার পর কী হলো মহান সম্রাটের?'

'পেটব্যথায় সারারাত তড়পালেন তিনি কিন্তু কিছুতেই মরতে পারলেন না।'

'কেন?'

'কারণ অনেকদিন আগে বানানো হয়েছিল বিষটা। কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছিল।'

'রাখে আল্লা মারে কে,' রিয়ারভিউ মিররে চোখ রাখল রানা। 'আমাদের পেছনের গাড়িটার ব্যাপারে আল্লার নিয়ত কী কে জানে!'

রিয়ারভিউ মিররে একবার চোখ বুলিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সোহানা। আধ মাইল পিছনে, পাহাড়ি বাঁক ধরে এগিয়ে আসছে সাদা রঙের একটা গাড়ি। একটা পাহাড়ের আড়ালে কয়েক মুহূর্তের জন্য উধাও হয়ে গেল, তারপর দেখা দিল আবার।

'ড্রাইভারের তাড়া আছে বোঝা যাচ্ছে,' রিয়ারভিউ মিররটা আবারও দেখে নিয়ে মন্তব্য করল রানা।

বাহামা ছেড়ে চলে আসার পর রানা-সোহানা দু'জনই সতর্ক আছে যাতে ওদেরকে কেউ অনুসরণ করতে না পারে। সাদা গাড়িটা উদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত সে বিষয়ে তেমন কোনও চিন্তা ছিল না ওদের মনে। এবার হচ্ছে। এলবার মতো ছোট একটা দ্বীপে চোর-পুলিশ খেলার জায়গার অভাব আছে। ইভান সিদোরভের মতো পয়সাওয়ালা লোক যা খুশি করতে পারে এখানে।

স্টিয়ারিং হুইলটা শক্ত করে ধরল রানা। একবার রিয়ারভিউ মিররের দিকে, আরেকবার সামনের রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে।

দু'-তিন মিনিটের মধ্যেই শক্তিশালী ইঞ্জিনের সাদা গাড়িটা ওদের গাড়ির খুব কাছে চলে এল। মাঝখানের দূরত্বটা কমিয়ে ফেলছে আরও। রানাদের গাড়ির বাম্পার থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে আছে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে ড্রাইভার আর তার পাশের লোকটাকে মনে হচ্ছে দুটো ছায়ামূর্তি। দু'জনই পুরুষ, স্থিরদৃষ্টিতে দেখছে রানাদের ল্যান্সিয়া ডেল্টাটাকে।

একহাতে স্টিয়ারিং ধরে রেখে আরেকহাতে জানালার কাঁচ নামাল রানা, গাড়ির গতি আগেরমতোই রেখেছে। খালি হাতটা বের করল জানালা দিয়ে বাইরে। নেড়ে ইশারা করছে পিছনের ড্রাইভারকে যাতে ওভারটেক করে চলে যায়।

কিন্তু গেল না সাদা গাড়িটা। রানাদের গাড়ির বাম্পারটা যেন ওটার প্রিয়ার ঠোঁট, চুমু দেয়ার কামনায় যতটা পারে কাছে আসতে চাচ্ছে। তারপর অনেকটা হঠাৎ করেই গতি কমিয়ে দিল, চার-পাঁচ সেকেণ্ড পরই গতি বাড়িয়ে চলে এল রানার পাশে।

প্যাসেঞ্জার উইণ্ডো দিয়ে বাইরে তাকাল সোহানা। সরু রাস্তাটার কিনারা থেকে বড়জোর একফুট ব্যবধান রেখে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। এর পরই ঝোপঝাড় আর ছোট-বড় পাথরে ভরা এবড়োখেবড়ো পাহাড়ি ঢাল, সোজা নেমে গেছে পাঁচ শ' ফুট

নীচে। ওখানে একটা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে একপাল ছাগল। এত উঁচু থেকে পিঁপড়ের সমান দেখাচ্ছে ওগুলোকে।

ঘাড় ঘুরিয়ে সাদা গাড়ির দুই আরোহীকে দেখল সোহানা। প্যাসেঞ্জার সীটে বসে আছে গুঁফো এক লোক, নির্নিমেষ দেখছে সোহানাকেই। ও তাকানোমাত্র ছোট করে নড করল। জবাবে ভেংচি কাটতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সোহানা; মুচকি হাসার চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটা ফুটল কি না নিজেও বলতে পারবে না। ঘাড় আরেকটু কাত করে ড্রাইভারকে দেখার চেষ্টা করল ও। চাঁদি ছিলা লোকটার নাক ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকানো, সোহানাকে তাকাতে দেখে ঘাড় কাত করল সে-ও, নড করতে গিয়ে মাথা এতটা ঝুঁকিয়ে ফেলল যে, আরেকটু হলেই বাড়ি খেত স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে।

হাতের ইশারায় আবারও তাগাদা দিল রানা। এক্সিলারেটরের উপর থেকে পা সরিয়ে দিয়েছে যাতে একটু একটু করে পিছিয়ে পড়ে সাদা গাড়ি থেকে। ওই দু'জন নেহাৎ আগন্তুক হলে ভালো, না হলে কী ব্যবস্থা নেবে তা-ও ভাবা হয়ে গেছে।

তবে কোনও ব্যবস্থা নিতে হলো না। গতি বাড়িয়ে চলে গেল "আগন্তুকেরা"।

'বুঝলাম না,' চেপে-রাখা দম শব্দ করে ছাড়ল সোহানা। 'মেয়েমানুষ দেখেনি নাকি আগে?'

'দেখেছে,' বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বলল রানা, ক্লাচ চেপে গিয়ার বদল করছে, 'কিন্তু এমনটা আর দেখেনি।'

'আরে রাখো তোমার ফালতু কথা!' সোহনার গলায় কপট শাসন।

'না রাখলে?'

'মারবো এক ধাক্কা। স্টিয়ারিং ছেড়ে উড়ে গিয়ে সোজা পাঁচ শ' ফুট নীচে পড়বে।'

'মারো ধাক্কা,' আবারও গিয়ার বদলাল রানা। 'রাখে আল্লা মারে কে। তবে তার আগে বলে নাও আর কতদূর যেতে হবে আমাদেরকে। আমাকে ফেলে দিয়ে বাকি পথ একা যেতে পারবে কি না, জানতে হবে না?'

হাসল সোহানা। গাইডবুকটা খুলল আবার। একটা ম্যাপের উপর কিছুক্ষণ আঙুল চালিয়ে বলল, 'পাঁচ কি ছ'মাইল।'

পড়ন্ত বিকেলে গন্তব্যে পৌঁছাল ওরা।

জায়গাটা কাপানেলো নামের একটা পাহাড়ের ঢালে। চারদিকে জুনিপার আর আলেপো পাইনের জঙ্গল। কাছেই রিয়ো নেল'এলবা নামের একটা গ্রাম; যেখানে আর দশটা টাস্কান গ্রামের মতো আছে খোয়াবিছানো সরু গলি, অন্ধকারাচ্ছন্ন বাজার যাকে ইটালির লোকেরা বলে পিয়াযা এবং বাড়িতে বাড়িতে অর্কিডে-ছাওয়া পাথরের ব্যালকনি আর জলপ্রপাতের মতো নেমে-আসা গুচ্ছ গুচ্ছ ল্যাভেণ্ডার ফুলে ঢাকা দেয়াল।

স্যাণ্টা ক্যাটেরিনার আশ্রমের কাছে একটা পার্কিং স্পট পেয়ে গেল ওরা। ওখানে গাড়ি থামাল রানা। দেলফিনার কথামতো অ্যাণ্টোনিয়ো ভিনসেঞ্জো নামের এক লোক থাকবে এখানে, ওদের কণ্ট্যাক্ট পার্সন। তিনি স্থানীয় খনি যাদুঘরের অ্যাসিস্টেণ্ট কিউরেটর।

সোহানার হাত থেকে গাইডবুকটা নিল রানা। সূর্য ডুবি ডুবি করছে, তাই গাড়ির ভিতরের বাতি জ্বেলে নিল, যে পৃষ্ঠাটা খুলে রেখেছিল সোহানা সেটার উপর নজর বুলাচ্ছে মন দিয়ে। আশপাশে কোথায় কী আছে সে-সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা নিতে চায়। মনের পর্দায় সব মোটামুটি গেঁথে যাওয়ার পর বইটা রেখে দিল ড্যাশবোর্ডে। তারপর ইঙ্গিতে নামতে বলল সোহানাকে, নিজেও দরজা খুলে নামল। দিক ঠিক করে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল

সোহানাকে নিয়ে।

খনি যাদুঘরে পৌঁছাতে দশ মিনিট লাগল। একটা পিয়াযা ছাড়িয়ে এসে রাস্তা পার হচ্ছে, এমন সময় রানা বলল, 'একটু দাঁড়াও তো, এখানে কয়েকটা ছবি তুলি তোমার।'

আশ্চর্য হলো সোহানা। 'ছবি? আমার! নতুন দেখছ নাকি?'

"রূপ দেখে তোর কেন আমার পরাণ ভরে না" গানের বিশেষ লাইনটা গুনগুন করে গাইতে গাইতে হাত বাড়িয়ে সোহানার কাছ থেকে যুম লেন্সের ক্যামেরাটা নিল রানা। 'এই যে লক্ষ্মীটি,' আদর করে ডাকল সোহানাকে, 'এখানে একটা ঝরনা আছে। কে জানে, তুমি-আমি একদিন এখানে আসবো ভেবেই হয়তো বানানো হয়েছিল এটা।' তারপর সুর করে বলল, 'দাঁড়াও না একটু ঝরনার পাশে, দেখি কেমন ছবি আসে।'

রানার কিছু একটা মতলব আছে বুঝে কথা না বাড়িয়ে জায়গামতো গিয়ে দাঁড়াল সোহানা, চেহারায় বড় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন। ওর কয়েকটা ছবি তুলল রানা। প্রতিবারই রানার কথামতো হাসতে হলো ওকে।

কাজ শেষ হলে ওকে ডাকল রানা। 'এবার লক্ষ্মীটি, কাছে এসে দেখে যাও কেমন দেখাচ্ছে তোমাকে।'

রানার কাছে গেল সোহানা। ক্যামেরার এল.সি.ডি. স্ক্রীনে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে কুঁচকে গেল ওর ভ্রূ। 'কী ব্যাপার, রানা? কী ছবি তুলেছ এসব? আমি তো পুরোপুরি আউট অভ ফোকাস।'

'দয়া করে ভ্রূ-জোড়া সোজা করে হাসো,' নিচু গলায় জরুরি কণ্ঠে বলল রানা। 'সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রাখো চেহারা। তোমার ছবি তুলিনি আমি। ফোকাসে কী দেখা যাচ্ছে দেখো ভালোমতো।'

বিপদ টের পেল সোহানা। রানার কথামতো অভিনয় শুরু করল, নজর ক্যামেরার স্ক্রীনের দিকে। বোঝার চেষ্টা করছে কীসের ছবি তুলেছে রানা যুম করে।

ও যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, মানে ঝরনাটা থেকে আনুমানিক পঞ্চাশ ফুট দূরে অস্পষ্ট একটা গলি। অস্পষ্ট, কারণ শেষবিকেলের ঘনায়মান অন্ধকার যেন ছায়া ফেলেছে ওই জায়গায়। তারপরও দেখা যায় সাদা রঙের একটা গাড়ির ছাদ। দেখা যায় ড্রাইভিং সীটে বসে-থাকা লোকটাকেও।

চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে এদিকেই তাকিয়ে আছে।

পঁচিশ

হাসল সোহানা। এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলেছে চেহারায় যেন খুব খুশি হয়েছে। রানার আরও কাছে ঘেঁষে এল, নিজের গাল ঠেসে ধরেছে রানার গালের সঙ্গে, ক্যামেরার স্ক্রীনের ছবিটা মনোযোগ দিয়ে দেখার ভান করছে। 'কাকতালীয়?'

'হলে ভালোই হতো,' ডান তর্জনী তুলে স্ক্রীনের কাছে নিয়ে গেল রানা, যেন গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেখাচ্ছে সোহানাকে। 'কিন্তু বিনকিউলারটা তো সে-কথা বলে না।'

'ওরা হয়তো...হয়তো বার্ডওয়াচার,' সোহানার গলায় জোর নেই।

'ওয়াচার সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু পাখিগুলো ডানাওয়ালা নাকি অন্যরকম, সেটাই প্রশ্ন। খারাপটা ধরে নিলেই ভালো হবে আমাদের।'

'গুঁফোটা কই? ওটাকে দেখছি না কেন ছবিতে? তুমি দেখতে পাচ্ছ?'

'না। চলো, যে-কাজে এসেছি তা সেরে ফেলি। স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করো। এদিক-ওদিক তাকিয়ো না। আর পারলে আমার সঙ্গে একটু প্রেম-প্রেম ভাব করো। বিনকিউলারটা যদি আমাদের জন্যই হয়ে থাকে, ওরা বুঝুক আমরা সুখী দম্পতি ছাড়া আর কিছুই না।'

যাদুঘরে গিয়ে ঢুকল ওরা। থামল রিসিপশন ডেস্কে। ভিনসেঞ্জোকে কোথায় পাওয়া যাবে জানতে চাইল সোহানা। ফোন তুলে ইটালিয়ান ভাষায় কিছুক্ষণ কথা বলল রিসেপশনিস্ট। মিনিটখানেক পর হাজির হলো হৃষ্টপুষ্ট বয়স্ক এক লোক। মাথায় কাঁচাপাকা পাতলা চুল, মুখে বিব্রত হাসি। 'বুঅন জুওর্নো,' ইটালিয়ানে গুড ডে বললেন তিনি।

আবারও বোঝা গেল কোনও কারণে অস্বস্তিতে ভুগছেন তিনি। সন্ধ্যার সময় গুড ডে বলছেন।

ইটালিয়ান রানার চেয়ে ভালো পারে সোহানা। তাই ও মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'বুঅনা সিরা (গুড ইভনিং),' ভুল করতে রাজি নয়। 'সিনর ভিনসেঞ্জো?'

'সি।'

'পার্লা ইংলেসে?' (ইংরেজি বলতে পারেন?)

হাসি আরও বিস্তৃত হলো ভিনসেঞ্জোর। 'হ্যাঁ, পারি। কিন্তু আপনি তো ভালোই ইটালিয়ান বলছিলেন। কী সাহায্য করতে পারি আপনাদেরকে?'

'আমার নাম সোহানা,' হাত বাড়িয়ে দিয়ে হ্যাণ্ডশেক করল। 'আর ইনি আমার স্বামী, মাসুদ রানা।'

হাত মেলাল রানাও।

'নিরালায় কোথাও বসে কথা বলা যাবে আপনার সঙ্গে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'অবশ্যই। চলুন আমার অফিসে গিয়ে বসি।'

হলওয়ে ধরে কিছুদূর এগোলে হাতের ডান দিকে ভিনসেঞ্জোর অফিস। সেখানে গিয়ে ঢুকল ওরা। ঘরের একমাত্র জানালাটা খোলা, পিয়াযা দেখা যাচ্ছে।

নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন ভিনসেঞ্জো। হাতের ইশারায় দুটো চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বসতে বললেন রানা-সোহানাকে। ওরা মনাকো ছেড়ে চলে আসার আগে ভিনসেঞ্জোকে দেয়ার জন্য একটা চিঠি দিয়েছেন দেলফিনা, পকেট থেকে ওটা বের করে ভিনসেঞ্জোকে দিল রানা। চিঠিটা ভালোমতো পড়ে ফেরত দিলেন তিনি।

'কিছু মনে করবেন না,' বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন ভিনসেঞ্জো, 'আমাকে কোনও আইডেন্টিফিকেশন দেখাতে পারেন?'

রানা-সোহানা দু'জনই যার যার পাসপোর্ট বের করে বাড়িয়ে দিল ভিনসেঞ্জোর দিকে। এবারও ভালোমতো দেখলেন তিনি, তারপর ফেরত দিলেন পাসপোর্ট দুটো। বললেন, 'দেলফিনা কেমন আছেন?'

'ভালো,' ছোট করে জবাব দিল রানা। 'আপনাকে শুভকামনা জানিয়েছেন।'

'আর তাঁর বিড়ালটা? রিমোয় না কী যেন নাম?'

মাথা নাড়ল সোহানা। 'বিড়াল না, কুকুর। নাম রিহেন।'

দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসলেন ভিনসেঞ্জো। 'আসলে যে-বিষয়টা নিয়ে আপনারা এসেছেন আমার কাছে, মাঝেমধ্যে নিজের কাছেই মনে হয় সেটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলি। রিহেনের কথা বলে আসলে পরীক্ষা করলাম আপনাদেরকে। দেলফিনা বিশ্বাস করেন আমাকে। আমি চাই না তাঁর সেই বিশ্বাস ভেঙে যাক কোনও কারণে।'

'বুঝতে পারছি,' বলল সোহানা। 'মিসেস দেলফিনার সঙ্গে কতদিনের পরিচয় আপনার?'

'দিন? বলুন যুগ। বিশ বছর হতে চলল ওকে চিনি আমি। বেশিও হতে পারে। এলবার একটা দুর্গের সঙ্গে পুরনো একটা ভিলা আছে, ওটা কিনে নিয়েছেন তিনি অনেকদিন আগে। মাঝেমধ্যে এসে থাকেন। জানেন কি না জানি না, ওই ভিলা যে-জমির উপর, সেটা নিয়ে সরকারের সঙ্গে বেশ কয়েক বছর ধরে মামলা চলছে মিসেস দেলফিনার। তাঁকে আইন-আদালতের কাজে সাহায্য করছি আমি।'

'আপনি উকিল?' জানতে চাইল সোহানা।

'না। তবে আমার সঙ্গে নামীদামি কয়েকজন উকিলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।'

'আচ্ছা। আমাদেরকে সাহায্য করছেন তো?'

'অবশ্যই। আপনারা শুধু কবরটা দেখবেন, তা-ই না? কোনও কিছু সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নেই?'

'না।'

'ভালো। উঠেছেন কোথায়?'

'এখনও কোথাও উঠিনি। দেখি কোনও হোটেলে ব্যবস্থা করে নেবো।'

'তা হলে এক কাজ করুন। চলুন আজকের সাপারটা একসঙ্গে সেরে নিই। তারপর কবরস্থানে নিয়ে যাবো আপনাদেরকে।'

'ধন্যবাদ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'যদি কিছু মনে না করেন, আপনার অফিসটা কি কিছু সময়ের জন্য ব্যবহার করতে পারি আমরা?'

'অবশ্যই,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ভিনসেঞ্জো। 'আপনাদের যতক্ষণ সময় লাগে থাকুন এখানে, কাজ করুন।' বাইরে বের হয়ে দরজাটা টেনে দিলেন।

স্যাটেলাইট ফোনটা বের করল রানা। কল করল অপিকে।

বিশ সেকেণ্ড পর স্পিকারের খড়খড়ানি উপচে ভেসে এল অপির কণ্ঠ, 'মাসুদ ভাই, কী খবর?'

'এখন পর্যন্ত সব ঠিকঠাক। তোমার কী অবস্থা?'

'আমিও ভালো আছি।'

'একটা কাজ দিতে চাই তোমাকে।'

'কী?'

'একটা গাড়ির লাইসেন্স প্লেটের নম্বর বলবো। ওটা চেক করে দেখতে হবে।'

'কোথায় আছেন আপনারা এখন?'

'এলবাতে।'

'তা হলে একটু সময় লাগবে, মাসুদ ভাই।'

'লাগুক, অসুবিধা নেই। দরকার মনে করলে সোহেলের সঙ্গে যোগাযোগ কোরো।'

'ঠিক আছে। নম্বরটা বলুন, আমি লিখে নিচ্ছি। দেখি কী করতে পারি।'

•

ঠিক বিশ মিনিট পর ফোন করল অপি।

'ইটালির ডি.এম.ভি ডাটাবেইস হ্যাক করতে একটু সময় লেগে গেল,' বলল ও। 'গাড়িটা বোধহয় সাদা রঙের পুজো, না?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'তা হলে খারাপ খবর আছে আপনাদের জন্য। প্রাদেশিক পুলিশের জনৈক অফিসারের নামে রেজিস্ট্রেশন করা আছে ওটা। বিস্তারিত বিবরণ মেইল করে দিচ্ছি আপনার কাছে,' লাইন কেটে দিল অপি।

শোল্ডারব্যাগ থেকে ল্যাপটপ বের করল রানা। তিন মিনিট পর মেইলটা চলে এল ওর কাছে। অ্যাটাচেমেন্টগুলোর উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল ও। তারপর সোহানাকে বলল, 'হয় স্পিডলিমিট

ভেঙেছি আমি নয়তো এলবার কেউ একজন আগ্রহী হয়ে উঠেছে আমাদের ব্যাপারে।'

'বুঝলাম না,' সোহানার ভ্রূ কুঁচকে গেছে, 'পুলিশের লোক হলে তো রিও মেরিনাতেই বাধা দিতে পারত আমাদেরকে।'

'তা হলে কী ধরে নেবো? আমাদের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে যে লোক সে বাধা দিতে চায় না? আমরা যা করছি তা শুধু দেখতে চায়? কেন? আমরা জায়গামতো যাওয়ার পর খপ্ করে টুঁটি চেপে ধরবে?'

'মিসেস দেলফিনার কথাগুলো ভাবছি আমি,' জবাব না দিয়ে বলল সোহানা। 'মেলিখান ইতোমধ্যেই ঘুরে গেছে এখান থেকে। টুঁ মেরেছে লোরনের আগের কবরে। তার মানে সিদোরভ জানত আজ না হোক কাল আমরা আসবো এখানে।'

'সিদোরভ বা মেলিখান যদি কাছেপিঠেই কোথাও থেকে থাকে তা হলে আশ্চর্য হবো না। ও-রকম কিছু করা ওদের পক্ষে সম্ভব।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে ঘুরল সোহানা, বেরিয়ে যাবে। চেয়ার ছাড়ল রানাও।

আধ ঘণ্টা পর যাদুঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভিনসেন্সোর পিছু নিল দু'জনে। গার্ডরা তখন সদর-দরজায় তালা দিচ্ছে।

মাইলখানেক দূরে ভিনসেন্সোর কটেজ। তিনি আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন মেহমান আসছে, তাই ওরা পোর্চে পা দেয়ামাত্র দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন তাঁর স্ত্রী। ইনিও মোটাসোটা। জ্বলজ্বলে চোখে চঞ্চল দৃষ্টি। বুলেট ট্রেনের মত দ্রুতগতিতে একগাদা কথা বললেন স্বামীকে, একটা বর্ণও বুঝল না রানা-সোহানা। তারপর ওদেরকে চমকে দিয়ে একে একে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দু'জনের উপর, সশব্দে চুমু খেলেন গালে।

পোর্চে কয়েকটা চেয়ার পাতা আছে। বসল রানা-সোহানা। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে সোহানা। ছাদের প্রলম্বিত অংশ থেকে

গুচ্ছাকারে ঝুলে আছে বাহারি রঙের একজাতের বনলতা, প্রাকৃতিক পর্দা তৈরি করেছে একদিকে। সোহানার মনে হচ্ছে আরামদায়ক কোনও ছায়াকুঞ্জে বসে আছে।

'আপনারা বসুন, আরাম করুন,' বলল ভিনসেঞ্জো। 'আমাকে একটু রান্নাঘরে যেতে হবে। সাপারের কাজে হাত লাগাতে হবে আমার স্ত্রীর সঙ্গে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিল রানা, অসুবিধা নেই।

ঘরের ভিতরে উধাও হয়ে গেলেন বুড়ো-বুড়ি। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন মিসেস ভিনসেঞ্জো, হাতে একটা ট্রে। তাতে সুদৃশ্য একটা জগ আর দুটো গ্লাস।

'লেবুর শরবতে আপত্তি নেই আশা করি?' হাসিমুখে জানতে চাইলেন।

মিষ্টি করে হাসল সোহানাও। 'আসলে যা গরম পড়েছে, ঠাণ্ডা কিছুর কথাই ভাবছিলাম আমি।'

'তা হলে আয়েশ করে চুমুক দিন। সাপার পরিবেশন করা হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

সাপারের পর পোর্চে ফিরে এল ওরা। বসল হাত-পা ছড়িয়ে। অন্ধকার ঘনিয়েছে। দূরের ঝোপজঙ্গলে আর গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে জোনাকির আলো। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ আর ক্ষয়াটে চাঁদ। প্রকৃতিতে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। আকর্ষণ করে, আবার একইসঙ্গে শিহরণও জাগায়।

রানা বলল, 'সিনর ভিনসেঞ্জো, কত বছর ধরে আছেন এখানে?'

'সারা জীবন। আর আমার পূর্বপুরুষদেরসহ যদি হিসাব করি, তিন শ' বছরের কম হবে না। মুসোলিনি ক্ষমতায় আসার পর আমার বাপ-চাচারা যোগ দেন পার্টিযানদের সঙ্গে। ১৯৪৪ সালে ইংরেজরা যখন ল্যাণ্ড করে এখানে...'

'অপারেশন ব্র্যাসার্ড,' বলে উঠল সোহানা।

'হ্যাঁ। ইংরেজরা আসার পর রয়্যাল নেভি কমাণ্ডোদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েন তাঁরা। সাহসিকতার জন্য আমার বাবা এমনকী সম্মাননাও পেয়েছিলেন। যুদ্ধ যখন শেষ হয় তখন আমি আমার মায়ের গর্ভে।'

'যুদ্ধে শেষপর্যন্ত টিকতে পেরেছিলেন আপনার বাবা?'

'হ্যাঁ। তবে আমার চাচারা মারা যান। নাৎসিদের হাতে ধরা পড়েছিলেন তাঁরা সবাই। একটা ডেথস্কোয়াড পাঠিয়েছিল হিটলার। ওদের কাজ ছিল পার্টিযানদের ধরো আর মারো।'

'গুইসেপ লুসিয়ানো,' কিছুক্ষণের নীরবতার পর হঠাৎ বলে উঠল রানা। 'নামটা কি আপনার পরিচিত, সিনর ভিনসেঞ্জো?'

ওর দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন ভিনসেঞ্জো। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, পরিচিত। কেন?'

'আমরা এখানে আসার আগে একটা সাদা পুজো গাড়ি ফলো করতে শুরু করে আমাদেরকে। খবর নিয়ে জেনেছি গাড়িটা রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে গুইসেপ লুসিয়ানোর নামে।'

'তা হলে তো চিন্তার কথা,' ভিনসেঞ্জোর কপালে ভাঁজ পড়েছে। 'লুসিয়ানো একজন পুলিশ অফিসার। কিন্তু দুর্নীতিবাজ। ওকে নিয়ে একটা ওপেন সিক্রেট চালু আছে এলবায়—কর্সিকান মাফিয়ার কাছে বিক্রি হয়ে গেছে সে। কিন্তু আপনাদেরকে নিয়ে ওদের মাথাব্যথার কারণটা বুঝতে পারছি না।'

'আমার মনে হয় না কর্সিকান মাফিয়া মাথা ঘামাচ্ছে আমাদেরকে নিয়ে,' বলল সোহানা। 'আমার মনে হয় অন্য কারও হয়ে নিজের ভাড়াটে লোক দিয়ে আমাদের উপর চোখ রাখছে লুসিয়ানো।'

'খারাপ, খুবই খারাপ,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছেন ভিনসেঞ্জো। 'পুজোর ভিতরে লুসিয়ানো ছিল নাকি?'

'না। ওই গাড়িতে দু'জন ছিল। তাদের কারও চেহারা লুসিয়ানোর সঙ্গে মেলে না। ওর ছবি দেখেছি আমরা। তবে মোটা গোঁফ আর গাঢ় চামড়ার একটা লোক ছিল। এ-রকম কাউকে চেনেন?'

'না...সম্ভবত। আর চিনলেও মনে করতে পারছি না এখন।'

'লুসিয়ানোর ব্যাপারে কিছু করছে না কেন স্থানীয় পুলিশ? আপনি বললেন লোকটা দুর্নীতিবাজ এবং ব্যাপারটা ওপেন সিক্রেট। তা হলে ওকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন?'

'প্রথম কথা, এলবা ইটালির মেইনল্যাণ্ড না, বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপ। এখানে ইটালিয়ান পুলিশের হর্তাকর্তাদের তদারকি নেই বললেই চলে। আর সে-সুযোগটাই নিয়েছে লুসিয়ানো। দ্বিতীয়ত, জানের মায়া কার নেই? কর্সিকান মাফিয়া কারও সঙ্গে আপোষ করে না, কাউকে হুমকি দেয় না, ওদের কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে কেউ কিছু আন্দাজ করতে পারে না। কেউ যদি ওদের চোখের বালিতে পরিণত হয়, হঠাৎ গায়েব হয়ে যায় লোকটা। কখনও কখনও লাশ পাওয়া যায়, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যায় না। কাজেই কে আসবে লুসিয়ানোকে গ্রেপ্তার করতে, কে তার নামে মামলা দেবে, কে সাক্ষী হবে আর বিচারের রায়ই বা পাঠ করবে কে? তাই কর্সিকান মাফিয়ার পকেটে ঢুকে যাওয়ার পর থেকে লুসিয়ানোর বুক দিন দিন ফুলেই চলেছে।'

রানা বা সোহানার কেউ কিছু বলল না। চমৎকার এসপ্রেসো কফি বানিয়েছিলেন মিসেস ভিনসেঞ্জো, সেটা কেন যেন বিস্বাদ লাগছে ওদের কাছে।

'আমার মনে হয় না আমি যদি একটা ব্যাপারে অনুরোধ করি তা হলে রাখবেন আপনারা, তারপরও বলছি,' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলতে লাগলেন ভিনসেঞ্জো। 'লুসিয়ানো কিছু করে বসার আগেই এলবা থেকে চলে যান দয়া করে।'

দৃষ্টি বিনিময় করল রানা-সোহানা। রানা বলল, 'না, সিনর ভিনসেঞ্জো, তা সম্ভব না। আমরা যে কাজে এসেছি তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লুসিয়ানোর মতো একজন দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ কর্মকর্তার ভয়ে লেজ গুটিয়ে নেয়ার সুযোগ নেই আমাদের।'

'তারপরও আমরা চাই না আমাদের কারণে আপনার অথবা আপনার স্ত্রীর কোনও ক্ষতি হোক,' রানার কথার সঙ্গে লেজ জুড়ে দিল সোহানা। 'যদি সমস্যা মনে করেন, আমাদের সঙ্গে কবরস্থান পর্যন্ত যাওয়ার দরকার নেই। শুধু বলে দিন কোথায় যেতে হবে, কীভাবে কী করতে হবে। বাকিটা সামলে নিতে পারবো আমরা।'

মাথা নেড়ে সোহানার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন ভিনসেঞ্জো। 'একটু বসুন আপনারা। আসছি আমি।'

মিনিট দু'-এক পর একটা জুতার-বাক্স হাতে নিয়ে ফিরে এলেন। 'জিনিসটা কাজে লাগতে পারে আপনাদের,' রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন বাক্সটা।

কিছুটা আশ্চর্য হয়ে ঢাকনা খুলল রানা। ভিতরে একটা নাইন মিলিমিটার ল্যুগার পিস্তল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের। বুলেটভর্তি দুটো ম্যাগাজিনও আছে।

'যে গেস্টাপো অফিসার আমার চাচাদেরকে খুন করে, তাকে পরপারে পাঠানোর পর তার কাছ থেকে ল্যুগারটা নিয়ে নেন বাবা,' বললেন ভিনসেঞ্জো। 'অন্য কোনও উদ্দেশ্যে না, বাবার যুক্তি ছিল, "মরা মানুষ পিস্তল দিয়ে কী করবে? তার চেয়ে স্যুভনির হিসেবে আমার কাছেই থাক ওটা।"'

'কিন্তু এটা নিতে পারি না আমরা,' বলল রানা। 'এটা আপনার পারিবারিক সম্পদ। আমরা কীভাবে...'

হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিলেন ভিনসেঞ্জো। 'নিন ল্যুগারটা। যদি কাজে না লাগে তা হলে তো ভালোই। আর লাগলে কাজ শেষে আমাকে ফিরিয়ে দিলেই হবে। তা ছাড়া আমার কাছে এ-

রকম জিনিস আরও আছে।' দাঁত বের করে হাসলেন। 'যুদ্ধের শেষদিকে বাবাকে "স্যুভনির" সংগ্রহ করার নেশা পেয়ে বসেছিল।'

ছাব্বিশ

আগের কবরস্থান থেকে সরিয়ে নতুন যে-কবরস্থানে আনা হয়েছে লোরনের সারকোফেগাস, কোনও নাম নেই সেটার। তবে কবরস্থানটা কয়েক শ' বছরের পুরনো। কেউ কেউ বলে, এলবা ফরাসিদের দখলে আসার অনেক আগে থেকেই মৃতদের অন্তিমশয্যা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কেউ আবার ইতিহাসটা টেনে নিয়ে যায় আরেকটু পেছনে। বলে, ফোলোনিকা উপসাগরের বুকে এলবার ম্যাপ যখন আঁকা হয়, তার আগে থেকে আছে কবরস্থানটা।

ল্যান্সিয়ায় চড়ে বসেছে ওরা। গ্রামের প্রধান সড়ক ধরে এগোচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে এল। রানা খেয়াল করল, উত্তরে মোড় নিয়ে সমুদ্র-সমতল থেকে আরও উঁচুতে উঠে যাচ্ছে ক্রমে। সূর্য ডুবে গেছে বেশ অনেকক্ষণ, চারদিকে গাঢ় হয়ে এসেছে রাতের ছায়া। মিনিট দশেক পর পেছনের সীটে বসে-থাকা ভিনসেঞ্জো বললেন, 'গাড়িটা থামান, প্লিয।'

গতি কমাল রানা, আস্তে আস্তে চাপ বাড়াচ্ছে ব্রেকপ্যাডালে। 'কোনও সমস্যা?'

'থামুন, প্লিয, থামুন।'

গাড়ি থামাল রানা। হেডলাইট নিভিয়ে দিল। পাশে-বসা সোহানা আগেই ঘুরে তাকিয়েছে ভিনসেঞ্জোর দিকে, এবার সে-ও ঘাড় ঘুরাল। দেখল, নার্ভাস ভঙ্গিতে কপাল চুলকাচ্ছেন ভিনসেঞ্জো। রানা-সোহানাকে তাকাতে দেখে অপরাধ স্বীকার করার ভঙ্গিতে নিচু গলায় বললেন, 'আমি খুব খারাপ একটা কাজ করে ফেলেছি।'

'কী কাজ?' রানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল সোহানা।

'আমি...আমি যেখানে নিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে সেখানে ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছে আপনাদের জন্যে।'

'ফাঁদ? বলেন কী?'

'বিকেলে যখন গিয়েছিলেন যাদুঘরে তার কিছুক্ষণ আগে লুসিয়ানো আসে আমাদের বাসায়। আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে। আমরা যদি সাহায্য না করি ওকে তা হলে খুন করে আমাদের লাশ সাগরে ভাসিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। আপনারা যাদুঘরে যাওয়ার দু'-তিন মিনিট আগে টেলিফোন করে আমাকে সব জানায় আমার স্ত্রী।'

'কিন্তু এসব কথা এখন কেন বলছেন?'

'কারণ হলো পিস্তলটা।'

'পিস্তল! মানে?'

'যে-ল্যুগারটা দিয়েছি আপনাদেরকে সেটার কথা বলছি। যে অফিসারকে শেষ করে দিয়ে ওটা নিয়েছিলেন বাবা, সে লোকও খুন করার হুমকি দিচ্ছিল তাঁকে আর তাঁর পরিবারকে। আজ আমি যতটা ভয় পাচ্ছি, আমার মনে হয় বাবাও সেদিন ততখানি ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি লড়াই করেন এবং জয়ী হন। আমাকেও একই কাজ করতে হবে। আমি...আমি দুঃখিত।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা-সোহানা। তারপর সোহানা

বলল, 'যা-হোক. খারাপ কিছু হয়ে যাওয়ার আগেই কথাটা বলেছেন আমাদেরকে, সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ওরা কি অপেক্ষা করছে সেখানে?'

'না মনে হয়.' ঘড়ি দেখলেন ভিনসেঞ্জো। 'কিছুক্ষণের মধ্যে রওনা হওয়ার কথা আছে ওদের।'

'ওদের পরিকল্পনাটা কী?'

'আমাদের আগেই যদি কবরস্থানে যেতে পারে ওরা তা হলে ত্রিশ মিনিট সময় দেবে আপনাদেরকে। লোরনের কবর থেকে কী বের করবেন আপনারাই জানেন, তারপর হামলা করবে ওরা, আপনারা কিছু পেলে আপনাদের দু'জনকেই খুন করে জিনিসটা হাতিয়ে নেবে। তারপর হয়তো খুন করবে আমাকেও।'

'ওরা ক'জন আসবে. জানেন?' এতক্ষণ পর মুখ খুলল রানা।

'না, জানি না,' শার্টের পকেট থেকে ল্যুগারের একটা স্পেয়ার ম্যাগাজিন বের করে রানাকে দিলেন ভিনসেঞ্জো। 'আপনাদেরকে আগে যে-দুটো ম্যাগাজিন দিয়েছিলাম সেগুলো ডামি, আসল জিনিস না। এটা রাখুন। কাজে লাগতে পারে।'

ম্যাগাজিনটা নিয়ে ল্যুগার লোড করল রানা। 'ধন্যবাদ। একটা ব্যাপার বুঝতে পারিনি। আমাদেরকে যখন ফাঁদেই ফেলতে চাচ্ছিলেন তখন পিস্তল দিলেন কেন?'

'আপনাদের বিশ্বাস অর্জন করার জন্য। তা ছাড়া...সেখানেও তো চালাকি করেছি, তা-ই না? নকল বুলেট-ভরা ম্যাগাজিন দিয়েছি। ফায়ার করলে কোনও কাজ হতো না। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিন।'

ল্যুগারটা দেখছে রানা। ম্যাগাজিন বের করে ক্লিপে চাপ দিয়ে একটা বুলেট নিল হাতে। রাঁধুনি যেভাবে ভাতের দানা টিপে

দেখে, সেভাবে টিপে দেখল বুলেটটা। সন্তুষ্ট হয়ে ওটা ম্যাগাজিনে ভরে ম্যাগাজিনটা আবার ঢুকাল লুগারে। 'আগেরবার বিশ্বাস করেছিলাম, জানতে পারলাম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এখন আবার নতুন কোনও চালাকি করছেন না জানছি কী করে?'

'জায়গামতো গিয়ে যদি দেখেন চালাকি করেছি, প্রথম গুলিটা আমাকেই করবেন। অনুমতি দিলাম।'

ভিনসেঞ্জোর চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'মনে থাকে যেন কথাটা।'

সোহানা বলল, 'আপনার স্ত্রীর কী হবে? তাঁকে যদি...'

'ও ইতিমধ্যেই চলে গেছে।'

'চলে গেছে? কোথায়?'

'ফ্যালকোনাইয়ায়। ওখানে আমার অনেক আত্মীয় আছে। ওরা দেখে রাখবে ওকে, দরকার হলে রক্ষা করবে।'

'আমার কাছে স্যাটেলাইট ফোন আছে,' বলল রানা। 'এক কাজ করুন না। ফোন করে জানিয়ে দিন ইটালিয়ান পুলিশকে।'

মাথা নাড়লেন ভিনসেঞ্জো। 'জানালে লাভ কী হবে? সময়মতো আসতে পারবে ওরা এখানে?'

সোহানা বলল, 'আরেক কাজ করলে কেমন হয়? গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে যাই আমরা। অথবা কবরস্থানটা ছাড়িয়ে অন্য কোনও দিকে গিয়ে কোনও মোটেলে উঠে পড়ি। ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে চলে যাওয়ার মতো রাস্তা আছে নিশ্চয়ই?'

'এখানে আসার এবং চলে যাওয়ার রাস্তা আছে মাত্র দুটো। নিশ্চিত থাকুন, দু'জায়গাতেই পাহারা বসিয়েছে লুসিয়ানো। তা ছাড়া এলবার বিভিন্ন জায়গায় ওর লোক আছে, আছে কর্সিকান মাফিয়ার সদস্যরা। এতজনের চোখে ধুলো দিতে পারবেন?'

রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'তুমি কিছু বলছ না যে?'

'বলছি না কারণ, ভাবছি। আমরা যদি এখন কবরস্থানে না যাই তা হলে সন্দেহ করবে লুসিয়ানো। পাহারা আরও কড়া করবে। এবং আমাদেরকে বের হতে দেবে না এলবা থেকে। যার হয়ে কাজ করছে লুসিয়ানো, নিশ্চিত থাকো সে-লোক প্রচুর টাকা আর সেই সঙ্গে ওই নির্দেশই দেবে তাকে। সন্দেহ নেই সিনর ভিনসেঞ্জোর পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে। তিনি যে আসলে মিসেস দেলফিনার এজেন্ট, জানতে পেরেছে সিদোরভ। আমার ধারণা, সবকিছুর পেছনে আগেরমতোই আছে সে। কর্সিকান মাফিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সে, আর ওরা খবর দিয়েছে লুসিয়ানোকে। ইচ্ছা করলে সিনর ভিনসেঞ্জোকে ভয় দেখিয়ে লোরনের কবরে নিয়ে যেতে পারত লুসিয়ানো, তাঁকে দিয়ে কবর খুঁড়িয়ে সারকোফেগাসের ভিতরের সবকিছু হাতিয়ে নিতে পারত, কিন্তু আমার মনে হয় ওরা দেরি করে ফেলেছে আসলে। এখন চাইছে, আমরাই যাই সেখানে, মূল্যবান কোনও সূত্র থাকলে উদ্ধার করি, পরে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবে ওরা।'

'তার মানে কবরস্থানে যেতে চাও তুমি?'

'হ্যাঁ, চাই।'

'তারপর?'

'তারপর যা হয় হবে,' চাবি ঘুরিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করল রানা।

কবরস্থান না বলে আগাছায় ভরা তৃণভূমি বললেই বোধহয় মানায় বেশি। অযত্নে-অবহেলায় বেড়ে ওঠা ঘাসগুলো এত বড় হয়েছে যে, না দেখা যায় কোনও কবর, না চোখে পড়ে কোনও নামফলক। দু'দিকে পাহাড়ি দেয়াল। একদিকে পাইন আর কর্ক

গাছের পাতলা জঙ্গল। জায়গাটা আয়তনে এক একরের মতো। সীমানা ঘিরে দেয়া হয়েছে লোহার-শিকের বেড়া দিয়ে। মরচে ধরে ক্ষয়ে গেছে কোনও কোনও শিক। কোনও কোনওটা স্রেফ উধাও, চোরে নিয়ে গেছে কি না কে জানে।

পাতলা একটা কুয়াশার-চাদর ঝুলে আছে কবরস্থানের বাতাসে। মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে থেকে থেকে, তাই কখনও কখনও পাক খেয়ে সরে যাচ্ছে কুয়াশা। তখন চোখে পড়ছে কোনও কোনও নামফলক, সারি সারি কবরের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে।

এলবার সন্ধ্যার আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ছিল, কেটে গেছে কিছুক্ষণ আগে। আরেকটু পূর্ণতা পেয়েছে ক্ষয়াটে চাঁদ। জোরালো হয়েছে হলদেটে আলো।

থেমে-থাকা গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রানা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সোহানার দিকে। তারপর হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, 'বের হচ্ছি আমি।'

রিয়ারভিউ মিররে চোখ বুলাল সোহানা। যতদূর দেখা যায়, কোথাও কেউ নেই। কবরস্থানের গেটের চারপাশে তাকাল। এখানেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মাথা ঝাঁকাল রানার উদ্দেশ্যে। হেডলাইট নিভিয়ে দিয়ে বাইরে বের হলো রানা।

দূরের কোনও একটা গাছ থেকে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল দু'বার। তারপর সব চুপ।

'পরিবেশটা জবরদস্ত,' নিচু গলায় বলল রানা।

'হুঁ,' সায় জানাল সোহানা, 'ভূতুড়ে ছবির শুটিং-এর জন্য আদর্শ। ভাবছি প্যাঁচার পর নেকড়ের ডাক শুনতে পাবো কি না।'

'এলবায় কোনও নেকড়ে নেই,' জানালেন ভিনসেঞ্জো। 'তবে বুনো কুকুর আছে। আর আছে সাপ। প্রচুর। আর এই কবরস্থানে তো বলতে গেলে গিজগিজ করে ওগুলো।'

আর কোনও কথা হলো না। খুলে হাঁ হয়ে-থাকা লোহার

সদর-দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল ওরা। এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে।

একনজর দেখলেই বোঝা যায়, এলবার মৃত অধিবাসীদেরকে পরিকল্পনা ছাড়াই কবর দেয়া হয়েছে এখানে। কবরগুলো সামঞ্জস্যবিহীন, এমনকী সারিগুলোও হয়নি ঠিকমতো। বেশিরভাগ কবরে নামফলক নেই। যে-ফলকগুলো এখনও আছে সেগুলোর বেশিরভাগই পড়া যায় না উঁচু ঘন আগাছার কারণে। যেখানে আগাছা নেই সেখানে বেঁকে গেছে তক্তা, একেবারে কাছে না গেলে জানা যাবে না মরা-মানুষটার নাম। যাদের একটু পয়সা আছে তারা মৃত আত্মীয়ের মাথার কাছে নামফলকের বদলে বসিয়েছে হেডস্টোন। কিন্তু ওগুলোও ঠিকমতো বসানো হয়নি, সরে গেছে একপাশে, ফলে কোন্‌টা কার হেডস্টোন ঠাহর করা মুশকিল। বেশিরভাগ কবরস্থানে বেশিরভাগ কবর এক সাইজের হয়, এখানে কোনওটা বড় কোনওটা ছোট। কোনওটাতে সাপের গর্ত, কোনওটা ধসে পড়ে ঢুকে গেছে মাটির নীচে। আবার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্রও আছে। ঝকঝকে নতুন কবরও দেখা যাচ্ছে দু'-এক জায়গায়। সেগুলোর নামফলকে মৃত ব্যক্তির পরিচয় যেন জ্বলজ্বল করছে। সেখানে আগাছার বদলে আছে ফুলের তোড়া। কেউ কেউ বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে বাগান বানিয়ে ফেলার অপচেষ্টা করেছে।

'এখানে দেখাশোনা করার লোক নেই?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'যার যেভাবে খুশি সেভাবে কবর দেয় নাকি?'

'আসলে অনেক পুরনো তো, সরকারি লোকজনও হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধা করে। এক একর জায়গা খুব বড় না, আবার একেবারে ছোটও না। নতুনভাবে সাজাতে গেলে অনেক কাজ করতে হবে। শখ করে দায় ঘাড়ে নিতে চায় কেউ, বলুন?'

'কত কবর আছে এখানে?'

'কয়েক শ'।'

'লোরনেরটা কোন্‌দিকে?'

'এসে গেছি প্রায়। এই মোড়টা ঘুরে হাতের ডানদিকে যাওয়ার পথে প্রথম কবরটাই লোরনের।'

থেমে দাঁড়াল রানা, হাতঘড়ি দেখল। বাকিরাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। কী যেন ভাবল রানা। তারপর বলল, 'সোহানা, এক কাজ করো। গাড়ির কাছে ফিরে যাও। মসিয়ে ভিনসেঞ্জোকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি আমি। লোরনের কবরে একসঙ্গে দু'জনের নামার মানে হয় না। তা ছাড়া গাড়ির কাছেও কারও থাকা দরকার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কথাটা মেনে নিল সোহানা। উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। একটা বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হলো কিছুক্ষণের মধ্যে।

ভিনসেঞ্জোর দিকে তাকাল রানা। 'কতদূর এসেছি আমরা সদর-দরজা থেকে?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন ভিনসেঞ্জো। 'সিকি মাইল হবে।'

'হুঁ। চলুন, পথ দেখান।'

জায়গামতো পৌঁছে থেমে দাঁড়ালেন ভিনসেঞ্জো। লোরনের সারকোফেগাসটা প্রতিবেশীদের তুলনায় ছোটই বলা যায়। সাধারণ একটা ক্লযিটের চেয়ে বড় না। চার ফুটের মতো উঁচু। পকেট থেকে এল.ই.ডি. মাইক্রোলাইট বের করে জ্বালল রানা। একবার চক্কর দিল সারকোফেগাসের চারপাশে। একপাশে ক্ষয়ে-যাওয়া "সুলিভান" নামটা পড়া যায় এখনও। সামনের দিকে এসে থামল রানা। নীচে আলো ফেলে দেখল সারকোফেগাসটা কয়েক ফুট ঢুকে গেছে মাটির ভিতরে। মাটিতে কয়েকটা ধাপ কাটা হয়েছে সিঁড়ির মতো, শ্যাওলায় ঢেকে গেছে ওগুলো—একমাত্র দরজাটার নীচ দিয়ে দেখা যায়।

বেশ বড় একটা তালা ঝুলছে দরজায়। পিছন পিছন এসেছেন ভিনসেঞ্জো, পকেট থেকে চাবি বের করে তালাটা খুললেন।

ধাক্কা দিলেন পাল্লায়। কুয়াশা, প্যাঁচার ডাক আর চাঁদের ঘোলাটে আলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্যাঁচকোঁচ শব্দে খুলে গেল দরজা।

ঘাড় ঘুরিয়ে রানার দিকে তাকালেন ভিনসেঞ্জো, নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসলেন। রানা বলল, 'আপনি নজর রাখুন। আমি ভিতরে ঢুকছি।'

ধাপগুলো বেয়ে সাবধানে নীচে নামল রানা। দু'ধাপ নামতে-না-নামতেই নাকেমুখে জড়িয়ে গেল মাকড়সার জাল। হাত দিয়ে থাবা মেরে ওগুলো ছিঁড়ে ফেলল রানা। ফ্ল্যাশলাইটের নীলচে-সাদা আলোয় দেখা গেল প্রাণপণে দৌড়ে পালাচ্ছে কতগুলো মাকড়সা। দু'চারটা উঠে এল রানার জুতো বেয়ে, শূন্যে লাথি মেরে ওগুলোকে খসাল ও। নামল আরও নীচে।

অনুমান করল উপরের জমিন থেকে পাঁচ ফুট নীচে চলে এসেছে। ভূগর্ভস্থ এই কক্ষ চওড়ায় আট ফুটের কাছাকাছি। মাথা সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না রানা। বাতাসে ইঁদুরের মল আর ধুলোর বাজে গন্ধ। হাতের ডানদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, আলগা পাথরের টুকরোর উপর ইঁদুরের হুটোপুটি শোনা যাচ্ছে সেখান থেকে।

ঘরের মাঝখানে একটা পাথরের শবাধার। তাতে কোনও চিহ্ন নেই, প্রশংসাসূচক কোনও বাক্য নেই। লাল ইট দিয়ে বানানো তিন ফুট উঁচু একটা প্ল্যাটফর্মের উপর রাখা আছে ওটা। কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ফ্ল্যাশলাইটটা দাঁতে কামড়ে ধরে ঢাকনা ধরে জোরে টান মারল। যতটা আশা করেছিল তার চেয়ে অনেক হালকা ওটা, তাই তাল সামলাতে গিয়ে হুমড়ি খেতে হলো রানাকে। ঢাকনাটা সাবধানে মেঝেতে নামিয়ে রেখে কুঁজো হয়ে দাঁড়াল আবার। শবাধারের একপ্রান্ত আঁকড়ে ধরে তাকাল ভিতরে। ফ্ল্যাশলাইটের আলো সোজা গিয়ে পড়ছে একটা কঙ্কালের চেহারার উপর।

‘ও দাদুভাই,’ যেন দীর্ঘদিনের পরিচয় এমন ভঙ্গিতে বলল রানা বাংলায়, ‘শেষপর্যন্ত দেখা হলো তোমার সঙ্গে।’

পচতে পচতে লোরনের কঙ্কাল কালো হয়ে গেছে। শতছিন্ন কিছু কাপড়ের টুকরো এখনও লেপ্টে আছে ওটার সঙ্গে। নেপোলিয়নের আমলের আর্মি জেনারেলের উর্দি, অনুমান করল রানা। মরচে-ধরা একটা তরবারিও দেখা যাচ্ছে। লোরনের পোকায়-খাওয়া কালো দুই বুটের মাঝখানে কাঠের একটা বাক্স, আকৃতিতে হার্ডকভার বইয়ের সমান। ওটা সাবধানে তুলে আনল রানা। উপরে জমে-থাকা ধুলো উড়িয়ে দিল ফুঁ মেরে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে বাক্সটা রাখল মেঝেতে, খুলল।

ভিতরে সবার প্রথমে দেখা গেল একটা হাতির-দাঁতের চিরুনি। তারপর মাস্কেটের একটা চ্যাপ্টা বুলেট, খয়েরি রঙের কী যেন লেগে আছে ওটার গায়ে, সম্ভবত শুকনো রক্ত। ছোট ছোট কয়েকটা রেশমি বটুয়াতে কিছু মেডেল। এরপর একটা গোল সোনার-লকেট, খুলে দেখা গেল তাতে এক মহিলার ছবি—রানার অনুমান লোরনের স্ত্রী মেরির। সবশেষে হাতের তালুর সমান একটা বই, চামড়ার কভারে মোড়া।

দম আটকে আসছে রানার। বুকমার্ক দেয়া আছে বইটাতে, বিশেষ সেই পাতাটা খুলল ও।

ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে একসারিতে কয়েকটা চিহ্ন:



‘ইউরেকা!’ বিড়বিড় করে বলল রানা। তারপর বইটা নিজের কাছে রেখে বাকি জিনিসগুলো যেটা যেভাবে ছিল সেটা সেভাবে সাজিয়ে রাখল। বাক্সটা রেখে দিল আগের জায়গায়। ঢাকনাটা লাগাতে যাবে এমন সময় ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় কঙ্কালের পায়ের কাছে চকচক করে উঠল ধাতব কিছু একটা। হাতড়ে জিনিসটা বের করে আনল রানা।

স্টিলের একটা বাটালি। হাতের বুড়ো আঙুলের সমান। কোনও সীলমোহর, অনুমান করল রানা। একটা প্রান্ত রেতির মতো চ্যাপ্টা। আরেকটা প্রান্ত আবার অবতল, ছুরির ফলার মতো। বাটালিটার ঠিক মাঝখানে কী একটা যেন মুদ্রিত মনে হচ্ছে। বাঁ হাতে ওটা নিয়ে ডান হাতে ফ্ল্যাশলাইট ধরল রানা, ভালোমতো দেখল। একটা মৌমাছি বা ঘুগরে পোকা। বিচিত্র নকশাওয়ালা দুই ডানা দু'দিকে মেলে দিয়েছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে বাটালিটা পকেটে ভরল রানা। তারপর শবাধারের ঢাকনা লাগিয়ে দিয়ে উঠে এল উপরে। 'সিনর ভিনসেঞ্জো?' ডাকল নিচু গলায়। 'তালা লাগিয়ে দিন।'

কোনও সাড়া নেই।

'সিনর ভিনসেঞ্জো?' গলা উঁচু করল রানা।

'রানা?' ভিনসেঞ্জো না, কবরস্থানের সদর-দরজার কাছ থেকে ডাক দিল সোহানা।

ওর কণ্ঠে এমন কিছু একটা আছে যে, সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে দৌড়াতে শুরু করল রানা। সিকি মাইলের দূরত্বটা অতিক্রম করতে এক মিনিটও লাগল না।

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে, এমন সময় থমকে দাঁড়াতে হলো রানাকে। অত্যুজ্জ্বল একজোড়া হেডলাইট জ্বলে উঠেছে, ধাঁধিয়ে দিয়েছে রানার চোখ। রানার একটা হাত আপনা থেকে চলে এল চোখের সামনে। সহ্য করতে পারছে না তীব্র আলো।

'মিস্টার মাসুদ রানা,' ইংরেজি উচ্চারণে খাঁটি রাশান টান, 'আপনার মাথার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একটা রাইফেল। আমরা জানি আপনি চালাক মানুষ। কিন্তু অতি চালাকি করতে গিয়ে গলায় দড়ি পড়বেন না দয়া করে। হাত দুটো মাথার উপরে তুলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসুন বাইরে।'

'সোহানা?' দু'হাত মাথার উপর তুলে চেঁচিয়ে ডাকল রানা।

'এই যে এখানে,' হতাশ গলায় জবাব এল সোহানার।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা। ল্যান্সিয়ার ড্রাইভারের পাশের দরজা খোলা, ওটার পাশে অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সোহানা। ওর মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে বিশালদেহী যে লোক দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখে সুড়সুড়ি জাগল রানার পাকস্থলীতে।

গুইসেপ লুসিয়ানো!

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসুরভিত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

এম. এস. এস. শিমুল, মোবা: ০১৭৯০২৯৫১৬৯

১ নং টুটপাড়া, তালতলা হাসপাতাল ক্রস রোড, খুলনা।

সালাম নেবেন। মাসুদ রানা'র সাথে আমার প্রথম পরিচয় 'রক্তের রঙ' দিয়ে। গতকাল 'কিলার ভাইরাস-২' শেষ করলাম। বইয়ের প্রতিটি পাতায় লুকানো ছিল শিহরণ। আর শেষে রাগ হল মাসুদ রানার উপর। তার কাছে আমার প্রশ্ন—ভাই, এত তাড়াতাড়ি সোহানাকে ভুলে গেলেন কী করে?

'ডেথ ট্রাপ-২'-এ বিপ্লব ভাই একটি কাহিনির কথা বলেছিলেন। কিন্তু মাসুদ রানার সব শত্রু শেষ হয়ে গেলে তো মাসুদ রানার জীবন, এমনকী আমরা যারা রানা ভক্ত তাদের জীবনও পানসে হয়ে যাবে। তাই এত তাড়াতাড়ি সব শত্রুকে মেরে ফেলা ঠিক হবে না।

❋ ঠিকই বলেছেন, শত্রু থাকা ভাল—জীবনে বৈচিত্র্য থাকে। ...আর, কে কাকে ভুলেছে: সোহানাকে রানা, নাকি রানাকে সোহানা—কী করে বুঝলেন? ওদের যার যেমন খুশি চলুক না, আমি কেন মাঝখান থেকে কাজীগিরি ফলাতে গিয়ে বিরক্তিভাজন হই? ওদের বিয়ে পড়িয়ে দিলে আপনি হয়তো খুশি হতে পারেন, কিন্তু ওরা কি হবে? এই যে, এই বইয়েই মিথ্যে রানার বউ সেজে দুনিয়াময় ধেই ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছে সোহানা, এতেই যদি ওরা সুখী হয়, তো ক্যয়া কারেগা কাজী?

এ. বি. এম তামিম

বি. জি. সি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম।

আস্‌সালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আপনার সাথে অনেকদিন পর কথা হচ্ছে। সাহিত্যপ্রেমীদের জন্য সেবা প্রকাশনীর আলোচনা বিভাগ খুব সহায়। কাজীদা, আপনার নতুন বছর কেমন কাটছে? পুরো বছর থাকবেন তো? নতুন বছরের প্রথম উপহার ও মাসুদ রানা সিরিজের ৪২৯ নম্বর বইটি পড়ে শেষ করলাম। বইটির জন্য অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করেছি, ঢাকা,

রংপুর, রাজশাহীসহ সেবার পাঠক বন্ধুদের ফোন করেছি, তাদের কাছে পৌছেছে কি না। না, কারও কাছে নেই।

বইটি পেলাম মাত্র পরশুদিন। টাইম বম বহন করতে গিয়ে জীবনে এই প্রথম বারের মত পুলিশের হাতে পড়লাম। জিহাদী বই মনে করেছিল! মাসুদ রানার নাম দেখে ছেড়ে দিয়েছে।

কাজীদা, মাসুদ রানার সুবাদে সারা বাংলাদেশে আমার অনেক বন্ধু। সেজন্য সেবা ও আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আগামী বইয়ের অপেক্ষায় ও আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করে বিদায়।

❋ নতুন বছর চমৎকার কাটছে, তবে পুরো বছর থাকব কি না কথা দিতে পারি না। ...ভাগ্যিস মাসুদ রানা সম্পর্কে পুলিশ ভদ্রলোকের জানা ছিল, নইলে এবার গেছিলেন চোদ্দ শিকেরওপার! ...আপনারও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

কিশোর

মিরপুর, ঢাকা।

কাজীদা,

শুভেচ্ছান্তে নিবেদন, মাসুদ রানার ৩৪৫ নং বই সুমেরুর ডাক-১-এর ৯৫ পৃষ্ঠায় আছে, 'পাঁশুটে', আর ৯৯ পৃষ্ঠায় আছে, 'বঙ্গালী'। কিন্তু শব্দগুলো হবে পাংশুটে' আর 'বাঙ্গালি'। না?

বি.দ্রঃ আপনি যদি আমাকে তুমি করে বলেন, অনেক খুশি হব, কাজীদা।

❋ বেশ, তাহলে তুমিই বলছি। এত খুঁটিয়ে পড়ো দেখে তোমাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। এতদিন হয়ে গেল, এখনও ইন্টারেস্ট ধরে রেখেছ... সহজ কথা নয়!

তোমার প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি: অভিধান বলছে, পাঁশুটে মানে পাংশুবর্ণ বিশিষ্ট। অর্থাৎ, শব্দটা ভুল নয়। আর দ্বিতীয় শব্দটা জেনেশুনেই ওভাবে লেখা হয়েছে, কারণ, অবাঙ্গালী ভারতীয়, পাকিস্তানী ও সিংহলীরা অনেকেই আমাদেরকে কিছুটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে 'বঙ্গালী' বলে, ভাবেও ওভাবেই।

শুভেচ্ছা রইল।

ফরহাদ

৩২২ পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

শ্রদ্ধেয় কাজীদা, কেমন আছেন? নিশ্চয়ই ভাল, একটু আজব ধরনের গল্প 'কুরুক্ষেত্র' অসাধারণ হয়েছে। আজব গল্পটি অসাধারণভাবে উপস্থাপনের জন্য আপনাকে, আপনার প্রিয় ফুলের শুভেচ্ছা। ব্যতিক্রমধর্মী প্রচ্ছদগুলিও চমৎকার হয়েছে। কুরুক্ষেত্র-২-এর প্রচ্ছদ বেশি ভাল হয়েছে, অবশ্য ১-এর প্রচ্ছদও চমৎকার। তবে আমার মনে হচ্ছে ইসমাইল আরমান ভাইয়ার দৃষ্টি এড়িয়ে একটি প্লেন বেশি এসেছে, তাই না, কাজীদা? ইসমাইল আরমান ভাইয়াকে শুভেচ্ছা জানাবেন কিন্তু। ডিউককে মনে আছে কাজীদা? যদি সম্ভব হয়, তবে রানাকে কি ডিউক রূপে সামনের কোন বইয়ে আনা সম্ভব? জানাবেন আশা করি।

❋ চেষ্টা করব। ...আর মনে তো হচ্ছে ঠিকই ধরেছেন, কোত্থেকে জানি বেশি এসে পড়েছে একটা।...শুভেচ্ছা জানিয়ে দিলাম।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের **নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই** সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ৫০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, **বিকাশ নং ০১৭৮৪৮৪০২২৮।** কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

১৯/০৫/১৪ সুবর্ণ সমাধি (ওয়েস্টার্ন) ডিউক জন

বিষয়ঃ 'সেনিয়োর...' 'বলো,' হাঁটবার ওপরেই বলল মেকসিকান। 'তুমি কি বলতে পারবে, এখানে সোনা এল কেমন করে?' হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল যেন আলভারো। মহিলার দিকে তাকাল। হতভম্ব দেখাচ্ছে বুড়োকে। 'তুমি জানো না?' বিভ্রান্তির দোলায় দুলতে লাগল মেরি। 'কী জানি না, সেনিয়োর?' 'সোনা তো এখানে আসেনি, সেনিয়োরা। বরাবর ছিল।' 'জানি তো।' ঠোঁট মুড়ে হাসল রোজমেরি। 'সোনার খনি। আমি আসলে জানতে চাইছি, কী করে তৈরি হয় সোনা। জানো তুমি?' ঠাস করে কপাল চাপড়াল মেক্স। হতাশায় মাথা নাড়ছে। 'খনি নয়, সেনিয়োরা...খনি নয়! আয়-হায়, কোথায় আছ তুমি!'

আরও আসছে

২২/০৫/১৪ বিশ্বাসঘাতক+হলো না, রত্না+রহস্যময়ী (রহস্য উপন্যাস ভলিউম)
কাজী আনোয়ার হোসেন

২৭/০৫/১৪ রহস্যপত্রিকা (৩০ বর্ষ ৮ সংখ্যা)

জুন, ২০১৪